মিশর

মমি পিরামিড ও নীলনদের দেশে

ডাঃ তপনকুমার বিশ্বাস

Egypt

Land of Mummy Pyramid and River Nile

Dr. Tapan Kumar Biswas

মিশর - মমি পিরামিড ও নীলনদের দেশে

Egypt - Land of Mummy Pyramid and River Nile

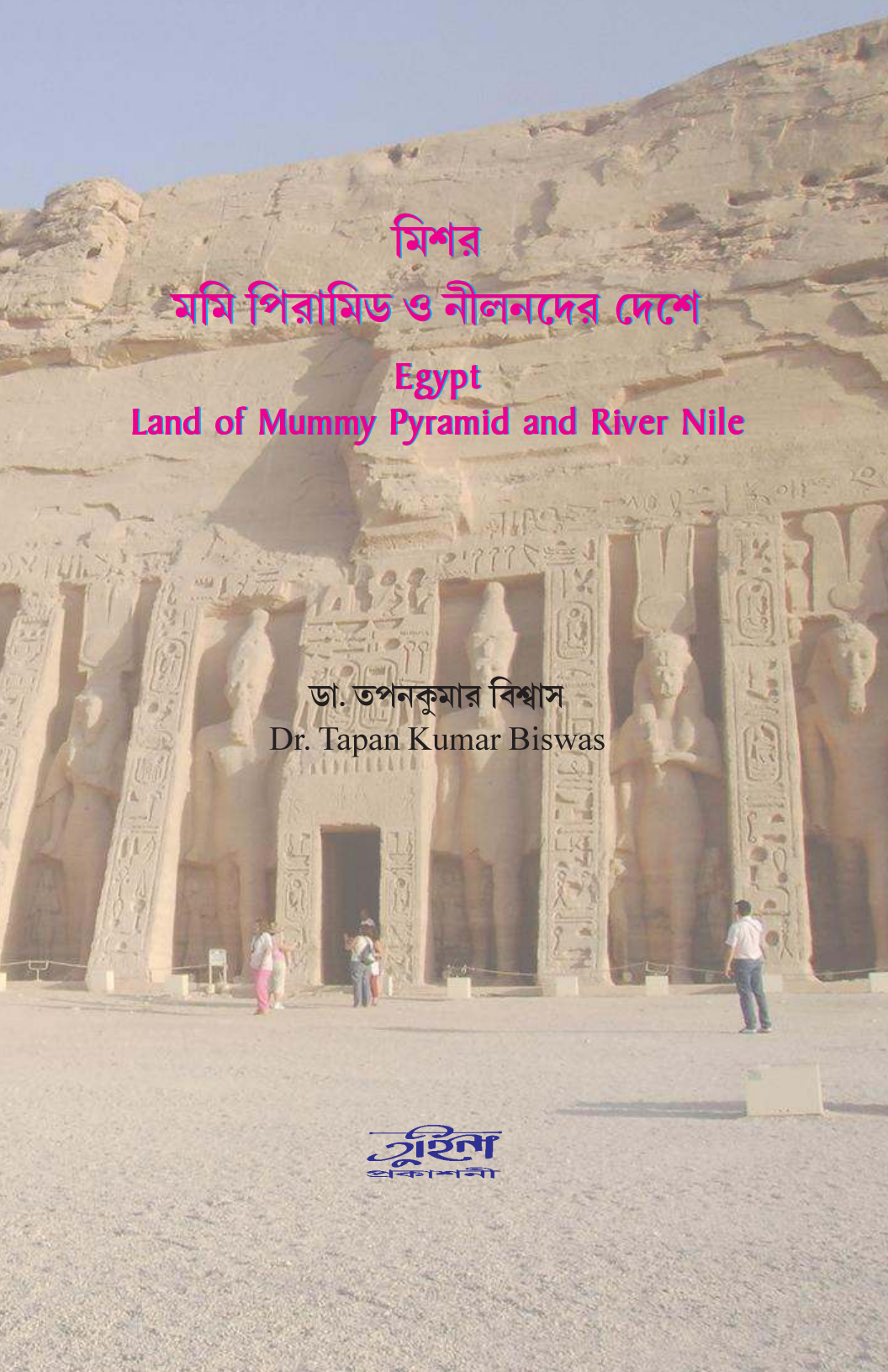

মিশর
মমি পিরামিড ও নীলনদের দেশে

Egypt
Land of Mummy Pyramid and River Nile

ডা. তপনকুমার বিশ্বাস
Dr. Tapan Kumar Biswas

তুহিনা
প্রকাশনী

মিশর–মমি পিরামিড ও নীলনদের দেশে
ডা. তপনকুমার বিশ্বাস
Egypt–Land of Mummy Pyramid and River Nile
by Dr. Tapan Kumar Biswas
Contact : 9433125195, Email : drtapan24pgs@gmail.com
Website : www.drtapankumarbiswas.com

গ্রন্থস্বত্ব ঃ ডা. দীপালী বিশ্বাস
(মোবাইল ঃ ৯৪৩৩১২৫১৯৫, ৯৮৩০১৭৫৫৪৯)
সরোজ পার্ক, বারাসাত, কলকাতা-৭০০১২৪
Copy Right : Dr. Dipali Biswas
(Mobile :9433125195, 9830175549)
Saroj Park, Barasat, Kolkata - 700124

প্রথম প্রকাশ ঃ কলকাতা বইমেলা, ২০১৯
First Published : Kolkata Book Fair, 2019

Publisher : Dr. Tapan Kumar Biswas

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। লেখকের অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোন অংশের কোনরূপ প্রতিলিপি ও তথ্য কোনভাবেই সংরক্ষণ, প্রকাশ বা ব্যবহার করা যাবে না।
All right reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or any means, electronic, mechanical, photo copying or otherwise or stored in any retrieval system without the prior permission of the author.

প্রচ্ছদ ঃ ডা. তপনকুমার বিশ্বাস
ISBN : 978-93-5346-579-7

অক্ষরবিন্যাস এবং মুদ্রক
মহামায়া প্রেস এন্ড বাইন্ডিং, ২৩, মদন মিত্র লেন, কলকাতা-৭০০০০৬,
ফোন ঃ ০৩৩-২৩৬০ ৪৩০৬, ই-মেল ঃ mahamayapress@gmail.com

প্রাপ্তিস্থান
তুহিনা প্রকাশনী, ১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩, ফোন ঃ ৯১২৩৮৩৯২৬৭

মূল্য ঃ ৪০০ টাকা
Price : Rs 400.00

উৎসর্গ

আমার
সর্বক্ষেত্রে সর্বক্ষণের
প্রেরণা
ডা. দীপালী বিশ্বাস-কে

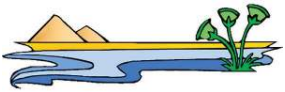

ভূমিকা

‘ফিরে আসা’ ও ‘জেগে আছি’ এই দুটি কাব্যগ্রন্থের সাফল্যের পর ডা. তপনকুমার বিশ্বাস ভ্রমণের উপর একটি গ্রন্থ প্রকাশের ইচ্ছা প্রকাশ করে। তার ইচ্ছার প্রতিফলন তার এই ভ্রমণ কাহিনী ‘মিশর - মমি পিরামিড ও নীলনদের দেশে’ (‘Egypt-Land Mummy Pyramid and River Nile’).

২০০৮ সালে মিশর ভ্রমণে গিয়েছিলাম। ভ্রমণের সময় তার ডায়েরি লেখার অভ্যাস বরাবরের। প্রতিদিনের দর্শনীয় বিষয়, প্রতিদিনের ঘটনাবলি ঘুমোতে যাওয়ার আগে খুঁটিনাটি সব কিছু লিখে রাখত। তাছাড়া সে তার প্রিয় ভিডিও ক্যামেরায় সব ক্যামেরা বন্দি করে রাখত।

ভ্রমণ আমাদের নেশা। যখনই আমরা সুযোগ পেয়েছি, বেরিয়ে পড়েছি। ভারতবর্ষের প্রায় সব দর্শনীয় স্থান ঘোরা হয়ে গেছে। আমরা দু’জনে বেড়াতে গিয়েছি অনেক দেশে। ইতিমধ্যে আমরা মিশর, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, ইটালি, অস্ট্রিয়া, লিচেনস্টেন, ভ্যাটিকান সিটি, চিন, হংকং, ম্যাকাউ, শ্রীলঙ্কা, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশ ঘুরেছি।

মিশরের পিরামিডের ভিতরে ঢুকেছি। কায়রো যাদুঘরে মমি দেখতে গিয়েছি। নীল নদের উপরে রিভার ক্রুজ আজও মনে আছে। মিশরে বিখ্যাত বেলি ড্যান্স দেখে রাত জেগেছি। ক্লিওপেট্রার আলেকজান্দ্রিয়াতে ঘুরেছি ইতিহাসের সন্ধানে।

শ্রীলঙ্কায় গিয়েছি তাদের প্রাকৃতিক দৃশ্য ও তাদের সামাজিক ব্যবস্থা দেখার আগ্রহে। শ্রীলঙ্কার জঙ্গলের পরিবেশে ঘুরে বেড়িয়েছি। পৃথিবী বিখ্যাত প্যাগোডা শ্রীলঙ্কাতেই। ও আর আমি ঘুরেছি ক্যান্ডি আর কলোম্বোর প্যাগোডায়। স্নান করেছি কলোম্বোর সমুদ্র সৈকতে।

গিয়েছি থাইল্যান্ড। পর্যটকদের আনন্দের রসদে ভরপুর ব্যাংকক পাটায়া — নাচ গান, থাই মেয়েদের শারীরিক শৈলী ও বৈভব, প্যারা সেলিং, সমুদ্রের নিচে ডাইভিং, আন্ডার ওয়াটার ওয়ার্লড, কোরাল আইল্যান্ড, আলকাজরা নাইট শো, গো গো শো, জংগল সাফারি, ম্যাসাজ পার্লার প্রভৃতি।

সিঙ্গাপুর উন্নতির চূড়ান্তে একটি দেশ কোথায় পৌঁছোতে পারে নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না। সিঙ্গাপুর ফ্লায়ার, মেরিনা বে হোটেল, মারলিয়ন, বে গারডেন, নাইট সাফারি,

ইউনিভারসাল স্টুডিও, সেন্টোসা আইল্যান্ড, জুরং বার্ড পার্ক প্রভৃতি জায়গায় অনেক সময় কাটিয়েছি।

মালয়েশিয়াতে পেট্রোনেস টুইন টাওয়ার পৃথিবীর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ টাওয়ার। উচ্চতা ৪৫১.৯ মিটার (১৪৮৩ ফুট)। পেট্রোনেস টাওয়ারের একেবারে উপরে উঠে সারা কুয়ালালামপুর শহরটা দেখলাম। কুয়ালামপুর টাওয়ার, বাটু কেভ ঘুরে দেখলাম একই সঙ্গে।

চিন দেশে যাওয়ার ইচ্ছেটাও মনের মধ্যে পুষে রেখেছিলাম দীর্ঘদিন। বেরিয়ে পড়লাম একদিন দু'জনে পুজোর অবকাশে। সাংহাই বেজিং কুনমিন ঘুরলাম। বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্যের একটি চিনের প্রাচীর। বহুদিনের শখ ছিল আমাদের চিনের প্রাচীর দেখার। চিনের প্রাচীরে উঠেছিলাম ওই প্রাচীরের সিঁড়ি বেয়ে। বুলেট ট্রেন, ম্যাগনেটিক ট্রেন, সাংহাই টাওয়ার, ক্ষুদ্র ও ভারি শিল্পের উন্নতি অনেক কিছু ঘুরে দেখলাম। চিনের অ্যাক্রোব্যাট বিশ্বখ্যাত। সেটাও দেখলাম অনেক রাত পর্যন্ত। চিনের প্রাচীন রাজাদের রাজবাড়ি নিয়ে বিশাল এলাকা জুড়ে তৈরি ফরবিডেন সিটি– সেটাও অনেকক্ষণ ঘুরে দেখলাম। তিয়েন আন মেন স্কয়ারে গেলাম। অনেকটা সময় কাটালাম। তিয়েন আন মেন স্কয়ারের ঘটনা এখন ইতিহাস। বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল মনটা।

ছোটো দেশ হংকং। সেখানেও একই সঙ্গে ঘুরে নিলাম। ভিক্টোরিয়া পিক, পিক ট্রাম ও হংকং মেরিটাইম মিউজিয়াম। ওখানে ডিজনি ল্যান্ডে মজা করলাম। সবই খোলা মেলা। সবাই খোলা মেলা। উপভোগ করলাম সব।

পাশে ছোটো দেশ ম্যাকাউ। ওখানে গরিব বলে কেউ নেই। পর্যটকদের ভীড়ে ঠাসা ম্যাকাউ।

কিছুদিন হল ঘুরে এলাম ইউরোপ। লন্ডনের মাদাম তুসোর যাদুঘরে মূর্তিগুলো প্রাণবন্ত। লন্ডন শহরে গাড়িতে ঘুরলাম আর দুই নয়নভরে দেখলাম শহরটির বিশালত্ব, সৌন্দর্য আর আভিজাত্য। টেমস নদি, টাওয়ার ব্রীজ, বিগ বেন, লন্ডন আই, ওয়েস্ট মিনিস্টার প্যালেস, ওয়েষ্ট মিস্টার অ্যাবে, হউস অফ লর্ডস, হউস অফ কমনস, রানীর বাকিংহাম প্যালেস, সেন্ট পল ক্যাথেড্রাল, পিকাডেলি সার্কাস, ট্রাফালগার স্কয়ারে ঘুরেছি। ১৩৫ মিটার (৪৪৩ ফুট) উঁচুতে লন্ডন আইয়ের ক্যাপসুলে চড়ে সারা লন্ডন দর্শন চরম উত্তেজনাকর।

সমুদ্রের নিচে ৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ ইউরোটানেল দিয়ে হাই স্পিড ট্রেনে ইংল্যান্ড থেকে ফ্রান্স পৌঁছোলাম। আমরা যে বাসটি নিয়ে ঘুরছিলাম সেই গোটা বাসটিই ঢুকিয়ে দিল ট্রেনটির ভিতরে। সেই বাসটি নিয়েই ট্রেনটি সমুদ্রের নিচ দিয়ে ইউরো টানেল হয়ে পৌঁছে গেল ফ্রান্সে।

প্যারিসে পৌঁছে ঘুরে ঘুরে দেখলাম গারনিয়রের অপেরা, ইউরো ডিজনি, ওয়াল্ট ডিজনি স্টুডিও, পিরামিড অফ লওভরে মিউজিয়াম, প্যালেস ডি লা কনকরড (গিলোটিনের জন্য

কুখ্যাত), চ্যামপস এলিসিস, নেপোলিয়নের আর্ক ডি ট্রাম্ফ, প্যারিসের প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য মধ্যরাতের লিডো শো, প্যারিস বাই নাইট, হোটেল ইনভ্যালিডাস, ক্যাথেড্রাল নট্রেডামে ডি প্যারিস, গথিক রয়াল চ্যাপেল অফ সেইন্টি-চ্যাপেলি, লি ডে লা সিটি, ব্যাসিলিকা অফ সাক্রে কোয়ের প্রভৃতি দেখলাম, ঘুরলাম। শেন নদিতে রিভার ক্রুজে বিকেল বেলায় প্যারিসের বিশাল বিশাল অট্টালিকা আর নদির দুই পাড়ের দৃশ্য ভুলতে পারব না কোনদিন। পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম ১৮৮৭-১৮৮৯ সালে নির্মিত প্যারিসের (৩২৪ মিটার) ১০৬৩ ফুট উঁচু আইফেল টাওয়ারে উঠে প্যারিস শহরটিকে দেখলাম উপর থেকে। গাড়িতে ঘুরে ঘুরে দেখলাম প্যারিস শহরটি। ভবনগুলোর কারুকার্য আর গাম্ভীর্যে বিশ্বের অন্যতম সেরা অভিজাত শহর প্যারিস।

স্বপ্নের দেশ সুইজারল্যান্ডে জেনেভা লেক, জেনেভা ফাউনটেন, ফ্লোরাল ক্লক, গ্লেসিয়ার, ভূপৃষ্ঠ থেকে ৯০০০ হাজার ফুট উঁচুতে বরফের পর্বতে হাই স্পিড রোলার কোস্টারে চড়ে বরফের উপর থ্রিলার, আল্পস পর্বতমালায় মাইনাস ১৩ ডিগ্রী সেলসিয়াসে জাংফ্রু পর্বতের উদ্দেশ্যে কগ-হুইল ট্রেনে যাত্রা।

সুইজারল্যান্ডে জেনেভা শহর ঘুরে এলাম। জাতিসংঘের কার্য্যালয় দেখলাম দূর থেকে। লুসার্ন এ লায়ন মনুমেন্ট চমকপ্রদ। চ্যাপেল ব্রিজ, জেসুইট চার্চ ঘুরলাম কিছুক্ষণ।

ছোট্টদেশ লিচেনস্টিন, রাজধানী ভাডুজ। ভাডুজ ক্যাসল ও সিটি সেন্টার দর্শনীয়।

অস্ট্রিয়া পাশের দেশ। অস্ট্রিয়ার শহরে স্বরভস্কিতে কৃস্টাল ওয়ার্ল্ড বিশ্ববিখ্যাত। ইন্সব্রাক অস্ট্রিয়ার আর এক ঐতিহাসিক শহর। সেখানেও বেশ ভালো লাগল।

গোল্ডেন ডাচ প্রাসাদের একটা অংশ শোনায় মোড়ানো। ইম্পেরিয়াল চার্চ, ইম্পেরিয়াল প্যালেস এবং অ্যামব্রাস ক্যাসল যা বর্তমানের বিখ্যাত যাদুঘর, ষোড়শ শতকের হফবার্গ যা রাজকীয় প্রাসাদ, অবাক বিস্ময়ে দেখেছি।

ইউরোপ ভ্রমণের অন্যতম আকর্ষণ ছিল ইটালি। ভেনিস পৌঁছেই সান মার্কোর ক্যানাল ক্রুজ, ডগিস প্যালেস, সেন্ট মার্কস স্কয়ার এবং বাসিলিয়া চোখ ধাঁধানো সব। গান্ডোলায় চড়ে ভেনিসের ক্যানাল ক্রুজ। বহুতল সুদৃশ্য বাড়ি ঘর আর খাল—মোট ১১৭টি দ্বীপ, কোন রাস্তা নেই, গাড়ি নেই। নৌকাই একমাত্র ব্যবস্থা। ডগিস প্যালেস যেখান থেকে অন্য বন্দিদের মাঝ থেকে সেই বিখ্যাত প্রেমিক কাসানোভার পালিয়ে যাওয়ার কাহিনিও শুনেছি। মোরানো গ্লাস হাউজে চোখ আটকে গেল। কি দক্ষতায় ওদের কারিগর ও কুশলিরা বিভিন্ন সৌখিন দ্রব্য তৈরি করছেন।

গিয়েছি পিসায়। এই পিসাতেই গ্যালিলিওর জন্ম। সেখানে সপ্তম আশ্চর্যের এক আশ্চর্য পিসার হেলানো মন্দির। ১৮৩ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট এই উঁচু টাওয়ারটি হেলানো অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। ফ্লোরেন্সে গেলাম—মাইক অ্যাঞ্জেলোর যাদুঘর দেখতে। এখানেই ডুওমো

অবস্থিত— পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম ক্যাথেড্রাল। পাশেই শহরের প্রাচীনতম সেতু পন্টি ভিসিও যা রক্ষা পেয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে। বাকি সকল সেতু ধ্বংস করা হয়েছিল।

ইটালির রাজধানী রোমে আর্চ অফ কনস্টানটাইন, পিনাজ্জা ভেনিয়াজা পরিদর্শন করলাম। সার্কাস ম্যাকসিমাস—এখানে প্রাচীন কালে যুদ্ধরথ প্রতিযোগিতা হত। এখানে বিখ্যাত বেন হুর সিনেমার শুটিং হয়েছিল।

রোম প্রদক্ষিণের সময় ঢুকলাম ভ্যাটিকান সিটিতে। পৃথিবীর সবচেয়ে ছোটো দেশ। এখানেই বিখ্যাত সেন্ট পিটার্স স্কয়ার ও সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকা অবস্থিত। পৃথিবীর সব চেয়ে বড় গীর্জা। সৌভাগ্য হয়েছিল পোপকে একেবারে কাছ থেকে দেখার।

ইচ্ছা ছিল যে বীর যোদ্ধা গ্লাডিয়েটরদের দিয়ে মারণ লড়াইয়ের প্রদর্শন হত যেখানে সেই কলোসিয়াম স্টেডিয়ামটি দেখব। ওখানে গিয়ে দেখলাম বিরাট স্টেডিয়াম যেখানে এক বীরকে অন্য বীরের সঙ্গে এমনকি ওদের হিংস্র সিংহের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেওয়া হত প্রাচীন কালে। আমৃত্যু লড়তে হত। আর রাজপরিবার ও রাজন্যদের সকলে কলোসিয়ামে বসে সেটা উপভোগ করত, উল্লাস করত। সেই সকরুণ ঘৃণ্য ইতিহাসের সাক্ষী কলোসিয়াম আজও দাঁড়িয়ে আছে।

রোমের ট্রেভি ফাউনটেন এ গেলাম শেষ দিন। ওখানে সকলে যায় বাম কাঁধের উপর দিয়ে মুদ্রা নিক্ষেপ করে মনোবাসনা পূর্ণ করার আশায়। কুসংস্কারে বিশ্বাস করি না কিন্তু সকলের দেখাদেখি আমরা দুজনেই মুদ্রা নিক্ষেপ করেছিলাম আনন্দে আর উৎসাহে।

পুরো বিশ্ব ভ্রমণের ইচ্ছে আছে ওর আর আমারও।

স্মরণীয় হয়ে আছে আমাদের মিশর ভ্রমণ। সেই ভ্রমণকাহিনি গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হচ্ছে দেখে আমিও আনন্দ বোধ করছি।

মিশর ভ্রমণ নিয়ে বই লিখবে বলে ও একটা পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছিল ভ্রমণ শেষে বাড়ি ফিরে। সংগঠন, ডাক্তারি, সমাজসেবা এতসব ব্যস্ততার জন্যে আর সঠিক উদ্যোগের অভাবেই এই দেরি। সর্বভারতীয় চিকিৎসক সংগঠন ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের পশ্চিমবঙ্গের শীর্ষপদে (রাজ্য সভাপতি) থাকার জন্য অসম্ভব ব্যস্ত থাকতে হয় তাকে। সেই সঙ্গে সিনিয়র সিটিজেনস ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি হিসাবেও বয়স্ক নাগরিকদের জন্য ওকে খুব পরিশ্রম করতে হয়। তাকে এসবে অনেক সময় দিতে হচ্ছে।

আমার উৎসাহেই অনেক রাত জেগে অনেক পরিশ্রমে লেখাটি শেষ করেছে অসম্ভব দ্রুততায়। গত কয়েক মাস ধরে দেখেছি মিশর নিয়ে তার পড়াশোনা আর গবেষণা চলেছে দিনরাত। আমাকে বলেছে, মিশর ভ্রমণে শুধু বেড়ানোর কথা লিখলে তো হবে না। লিখতে হবে সমগ্র মিশরের ইতিহাস, ভূগোল, পুরাকীর্তি আর ফারাওদের কথা। পাঁচ হাজার বছরের মিশর সভ্যতার পটভূমি ও পরিবর্তনের ক্রমান্বয় বিবরণ থাকতে হবে এই মিশর ভ্রমণের

বইটিতে। এই বইটিতে পাঠক পাবেন একই সঙ্গে সাহিত্য, ইতিহাস, ভুগোল ও তথ্য যা ভিন্ন এক স্বাদ এনে দেবে।

আশা করি ডা. তপনকুমার বিশ্বাসের লেখা 'মিশর-মমি পিরামিড ও নীলনদের দেশে' বইটিতে তার অনুরাগি পাঠককুল আলাদা আনন্দ পাবেন। এই বইটিতে পাবেন পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের একটি–পিরামিড আর তার সঙ্গে মমি, স্ফিংস, আবু সিম্বেল টেম্পল, ভ্যালি অফ দি কিংস, ভ্যালি অফ দি কুইনস, নীলনদ প্রভৃতির বিশদ বিবরণ এবং মিশরের প্রাচীন রাজবংশ–ফারাওদের শাসন আমল, গ্রীস, ফরাসি, রোম, ব্রিটিশ শাসন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ইতিহাস। বইটিতে আলেকজান্ডার দি গ্রেট, জুলিয়াস সিজার, নেপোলিয়ানের মিশর অভিযান কাহিনির মধ্যে পাঠক চিন্তা ভাবনার রসদ পাবেন। পাঠকদের অশ্রুসিক্ত করবে ক্লিওপেট্রা ও অ্যান্টনির মহান প্রেম কথা ও সর্বশেষ তাদের দু'জনের আত্মহত্যার করুণ কাহিনি।

একটা কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে এক বছরেই তার তিনটি বইয়ের প্রকাশনা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তার এই প্রকাশনার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখতে পেরে নিজেও গর্ববোধ করছি।

ডা. দীপালী বিশ্বাস

৩১শে ডিসেম্বর ২০১৮

(Mobile 9433125195, 9830175549)
সরোজ পার্ক, বারাসাত
কোলকাতা - ৭০০১২৪

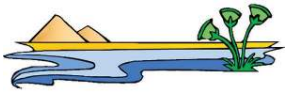

স্বীকৃতি

ভ্রমণ আমার বহুদিনের নেশা। ইতিমধ্যে পৃথিবীর অনেক দেশেই বেড়াতে গিয়েছি। তার মধ্যে মিশর দেশটি আমাকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে। আমি লক্ষ্য করেছি মিশরের সুদীর্ঘ ইতিহাস, ভৌগোলিক বৈচিত্র আর ফারাওদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে মানুষের আগ্রহ প্রচুর। আমার মিশরের উপভোগ্য ভ্রমণ বৃত্তান্তের সাথে মিশরের দীর্ঘ পাঁচ হাজার বছরের একটা বিবরণ এখানে উপস্থাপন করতে সচেষ্ট হয়েছি। ভেবেছি আমার স্বচক্ষে দেখে আসা বর্ণনা সহ মিশর নিয়ে লেখা পাঠকের কৌতুহল নিবারণে অনেকটা সাহায্য করবে।

তাই মিশর নিয়ে আমার এই লেখা 'মিশর-মমি পিরামিড ও নীলনদের দেশে'। আমার এ কাজে সবচেয়ে বেশি সাহায্য পেয়েছি যার সে হচ্ছে ডাঃ দীপালী। সকলেই বলেন যে প্রতিটি সার্থক মানুষের পাশে একজন নারীর ভূমিকা থাকে। আমিও আমার চলার পথে দীপালীর শক্তি ও উৎসাহ পেয়েছি প্রতিক্ষেত্রে। সহযোগিতা পেয়েছি সব সময়ই। পৃথিবীর যে দেশেই ভ্রমণে গিয়েছি সে আমার সঙ্গে থেকেছে ছায়ার মতো। মিশর ভ্রমণেও যথারীতি সে ছিল আমার সফরসঙ্গী। মিশর সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে। তার জন্য সাধ্যমত পরিশ্রম করেছি। এই ভ্রমণ কাহিনিটি লিখতে গিয়ে তার সাহায্য আমার কাজকে সহজ করে দিয়েছে। সারা দিনের সব কাজ শেষ করে অনেক রাত জেগে যখন লিখতে বসেছি তার সাহচর্য পেয়েছি। মিশরের বিভিন্ন তথ্যও প্রয়োজনে সরবরাহ করেছে সে।

আলোর সন্ধানে আমার যাত্রা শুরু ছোটবেলা থেকে আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের একান্ত স্নেহে আর ঘনিষ্ঠ তত্ত্বাবধানে এবং তাঁর আদর্শেই আমার বড়ো হওয়া। মাতৃক্রোড় থেকে সকলের মতো আমারও বেড়ে ওঠা। মায়ের অনুপ্রেরণাই আমার পাথেয়। এখনও মা আমাদের পরিবারের অভিবাবক। যে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে হলে মায়ের অংশগ্রহণ থাকবেই। আমার দুই ছেলে রাজেশ আর মুকেশ—ওরা বড়ো হয়ে উঠেছে। বড়ো ছেলের বিয়ে দিয়েছি। পুত্রবধূ দীপিকা সত্যিকার অর্থে আমার আর দীপালীর কন্যাসম আদরে আমাদের সংসারটি তার বুদ্ধিমত্বায় শক্ত হাতে ধরেছে। মা আর দীপিকা এই দুজনেই এখন আমাদের চালিকাশক্তি। ছয়জনে মিলে আমাদের সংসার। দেশ বিদেশ যতই ঘুরে বেড়াই, চাকচিক্যের মধ্যে অবস্থান

করি—বাড়ির মানুষের কথাই আমরা ভুলতে বসি অনেক সময়। উপেক্ষাও করি তাদের অবদানের কথা কখনও সখনও। তারা পাশে না থাকলে আমার অস্তিত্বই যে শূন্য সেটা মাঝে মাঝেই আমার আমিত্বে হারিয়ে ফেলি।

প্রখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক কৃষ্ণা বসু আমাকে এই বইটি লিখতে বিভিন্ন ভাবে উপদেশে দিয়েছেন, সে জন্য আমি তাঁর নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আমি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সে সকল শুভানুধ্যায়ী, বন্ধু, সাংবাদিক ও লেখকদের যারা সব সময়ে আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন আমার এই প্রকাশনায়। আমাকে এই ভ্রমণকাহিনী লিখতে উৎসাহ দিয়েছেন ও সাহায্য করেছেন সতীর্থ লেখক ও সংগঠক ডাঃ দুলালকৃষ্ণ দাস, আই এম এ বারাসাত শাখার সম্পাদক ডাঃ বিশ্বজিৎ সাহা ও বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক শ্রী রাখালরাজ চট্টোপাধ্যায়। তাদের পরামর্শ আমাকে বিশেষ অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। আমি তাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

ডা. তপনকুমার বিশ্বাস

৩১শে ডিসেম্বর ২০১৮
সরোজ পার্ক, বারাসাত
কলকাতা-৭০০১২৪

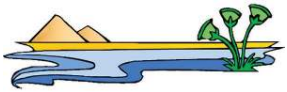

Acknwoledgement

My passion is to visit various tourist destinations across the Globe. By this time I have travelled so many countries of the World. Amongst all these countries Egypt has stirred me enormously. I have seen people having extra eagerness to know about the eventful long history of Egypt, geographical diversity of the country, colourful lifestyle and dynamism of the ancient Pharaohs. I have tried to write my pleasant tour experiences in my inscription of Egypt with a description of it's long Five Thousand years history. I thought that my personal experience gathered during my tour in Egypt if depicted here, may help my readers to meet with their inquisitiveness about the country.

That is why my this writing 'Egypt-Land of Mummy Pyramid and River Nile'. The best help I got in every field of life is from my wife Dr. Dipali. It is being told that behind every successful man there is a woman. About me undoubtedly it happened so. Always what I feel that I got maximum strength, inspiration and cooperation from her, not only in case of writing this book but in every aspect of my life. While writing the scripts of this book she helped me a lot with information and her experiences of Egypt tour.

My journey towords light began with close and ample guidance of my father from my boyhood. Like others my growing up also took place in the lap of my mother and till now she is my Philosopher. Even today she is the guardian of our family. She takes part in all events of every decision making of our family. My two sons – Rajesh and Mukesh are now grown up. My eldest son Rajesh got married in 2017. My daughter-in-law Deepika, who is like my own daughter. My mother and Deepika are actually maintaining our home. With these six members is my family. We forget the contribution of our family members while we are achieving

outside and think only about self. My family members are my primordial source of inspiration.

Eminent Poet, Writer and Litterateur Krishna Basu helped me with her advice in writing this Book. I express my heartiest gratitude to her.

I express my sincere gratitude to all my well-wishers, friends, journalists and writers who constantly helped me in publishing this book. I specifically convey my gratitude to my colleague, Dr. Dulal Krishna Das, writer and organiser, Dr. Biswajit Saha, Secretary, IMA Barasat Branch and Sri Rakhalraj Chattopadhyay, eminent writer, and Social Activist.

Their advice has helped and inspired me a lot during planning and making the script. I am grateful to them.

Author
Dr. Tapan Kumar Biswas

31st December 2018
Saroj Park, Barasat
Kolkata-700124

লেখক পরিচিতি

ডা. তপনকুমার বিশ্বাস এমবিবিএস, এফসিজিপি (দিল্লী)

রাজ্য সভাপতি
ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন,
বঙ্গীয় রাজ্য কমিটি

সভাপতি
ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন,
বারাসাত শাখা

সভাপতি
সিনিয়র সিটিজেনস ওয়েলফেয়ার সোসাইটি

বাসস্থান
সরোজ পার্ক, বারাসাত,
কলকাতা-৭০০১২৪

চেম্বার
রেড হার্ট, টাকি রোড, বারাসাত,
কলকাতা - ৭০০১২৪

ডা. তপন কুমার বিশ্বাস পেশায় একজন চিকিৎসক ।
তিনি একজন দক্ষ সংগঠন, সমাজসেবী, সুলেখক ও সুবক্তা।
বর্তমানে তিনি ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন, বঙ্গীয় রাজ্য কমিটির রাজ্য সভাপতি।
তিনি ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন, বারাসাত শাখার সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন ২০০৬ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত। তিনি ১৯৯৩ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন, বারাসাত শাখার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি দীর্ঘ সময় বারাসাত স্টুডেন্টস হেলথ হোমের সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন।

তিনি সিনিয়র সিটিজেনস ওয়েলফেয়ার সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি।

তিনি বারাসাত পৌরসভার নির্বাচিত পৌরপ্রধান পারিষদ ছিলেন এবং পাঁচ বছর তিনি জনসাধারণের কল্যাণের জন্য নিষ্ঠা ও সুনামের সঙ্গে এ দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি কলকাতা থেকে প্রকাশিত সর্বভারতীয় স্বাস্থ্য পত্রিকা 'ইওর হেলথ' এর সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন।

তিনি কলকাতা থেকে প্রকাশিত আই এম এর 'নিউজ ম্যাগে'এ নিয়মিত লেখেন।

তার ছোটোবেলা থেকেই লেখার অভ্যাস। তিনি স্কুল ও কলেজের পত্রিকাতেও নিয়মিত কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ লিখতেন।

তার কর্মব্যস্ততার মধ্যে তিনি তার লেখা দুটি কাব্যগ্রন্থ 'ফিরে আসা' ও 'জেগে আছি' প্রকাশ করেছেন। ইতিমধ্যে এই কাব্যগ্রন্থ দুটি পাঠকদের মধ্যে প্রচুর আগ্রহের তৈরি করেছে। মিশর ভ্রমণ নিয়ে তার লেখা 'মিশর-মমি পিরামিড ও নীলনদের দেশে' পাঠকের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এই বইখানি প্রচুর তথ্যসমৃদ্ধ। মিশরের বিশদ ইতিহাস, ভৌগোলিক বর্ণনা ও ভ্রমণ বৃত্তান্ত সব রয়েছে বইখানিতে।

তিনি সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্স ও ইন্ডিয়ান রেডক্রস সোসাইটির আজীবন সদস্য।

তিনি একসময় রোটারি ইন্টারন্যাশনালের সদস্য ছিলেন।

তিনি ভারত বর্ষের প্রায় সকল রাজ্য ও বড়ো বড়ো শহর ভ্রমণ করেছেন সাংগঠনিক ও পেশাগত কারণে।

তিনি বিশ্বের অনেক দেশ ভ্রমণ করেছেনঃ মিশর, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, চিন, হংকং, ম্যাকাও, ইউরোপের গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, লিচেনস্টেন, ইতালি, ভ্যাটিকান সিটি প্রভৃতি।

ডাঃ তপনকুমার বিশ্বাস ১৯৫৫ সালের ৮ই জুলাই পূর্ববঙ্গের যশোর জেলার বাগডাঙা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তার মা শ্রীমতি নিশারানী বিশ্বাস তার সঙ্গে এক পরিবারেই থাকেন। তার মা তার পরিবারের অভিভাবক ও তার দার্শনিক। তার বাবা শ্রী হরিদাস বিশ্বাস ১৯৯৪ সালের ২৫শে নভেম্বর পরলোক গমন করেন। তার বাবা ছিলেন বিশেষ সমাজসেবী ও পরোপকারী। সমাজে তাঁর অবদানের কথা এখনও মানুষ স্মরণ করে। ডা. তপনকুমার বিশ্বাস তার বাবার আদর্শে বড় হয়েছেন শৈশবকাল থেকেই।

তার স্ত্রী ডাঃ দীপালী বিশ্বাস তার সকল কর্মপ্রেরণার উৎস সকল সময়েই। ডাঃ দীপালীর সঙ্গে ১৯৮৪ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি তারিখে তার বিয়ে হয়। ডাঃ দীপালীর চিকিৎসক হিসাবে এলাকায় যথেষ্ট সুনাম আছে।

তার তিন ভাই, শ্রী স্বপন বিশ্বাস, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারি, শ্রী অমল বিশ্বাস, কবি ও শিক্ষক ও ডাঃ শ্যাম সুন্দর বিশ্বাস-বিশিষ্ট চিকিৎসক। ডাঃ শ্যাম সুন্দর বিশ্বাসের স্ত্রী স্বপ্না বিশ্বাসও বিশিষ্ট চিকিৎসক।

ডা. তপনকুমার বিশ্বাসের দুই ছেলে। বড়ো ছেলে ডাঃ রাজেশ বিশ্বাস পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য বিভাগে কর্মরত। বর্তমানে তিনি কলকাতা মেডিকেল কলেজে স্ত্রীরোগের উপর পোষ্ট-গ্রাজুয়েশন করছেন। রাজেশের বিয়ে দিয়েছেন। তার স্ত্রী দীপিকা দাহাল।

ছোটো ছেলে শ্রী মুকেশ বিশ্বাস একজন ইঞ্জিনিয়ার। তিনি আই আই টি রুড়কি থেকে এম টেক পাশ করেছেন। বর্তমানে ব্যাঙ্গালোরে একটি নামী কোম্পানিতে কনসালটেন্ট পদে চাকরি করেন।

ডা. তপনকুমার বিশ্বাস চিকিৎসা পেশার বাইরে সমাজ সেবার কাজে নিযুক্ত থাকেন। তার অমায়িক ব্যবহারের জন্য তিনি একজন দরদী চিকিৎসক হিসাবে মানুষের নিকট পরিচিত।

তিনি দেশের বাইরে ও সারাদেশের বিভিন্ন জায়গায় সমাজের বিভিন্ন স্তরে স্বাস্থ্য সচেতনতা ও সমাজ সচেতনতা বিষয়ে বক্তৃতা করতে যান।

তিনি রক্তদান আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয় ভাবে জড়িত।

তিনি দুঃস্থ শিশু ও মহিলাদের চিকিৎসা ও বিভিন্ন প্রকার সহায়তা ও পরিষেবা প্রদান করে থাকেন।

তিনি বয়স্ক নাগরিকদের বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা সহ অন্য বিভিন্ন প্রকারে সহায়তা প্রদান করেন। তিনি বারাসাত আই এম এ ও বয়স্ক চিকিৎসা কেন্দ্রে সিনিয়র সিটিজেনদের বিগত দশ বছর ধরে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা ও স্বাস্থ্য সচেতনার পরামর্শ দিয়ে আসছেন।

About The Author

Dr. Tapan Kumar Biswas, MBBS, FCGP (Delhi)

State President
Indian Medical Associaion
Bengal State

President

Indian Medical Association
Barasat Branch

President

Senior Citizens Welfare Society
Barasat

Residence:
Saroj Park, Taki Road
Barasat, Kolkata-700124

Chamber :

Red Heart, Saroj Park, Taki Road
Barasat, Kolkata-700124
Mobile : 9433125195, 7980044732

Dr. Tapan Kumar Biswas is a physician by profession.
He is an Organizer, Social Worker, eminent Writer and an Orator.

Now he is the **State President of Indian Medical Association, Bengal State.**

Previously he held the post of **Secretary** of **Indian Medical Association, Barasat Branch** from 1993 to 2004.

He has been holding the post of **President** of **Indian Medical Association, Barasat Branch** since 2006 till date.

He is the **Founder President** of **Senior Citizen's Welfare Society,** Barasat.

He was the elected **Chairman in Council, Barasat Municipality** for five years and worked for the common people with utmost sincerity as people's representative.

He was the **Secretary** of all India Health Magazine 'Your Health' for a long period.

He was the **President** of **Student's Healthe Home**, Barasat.

He is the **Life Member** of **Indian Red Cross Society** and **St. John Ambulance.**

He was a member of **Rotary International.**

He is a regular writer of **'News Mag'** published form Kokkata (IMA Bengal State)

He had been writing poems, stories and articles on different aspects since his School and College liffe.

Within this busy schedule he is in constant touch with literature. He has published two Bengali poetry books : **'Firey Asha'** and **'Jege Achhi'** - have attracted readers with a distinct eagerness to his writings.

'Egypt-Land of Mummy Pyramid and River Nile' is his third book. He has depicted his experiences of Egypt Tour and elaborate information - ancient History of last 5000 Years and Geography regarding Egypt in this book. This high standard book will be a comprehensive roadmap on Egypt to many who are interested in Egypt.

He has travelled almost all States and cites of India on his organisational and professional interest.

He has visited so many countries of the world. He has visited : Egypt, Srilanka, Thailand, Singapore, Malaysia, China, Hong Kong, Macau, European Countries : Great Britain, France, Switzerland, Austria, Lichtenstein, Italy, Vatican City etc.

Dr. Tapan Kumar Biswas was born on 8th July 1955 in Vill : Bagdanga, Jessore District, East Bengal.

His mother **Smt. Nisha Rani Biswas** is with his family as Guardian and his Philosopher. His father **Sri Haridas Biswas** passed away on 25th November 1994. His father was a Social Worker and helped so many poor people. Even today people remember Sri Haridas Biswas for his contribution to the society. Sri Haridas Biswas is his Idol since his childhood.

His wife **Dr. Dipali Biswas** is all along his inspiraion. He married Dr. Dipali on 23th February 1984. Dr. Dipali Biswas is a renouned Doctor and has earned a name in the area.

He has three brothers : **Sri Swapan Biswas**, **Sri Amal Biswas** and **Dr. Shyam Sundar Biswas**. Dr Shyam Sundar Biswas is a reputed doctor. His wife **Dr. Swapna Biswas** is also a good doctor. Both of them have been residing at Kolkata. Amal Biswas is a poet and teacher.

He has two sons. **Dr. Rajesh Biswas** the elder son got MBBS form Medical College, Kolkata and joined in **Health Service of Government of West Bengal.** Now he has been doing Post Graduation in Gyneocology in Medical College, Kolkata. Elder son Rajesh Biswas got married with **Deepika Dahal.**

Younger son **Mukesh Biswas** is an **IIT Engineer,** got **M.Tech** from **IIT Roorkee.** Now he is in a prestigious job at Bangalore as Consultant in a reputed Farm.

Dr. Tapan Kumar Biswas is social activist. As a Physician he has earned a reputation amongst the people for his affecionate behavior to his patients. He is attached with several Social Welfare Organisations.

He addresses on diferent topics on Health Awareness in Workshops, Meetings and Seminars in and around India and outside the country.

He is actively involved with Blood Donation Movement.

He has been working for the Welfare, Health Awareness and Free Treatment of the Senior Citizens through IMA Geriatric Clinic, Barasat. He helps distressed Children and Mothers through different organizations.

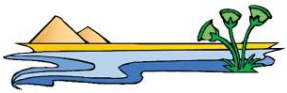

সূচীপত্র
(Contents)

- প্রস্তুতি পর্ব (Preperation) ২৯
- কায়রো আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর (Cairo International Airport) ৩৭
- মিশরের প্রাচীন রাজবংশ (Egypt-Ancient Dynasty) ৩৯
- মিশরের প্রাচীন দেবতা (Ancient Gods of Egypt) ৪৭
- মিশর ও মিশরের রাজধানী কথা (Egypt and it's Capitals) ৫০
- কায়রো যাদুঘর (Cairo Museum) ৫৯
- হাইরোগ্লাইফিক (Hieroglyphic) ৬৭
- মমি (Mummy) ৭১
- একটি আতরের শোরুম (An Attar Showroom) ৭৬
- খালিলি মার্কেট (Khalili Market) ৭৮
- ট্রেনে আসোয়ান যাত্রা (To Aswan by Train) ৮১
- আসোয়ান বাঁধ (Aswan High Dam) ৮৫
- ফিলি দ্বীপ-ফিলি টেম্পল (Philae Island-Philae Temple) ৯৯
- আবু সিম্বেল টেম্পল (Abu Simbel Temple) ১১১
- কম ওমবো (The Temple of Kom Ombo) ১২৭
- বেলি ড্যান্স (Belly Dance) ১৩৩
- এডফু (The Temple of Edfu) ১৩৯

- নীলনদ (The River Nile) ১৪৭
- নীলনদে ভ্রমণ (Nile Cruise) ১৫৩
- ভ্যালি অফ দি কিংস (Valley of the Kings) ১৫৭
- তুতেনখামুন (Tutankhamun) ১৬৩
- ভ্যালি অফ দি কুইনস (Valley of the Queens) ১৭৩
- কারনাক টেম্পল (Karnak Temple) ১৭৭
- আলেকজান্দ্রিয়ার পথে (To Alexandria) ১৮১
- আলেকজান্দ্রিয়া ন্যাশনাল মিউজিয়াম (Alexandria National Museum) ১৮৫
- আলেকজান্দ্রিয়া (Alexandria) ১৯০
- টলেমি রাজবংশ (Ptolemaic Dynasty) ১৯৬
- ক্লিওপেট্রা (Cleopetra) ২০১
- মিশরে মুসলিম শাসন ও ইসলাম (Muslim Rule in Egypt and Islam Religion) ২১২
- মিশরের স্বাধীনতা (Independence of Egypt) ২১৫
- কেনাকাটা (Shopping) ২১৯
- লাইট এন্ড সাউন্ড শো (Light and Sound Show) ২২৩
- পিরামিড (Pyramid) ২২৭
- গ্রেট পিরামিড অফ গিজা (Great Pyramid of Giza) ২৩৩
- ফারাও খাফরের পিরামিড (Pyramid of Khafre) ২৩৯
- মেনকাউরের পিরামিড (Pyramid of Menkaure) ২৪৫
- পিরামিড ধ্বংসের চেষ্টা (Attempted demolition of the Pyramid) ২৪৯
- স্ফিংস (Sphinx) ২৫৩
- ঘরে ফেরা (Back Home) ২৫৯
- লেখকের কিছু স্মৃতি ২৬১

মিশর অভিযানের দল (Team Egypt)

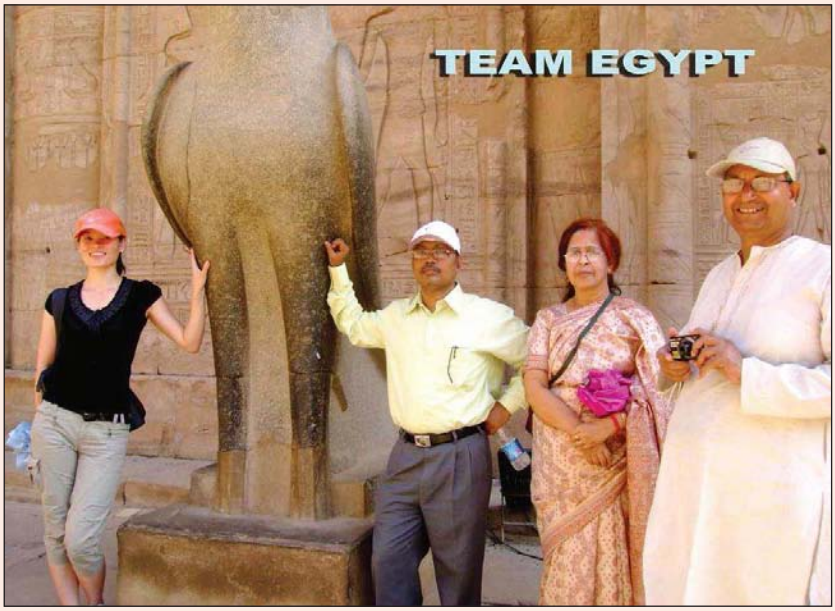

TEAM EGYPT

EGYPT TEAM

TEAM - EGYPT TOUR

TEAM EGYPT

TEAM- EGYPT TOUR

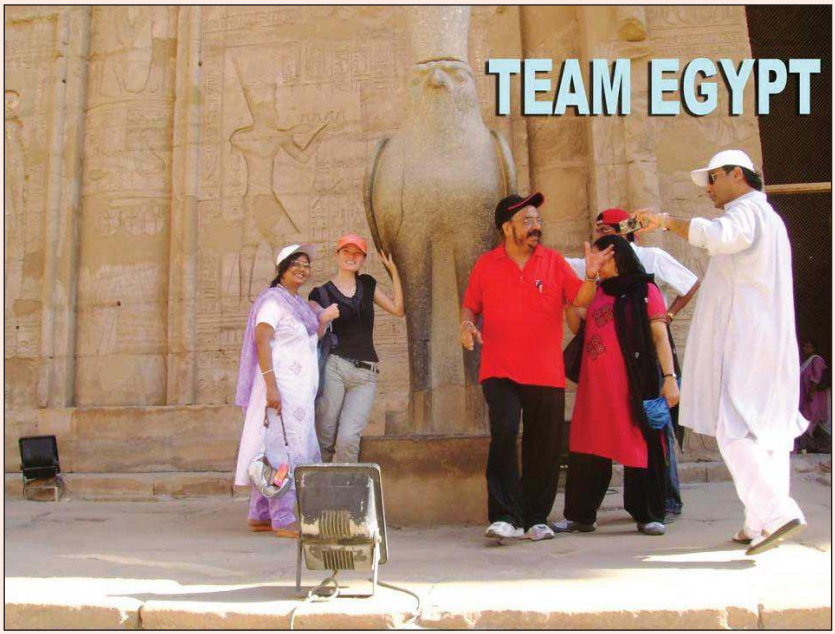
TEAM EGYPT

মিশরের মানচিত্র

মিশরের জাতীয় পতাকা

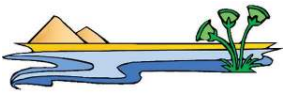

প্রস্তুতি পর্ব
Preparation

সেদিন রাত্রে চেম্বার থেকে বাড়ি ফিরেছি। দীপালীও নার্সিং হোম থেকে আমার আগেই এসেছে আজ।

ঘরে ঢুকতেই মনে হল দীপালী কি যেন বলতে চায় আমাকে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি, আজ অন্য মুডে? কিছু বলবে মনে হচ্ছে?'

'ঠিক ধরেছ। তুমি ঘরে ঢোকার একটু আগেই ভারতী ফোন করেছিল।'

'ভারতী? কোন ভারতী?'

'কেন চিনলে না? ওই যে অমিতাভদা মানে ডাঃ অমিতাভ ভট্টাচার্যের স্ত্রী।'

'হঠাৎ তার ফোন! অনেকদিন পর। কি ব্যাপার? কি বলল ভারতী?'

দীপালী সরে বসে বলল, 'বলছি। আগে বসো, তারপর বলছি।'

চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলাম আরাম করে। বললাম, 'বল তোমার ভারতী দেবী কি বলেছে।'

ভারতী ফোন করে বলল, 'চল কোথাও বেড়াতে যাই। অনেক দিন তো কোথাও যাওয়া হয় না।'

ওরা এবার মিশর বেড়াতে যেতে চায়। ভারতী বলল, 'দেখ, তপনদা কে রাজি করাতে পার কিনা।' দীপালী আমার দিকে এক পলক তাকাল আমার মনোভাব বুঝতে। আমি যে এক কথায় রাজি হয়ে যাব ও তা জানত।

'চল। এ আমারও স্বপ্ন ছিল। মিশর দেখা সবার ভাগ্যে হয় না। আমার কোন দ্বিমত নেই এ ব্যাপারে। আমি যোগাযোগ করছি অমিতাভের সাথে।'

শুরু করলাম যোগাযোগ।

পৃথিবীর প্রাচীন সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম পিরামিড, তার দেশটা হল মিশর। আমারও মিশর ভ্রমণের ইচ্ছেটা দানা বাঁধতে শুরু করেছে অনেক দিন। আগ্রহ প্রবল হলেই তো শুরু হয় সাধ আর সাধ্যের সমন্বয়। মিশর ভ্রমণের আগ্রহ যখন শুরু হয়েছে তখন আর

বসে থাকা নয়। যারা মিশর ভালোবাসে তাদের খোঁজখবর শুরু করলাম। মমি দেখব, পিরামিডের ভিতরে যাব, কায়রো যাদুঘরে যাব, আলেকজান্দ্রিয়ার ইতিহাস ছুঁয়ে দেখব, অ্যান্টনি আর ক্লিওপেট্রার সাথে কথা হবে হাজার বছর পিছনে গিয়ে, এইসব স্বপ্ন আর চিন্তাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার ভাবনা শুরু হল দীপালী আর ভারতীর ফোন আলাপের রেশ ধরেই।

মানব সভ্যতা সৃষ্টির উৎসভূমিতে তুতেনখামুন, নেফারতিতি, রামেসেস, নেফারতারি ওদের সাথে মোলাকাত হবে। দেখা হবে তাদের কর্মভূমিতে। ওদের একেবারে মুখোমুখি হব মানব সভ্যতার ইতিহাসের পীঠস্থান মিশরে গিয়ে। ব্যস্ততার মধ্যেও মমি পিরামিড নীলনদ আর আলেকজান্দ্রিয়া ভ্রমণের পরিকল্পনা মস্তিষ্কে ঘুরপাক খেতে শুরু করে দিল। সাহারা মরুভূমি, ভূমধ্যসাগর, কায়রো, গিজা, নীলনদ, লাক্সার, আসোয়ান, সুদান সীমান্ত প্রভৃতি ঐতিহাসিক স্থানে ঘুরব এই নতুন পুলক ক্রমেই ভ্রমণপাগল মনটাকে উতলা করে তুলতে লাগল।

ভ্রমণপিপাসু মানুষেরা একটা সময় পার হলেই উসখুস করতে থাকে কোথাও ভ্রমণে যাওয়ার জন্য। তারা খুঁজতে থাকে সফরসঙ্গী দল। মিলেও যায় সঠিক সময়ে সঠিক মানুষ। বাঙ্গালিরা যে খুবই ভ্রমণ পাগল সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর মিশরের নাম শুনলে তো কথাই নেই। খুব অল্প সময়েই একটা দল গঠন করে ফেললাম আমরা।

আঠারো জনের দল। ২০০৮ সনের ২০শে জুলাই বেরোনো ঠিক হল।

দীপালী বলে বসল, 'তাই বলে এত গরমে মিশর ভ্রমণ? সময় পেলে না আর? অক্টোবর বা নভেম্বরে চল। তখন তেমন গরম থাকবে না।'

আমি ওকে বোঝালাম, 'এ বছর এখনই না গেলে আর হয়ে উঠবে না। সুতরাং ঠিক যখন করেছি গরমের কথা ভেবে পিছিয়ে আসতে রাজি নই।'

মিশরে ঋতু বৈচিত্র কম। আমাদের এখানে যেমন ছয় ঋতু, মিশরে তেমনি দুটো ঋতু। শীতকাল আর গ্রীষ্মকাল।

মিশরে শীতকাল নভেম্বর মাস থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত এবং গ্রীষ্মকাল মে মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত। মিশরে সবচেয়ে বেশি গরম এই সময়টায়। মিশরে দিনে প্রচণ্ড গরম আর রাতে সেই পরিমাণে ঠাণ্ডা। জুলাইয়ে ৪০ ডিগ্রী সেলসিয়াসের উপরে থাকে মিশরের দিনের বেলার তাপমাত্রা।

দীপালী চাইছিল দিনটা পিছিয়ে অক্টোবর বা নভেম্বরে করতে। ওর কথা, 'একটু ঠাণ্ডাও পড়বে আর বেড়ানোটাও ভালো জমবে।'

সকালে চায়ের কাপে চুমুক দেওয়ার ফাঁকে বলল, 'কি করে মিশর ভ্রমণ হবে? আনন্দ করতে যাওয়া না কষ্ট করতে যাওয়া?'

ওকে বাধা দিয়ে আমি বললাম, 'তুমি তো ঠাণ্ডা বা গরম দেখে পিছিয়ে যাওয়ার মানুষ নও। তুমি তো থ্রিল পছন্দ কর, আমি তো জানি। শোনো, সকল ভ্রমণেই কষ্ট আর সেই কষ্টই সারা জীবন আনন্দের খোরাক হয়ে থাকবে।'

আমি আরও বললাম, 'শোনো, আমি খোঁজখবর নিয়েছি ভালো করে। তোমাকে কষ্ট দিতে নিয়ে যাব না। আনন্দই পাবে। আমার সঙ্গে কোথাও গিয়ে তুমি এতটুকু কষ্ট পেয়েছ কখনও?'

দীপালীর দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য ওকে বললাম, 'যতদূর জেনেছি, চল ভয় নেই। মিশরে গরম থাকলেও বাতাসে আর্দ্রতা খুব কম তাই গরমটা কষ্ট দেবে না। চল বেরিয়ে পড়ি সাত পাঁচ না ভেবে।'

দীপালী খুব একটা আপত্তি করল না। তবে সম্মতি জানাল মৃদুভাবে, 'দেখ, যেটা ভালো মনে কর। মিশর যেতে চাই, তুমি যে ভাবে নিয়ে যাবে সেভাবেই যাব।'

সোৎসাহে নেমে পড়লাম যোগাযোগে আর পরিকল্পনায়।

বললেই তো ব্যাগ নিয়ে বেরোনো নয়। পাসপোর্ট ভিসা ইত্যাদি লাগবে, কাগজ পত্র প্রস্তুত করতে হবে।

ডাঃ সুনীল নাগ বিশিষ্ট শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ। তিনি ভিসা ও তৎসংক্রান্ত দায়িত্ব নিলেন। কলকাতার একটি ভ্রমণ সংস্থার সঙ্গে কথা বললেন। তারা ভিসা করে দেবে। ডাঃ নাগের বাড়িতে দুই দিন মিটিং হল আমাদের। প্রস্তুতি মিটিং বলা চলে। মিশরে কোথায় যাব, কোথায় থাকব, ভ্রমণ পরিকল্পনা ইত্যাদি সব বিশদ আলোচনা হল। সেই সুবাদে তাঁর বাড়িতে তাঁর আতিথেয়তাও উপভোগ করলাম নানাবিধ ভোজনবিলাসি রসনায় আর আড্ডায়। ডাঃ সুনীল নাগ মিতভাষী ভালোমানুষ জানতাম কিন্তু একজন ভালো ম্যানেজমেন্ট মাস্টার সেটা বোঝা গেল।

'বুঝলে তপন, আমরা তাহলে এ বছরের ২০শে জুলাই যাওয়ার দিন ফাইনাল করছি।' বলে একটা প্যাডে প্রথমেই আমার নামটি লিখে বলা শুরু করলেন সুনীলদা,— 'তুমি আর দীপালী যাচ্ছোই। তোমার দায়িত্ব বৈদ্যনাথদা অর্থাৎ ডাঃ বৈদ্যনাথ মুখার্জী ও তার স্ত্রীকে রাজি করানো। যদি আর কেউ যেতে চায় তাহলে সেটাও চেষ্টা করবে। একটা বড়ো টিম বানাতে পারলে খরচও কম পড়বে আমার মজাও বেশি পাবে। যত বড়ো টিম তত বেশি মজা। তোমার উপর আমার অনেক ভরসা, তপন।'

পাশ থেকে ডাঃ চন্দন ঘোষাল বলে উঠল, 'কেন সুনীলদা, এটা ঘোরতর অন্যায়। আমাদের উপর তোমার কোন ভরসা নেই? শুধু তপন ভরসা!'

চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে তাকে থামিয়ে অমিতাভ বলল, 'চন্দনদা, সুনীলদা হল আসল অর্গানাইজার। বোঝ না কেন? যাকে যে দায়িত্ব দিলে যে কাজটা হবে সেটা সুনীলদা

বোঝেন। তপনই পারবে লোক যোগাড় করতে। তপন এই সব দিকে ওস্তাদ। তুমি কয়টা লোক যোগাড় করতে পারবে বল তো? হ্যাঁ এটা ঠিক তুমি ভ্রমণে আমাদের যে আনন্দ দিতে পারবে সেটা কি তপন পারবে? তোমার গান শুনলে সবার মন ভরে যাবে। বরং তপনকে দায়িত্ব দাও দলটা গড়ে ফেলুক। ওই পারবে এসব কাজ।'

সুনীলদা কোন কথায় কান না দিয়ে বলে চললেন, 'তপন, তুমি মধ্যমগ্রামের ডাঃ বিজয় সান্যালের সাথে কথা বলে রাজি করাবে তাকে। এ দিকটা আমি দেখছি। তোমার অনেক যোগাযোগ। সকলের সাথে কথা বল। খুব শীঘ্রই টিম তৈরি করে ফেলতে হবে। অনেক কাজ করতে হবে যাওয়ার আগে।'

আমি বললাম, 'সুনীল দা, দায়িত্ব যখন দিয়েছেন সব হয়ে যাবে। সকলকে প্রস্তুত করান, দাদা। ২০ শে জুলাই ফাইনাল।'

ডাঃ বৈদ্যনাথ মুখার্জী ও তাঁর স্ত্রী সুচেতা মুখার্জী খুবই ভ্রমণবিলাসি। মিশরের কথা বলা মাত্রই রাজি হয়ে গেলেন। আরও বললেন, 'তপন, দেখি আমি আর কাউকে নিতে পারি কিনা। আমার এক বোন আছে সে হয়তো যাবে।'

ডাঃ মলয় সাহাও এক কথায় লাফিয়ে উঠলেন। ডাঃ অমিতাভ ভট্টাচার্য ও তার স্ত্রী ভারতী ভট্টাচার্য যাচ্ছেন।

ডাঃ বিজয় স্যান্যাল রাজি।

মিশর শুনেই বলে উঠল, 'বলিস কি? এ সুযোগ কেউ ছাড়ে? আমি অবশ্যই যাব। আমার নাম লিখে নে।'

রাতে চেম্বার থেকে ফিরেছি সেদিন। দীপালীও প্রায় একই সঙ্গে বাড়ি ঢুকল। হাত মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে ওকে বললাম, 'চল মায়ের সঙ্গে একটু কথা বলে নিই, এতদিন বাইরে থাকতে হবে। মায়ের উপর ভরসা। মাকেই তো দেখতে হবে সব।'

দুজনে মায়ের ঘরে গেলাম। ইতিমধ্যে এই কদিনে মা আমাদের মিশর যাওয়ার কথা শুনেছে কিছু কিছু। ঘরে ঢুকতেই মা বলল, 'মিশর যাবে তো? তাই অনুমতি চাইছ? যাও, দুজনে ঘুরে এসো। আমি সব সামলে নেব।'

এই বয়সেও মা আমার শারীরিকভাবে যথেষ্ট শক্ত আর মায়ের মনের জোর আরও বেশি। মাকে বললাম, 'মা, রাজেশ আর মুকেশ থাকল। ওদের দেখে রেখ। ড্রাইভার নিতাই বাড়িতেই থাকবে। যা লাগবে ওকে বলো। সব ম্যানেজ করে দেবে। আর বীনা আছে। রান্না বা খাওয়া দাওয়ার কোন সমস্যা হবে না।'

আমাদের গাড়ির ড্রাইভার নিতাই আমাদের বাড়িতেই থাকে। ও শুধু গাড়ির ড্রাইভারই নয়, সকল কাজের কাজি। বাড়িতে জলের ট্যাপ নষ্ট, নিতাই ঠিক করবে। টিউব লাইট

জ্বলছে না, নিতাই আছে-চিন্তা কি? মাকে চোখের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে, কোন সমস্যা নেই-নিতাই নিয়ে যাবে।

মাকে বললাম, 'মা, তোমার কাছে নিতাই থাকল। তোমার আর ভাবনা কি?'

মা বলল, 'এত কিছু তোমাদের ভাবতে হবে না। আমি তো আছিই। আমি যতদিন আছি তোমরা নিশ্চিন্তে যেতে পার। বরং ওদিকে মন দাও। সব ঠিক গুছিয়ে রওনা কর তোমরা। ভালো ভাবে মিশর ঘুরে এসো।'

মাকে বললাম, 'কোন সমস্যা হবে বা কোন প্রয়োজন হলে সুকুমারদা বা গীতার সঙ্গে যোগাযোগ করো।'

মা সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'সে আমিও জানি। আমাদের কোন বিপদ হলে ওরাই নিজের মনে করে এগিয়ে আসবে।' সুকুমার বিশ্বাস আর ডাঃ গীতা বিশ্বাস আমাদের প্রতিবেশি আবার আত্মীয়। মাঝে মাঝে আমরা সুযোগ পেলেই আড্ডা দিই, গল্প করি, ওঁদের গান শুনি। খুব ভালো গান করেন ওঁরা। খুব তাড়াতাড়ি ওঁরা মানুষের মন জয় করে ফেলেন ওঁদের গান দিয়ে। খুব ভালো মানুষ ওঁরা দুজন।

মা বলল, 'তোমরা আমাদের নিয়ে একটুও চিন্তা করো না। আমার নাতি রাজেশ আছে না? ওই তো আমার দেখাশোনা করবে।'

আমারা রাজেশের সঙ্গেও কথা বলে নিলাম। ও তো আর ছোটো নেই। ওকেই বাড়তি দায়িত্ব দিয়ে গেলাম ওর ঠাকুমার প্রতি অতিরিক্ত নজর রাখতে।

রাজেশকে বললাম, 'তোমার ভাইয়ের প্রতিও লক্ষ্য রেখো। ওর পড়াশোনায় যেন কোন ব্যাঘাত না ঘটে।'

এ বছরটা মুকেশের বেশ চাপ। আই আই টিতে ভর্তির জন্য আলাদা কোচিং নিচ্ছে। দিনরাত পড়া নিয়েই থাকে। মুকেশের অংক পদার্থবিদ্যা এ সবে আগ্রহই বেশি। ও ডাক্তারি পড়বেই না বলেছে।

দিন এগিয়ে আসতে লাগল। একদিন ভ্রমণ সংস্থার লোকজন এসে সকলকে ডেকে নিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন লাগেজ কেমন হবে, কি কি অত্যাবশ্যকীয় জিনিস নিতে হবে। মালপত্র যেন খুব বেশি না হয়। টাকা পয়সা কত নিতে হবে। ইউ এস ডলার নিতে হবে, ওখানে গিয়ে ইজিপ্সিয়ান পাউন্ডে বদলে নিতে হবে। এক ডলার এ ভারতীয় ষাট রুপি। আবার এক ইউ এস ডলারএ সাত ইজিপ্সিয়ান পাউন্ড।

একটা কথা চালু আছে এক সঙ্গে ভ্রমণে গেলে তাদের মধ্যে এমন একটা সখ্যতা গড়ে ওঠে তা আরও মধুর হয়ে ওঠে স্মৃতিচারণায় - সারাজীবন। বুঝতেই পারছিলাম একটা সুন্দর দল গড়তে যাচ্ছি-আঠারো জনের একটা দারুন ইউনিট হবে। পরবর্তিতে তা বুঝেছিলাম কি মজাতেই এতগুলো দিন কাটালাম।

ট্যুর প্রোগ্রাম ঠিক করতে গিয়ে কিছুটা মতানৈক্য হচ্ছিল এবং এটা হওয়ার কথা। সব ভ্রমণের আগে এটা হয় এবং এটাও উপভোগ করতে হয় বিবাদে না গিয়ে। ডাঃ সুনীল নাগ বলছিলেন শেষ দিনটা কাটাব পিরামিডে তার আগে আসোয়ান, লাক্সার ও আলেকজান্দ্রিয়া ঘুরে নেব। ভারতী ভট্টাচার্য মিশর নিয়ে বেশ পড়াশুনো করেছেন। তিনি সময় বেশি দিতে চান আবু সিম্বেল টেম্পল আর পিরামিডে। তার কথা– মিশর মানেই পিরামিড। পিরামিডে দুদিন চাইই চাই। মিশর অভিযানের আগেই ভারতী দেবীর কথাতেই যেন - ঘ্রাণেণ অর্ধ ভোজনম। ভাসিয়ে দিচ্ছেন বর্ণনায় - যেন চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি পিরামিড, আবু সিম্বেল-কারণাক টেম্পল।

ডাঃ ভাস্করমনি চ্যাটার্জি ও ডাঃ চন্দন ঘোষাল দুই জনে মাঝে মধ্যে এমন টিপ্পনী কাটছেন - খুব এনজয় করছিলাম। বুঝলাম জমে উঠেছে মিশর অভিযান। এক পর্যায়ে বিতর্ক থামল। অবশেষে ভ্রমণসূচী চুড়ান্ত রূপ নিল। অনেকেই প্রমাদ গুনছিলেন, এত গরমে মিশর ভ্রমণ? যাই হোক সে বিতর্কের আর জায়গা নেই। অবশেষে আমরা চুড়ান্ত করে এগোনো ঠিক করলাম।

এবার ভিসার বিষয়। পাসপোর্টে ছয় মাস ভ্যালিডিটি থাকতেই হবে না হলে ওরা ভিসা দেবে না। কাগজ পত্রের মধ্যে লাগবে – তিন বছরের ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন, ছয় মাসের ব্যাংক স্টেটমেন্ট-আর ব্যাংকে পর্যাপ্ত টাকা থাকতে হবে।

ভিসার কাগজ পত্র জমা দিয়ে এবার অপেক্ষার পালা। একটা উৎকণ্ঠাও আছে। যদি কারও ভিসা না হয় তবে বাদ পড়তেও হতে পারে।

এর মধ্যে সবার মানসিক প্রস্তুতি তুঙ্গে। শেষ পর্যায়ে লাগেজ গোছানো। দীপালী তো লিস্ট বানিয়ে এগোচ্ছে। টুথপেস্ট ব্রাশ থেকে চিরুনি সাবান ক্রিম টুপি সব লিস্ট ধরে ধরে গুনে গুনে ব্যাগে ভরা। যেহেতু মিশরে প্রচন্ড গরম তাই ছাতা আর টুপির কথা সবার মনে সবার ব্যাগে। নিচে মরুভূমির তপ্ত বালু আর উপরে মেঘমুক্ত আকাশে সূর্যের গরম - সবার এটাই এখনকার মত দুশ্চিন্তা। ওখানে বৃষ্টির দেখা নেই এটা সবাই বলছে।

১৭ই জুলাই ২০০৮ সকলে কলকাতায় ডাঃ সুনীল নাগের বাড়ীতে শেষবারের মত বসা হল। সংস্থাটির লোকজন সকলকে প্রতিটি বিষয় পই পই করে পাখি পড়ার মত বোঝালেন মিশর রওনা হওয়ার মুহুর্ত থেকে ঘরে ফেরা পর্যন্ত কি কি করতে হবে। কি কি করতে মানা।

বললেন 'ভ্রমণের সময় কেউ দলছুট হবেন না। না বলে একা কেউ কোথাও যাবেন না। কারও জন্যে দল বেশিক্ষণ অপেক্ষা করবে না। আমরা চলে যেতে বাধ্য হব আপনাকে ছেড়ে। তখন নিজের টাকা খরচ করে দলের পরবর্তি গন্তব্যে পৌঁছোতে হবে আপনাকে। এমনকি হারিয়েও যেতে পারেন। তাই সতর্ক থাকবেন।

আরও বললেন, 'পাসপোর্ট খানা আগলে রাখতে হবে পুরো ভ্রমণকালে। হারালে হেনস্থার অন্ত নেই। ভ্রমণের বারোটা তো বাজবেই দেশে ফিরতে নাকাল হতে হবে। কেউ কোন ঝুঁকি নেবেন না। শরীরের প্রতি নজর দেওয়ার কথাও ডাক্তার বাবুদের ওরা স্মরণ করাচ্ছেন। কিছু কিছু ওষুধও সঙ্গে নিতে হবে। ওখানে ওখানকার ডাক্তারদের প্রেসক্রিপশন ছাড়া ফার্মাসিস্টরা ওষুধ দেবে না, সে আপনি যত বড় ডাক্তার হোন না কেন।'

প্রস্তুতি যখন চূড়ান্ত দিনটিও সমাগত।

২০ শে জুলাই ২০০৮ এসে গেল। সবার হাতে হাতে মিশরের ভিসা। গাইড মনে করিয়ে দিলেন, সঙ্গে নিতে হবে পর্যাপ্ত ইউ এস ডলার, ফ্লাইট টিকেটের জেরক্স, পাসপোর্ট ভিসার দুই তিন কপি ইত্যাদি।

রাতের দিকে লাগেজ ব্যাগেজ নিয়ে বেরোবো। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে রাতে যেতে হবে মুম্বাই ছত্রপতি শিবাজি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে। একে একে আঠারো জনের সকলে দমদম বিমান বন্দরে (নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর) এসে উপস্থিত হতে শুরু করলাম। আমি তখনও বিমান বন্দরের ভিতরে ঢুকিনি। বাইরে দাড়িয়ে। সকলকে নিয়ে ঢুকব, তাই অপেক্ষা করছি। ডাঃ বিজয় স্যান্যাল, ডাঃ নরেন্দ্র সিং তার স্ত্রী ডাঃ রবীন্দর সিং কাউর ওরা গাড়ী থেকে হন্তদন্ত হয়ে নামতে নামতে বললেন, 'দেরি হয়ে গেল না তো?'

একটু চিন্তায় ছিলেন ওরা। আমি আশ্বস্ত করলাম, 'সব ঠিক আছে, চিন্তা করো না।' সকলের মধ্যেই একটা চাপা উত্তেজনা। কেউ কিছু ফেলে যাচ্ছে না তো! শেষ মুহুর্তের ভাবনা। শেষ মুহুর্তের ব্যাগ পরীক্ষা। শেষবারের মত দেখে নেওয়া - পাসপোর্ট ভিসা, হোটেল বুকিংএর চিঠি, ফ্লাইট টিকিট, ডলার ইত্যাদি।

বিমান বন্দরে চেক ইন করে ভিতরে ঢুকলাম সকলে দল বেঁধে। রাত সাড়ে দশটায় ফ্লাইট। মুম্বাই এয়ারপোর্ট যাব সবাই। কলকাতা ছেড়ে আমরা রাত একটায় মুম্বাই বিমানবন্দরে পৌঁছোলাম। ২১শে জুলাই ২০০৮ রাত তিনটেয় মিশরের উদ্দেশ্যে মুম্বাই ত্যাগ করলাম। ছয় ঘন্টা বিমান যাত্রা ইজিপ্ট এয়ার এর বোয়িংএ। কায়রো সময় পাঁচটা তিরিশ মিনিটে কায়রো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছোবো। মিশর কলকাতা থেকে আড়াই ঘন্টা পিছিয়ে। ইজিপ্ট এয়ারের ভিতরের ব্যবস্থাপনা ভালোই ছিল। অন্যান্য বিমানে যেমন দেখেছি বিমানবালারাও থাকে, কায়রো এয়ারে কোন মহিলা বিমান কর্মির দেখা পেলাম না। সবাই পুরুষ। এদের সকলের ব্যবহারও খুব ভালো। বেশ কয়েক ঘন্টার জার্নি মুম্বাই থেকে কায়রো। সকালে কায়রো নেমেই তো সফর শুরু হয়ে যাবে। এর মধ্যে অনেকেই ঘুমিয়ে নিয়েছিল। আমিও খানিকটা সময় ঘুমিয়ে নিলাম।

পাশের সিটে বসা দীপালী আমার হাতে টোকা দিচ্ছে-ঘুম ভাঙল তখন। বলল, 'ওঠ। ওই শোনো অ্যানাউন্স করছে। আমরা কায়রো এয়ারপোর্ট পৌঁছে গেছি। প্লেন ল্যান্ড করবে এখন। সিট বেল্ট বেঁধে নিতে বলছে। নামতে হবে।'

সিট বেল্টটা বেঁধে নিলাম। নামার আগে গুছিয়ে নিলাম সব কিছু। এখনই নামবে আমাদের বোয়িং। ক্রমেই গতি কমিয়ে নেমে আসছে মাটির কাছাকাছি।

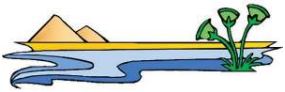

কায়রো আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
Cairo International Airport

ওই তো রানওয়ে দেখা যাচ্ছে। একটু পরে প্লেনের চাকা রানওয়ে স্পর্শ করবে। উত্তেজনায় প্লেনের জানালায় চোখ রেখেছি। এক সময়ে থেমে গেল গতি। আমাদের প্লেন দাঁড়িয়ে পড়ল রানওয়ে ছাড়িয়ে টারম্যাকের পাশে।

ভোরবেলা কায়রো বিমান বন্দর স্পর্শ করল আমাদের বিশাল ইজিপ্ট এয়ারের বোয়িং। উত্তেজনা সবার চোখে মুখে। মিশরের মাটিতে আমাদের পা রাখতে চলেছি। অনুভূতিটা এমন- যেমন নীল আর্মস্ট্রং চাঁদে পা রেখেছিল আমাদের অনুভূতিও তেমন।

মিশরের কায়রো থেকে ১৫ কিলোমিটার উত্তর পূর্বে হেলিওপোলিসে এই বিমান বন্দরের অবস্থান। স্থানীয় আরবিতে বলে মাতার-এল-কাহিরা-এল-দাউলি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর (Matar EI Qahira EI Dawly)। এটি আফ্রিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর। জোহানেসবার্গের টম্বো আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের (Tambo International Airport-Johannesburg) পরেই এর স্থান। এক কথায় বলা যায় ঝাঁ চকচকে এই বিমান বন্দর। পরিষ্কার পরিপাটি। প্রচণ্ড ভিড়। বুঝলাম এমন এক জায়গায় এসেছি যেখানে সারা পৃথিবীর পর্যটকদের নজর সারা বছর।

এয়ারপোর্টে নেমে সকলে যার যার লাগেজ ছাড়াতে বেল্টে গিয়ে দাঁড়ালাম। সেখানেও বাঙালি স্বভাবজাত একটু হুড়োহুড়ি। যার যার লাগেজ নিয়ে কাস্টমস এবং ইমিগ্রেশন চেকিং। লম্বা লাইন। একটু কড়াকড়ি চেকিংএ। কাগজপত্র, ভিসা, হোটেলের ঠিকানা ইত্যাদি সব ঠিক আছে কিনা। কারও আর তর সই ছিল না। কখন দেখব মিশরের মাটি। কখন নেব মিশরের বাতাসে নিঃশ্বাস, কখন দেখব মিশরের আকাশের সূর্য। এর মধ্যে দীপালী আশ্চর্য রকম শান্ত। ভাবখানা এমন যে যা হবার তা সঠিক সময়েই হবে। এত তাড়াহুড়ো করার কি আছে?

ইমিগ্রেশন চেকিং সেরে সকলের মাথা গুনতির পর একে একে বাইরে এলাম। মাথা গোনার দায়িত্ব ছিল আমার উপর। আঠারো জন আছে তো! আমি বললে তবে সকলে স্থান ত্যাগ করবে।

এয়ারপোর্ট টারমিনালের অ্যারাইভালের দিকে এগোচ্ছি। এয়ারপোর্টের বাইরে বেরোতেই একটা বিশাল লাক্সারি বাস নিয়ে মিশরের গাইড শ্যাম দাঁড়িয়ে আছে। পরিচয় দিল নিজেই। ভাঙা ভাঙা সুন্দর মিষ্টি ইংরেজিতে কথা বলছে। ওই আপাতত ট্যুর গাইড। এয়ারপোর্টের বাইরে একটা ফটো সেশন সেরে নিলাম যার যার ক্যামেরায়। এরপর আমাদের সকলকে নিয়ে গাড়ি ছাড়ল। কোন ক্লান্তি নেই কারও চোখে মুখে। শুধুই এক অদ্ভুত উত্তেজনা। চারিদিকে চেয়ে দেখা। মিশরীয় মানুষ, ঘর বাড়ি রাস্তা ঘাট। গাড়ি চলেছে হোটেলের দিকে কায়রো শহরের বুক চিরে। ভোর বেলার কায়রো। শিহরণ সবার মনে, সবার শরীরে।

শ্যাম মাঝে মাঝে বলছে মিশর সম্বন্ধে। বলতে শুরু করল বাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হ্যান্ড মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে। বুঝলাম মিশরের ইতিহাস ভূগোল বিষয়ে ওর খুব ভালো জ্ঞান।

শ্যাম বলে দিল, হোটেলে পৌঁছে সামান্য কিছু বিশ্রাম আর ব্রেকফাস্ট। তারপর ছুটতে হবে। প্রথমেই নিয়ে যাবে কায়রো যাদুঘরে যেখানে আমাদের আরাধ্য মমি শুয়ে আছে। রামেসেস, নেফারতিতি সহ প্রাচীন ফারাও সম্রাটদের দেহ মমি হয়ে সোনায় মোড়া - যত্নে আর কড়া নিরাপত্তায়।

তিরিশ মিনিটের যাত্রায় আমরা পৌঁছোলাম পাঁচতারা হোটেল ওয়েসিসে। শ্যাম বলল, 'আমরা হোটেলে পৌঁছে গেছি।'

অতি সুন্দর হোটেল। হোটেল রিসেপশানে সবার তাড়া ঘরের চাবি আগে নিতে হবে।

ঘরে ঢুকে একটু এলিয়ে দেওয়া বিছানায়, একটু বিশ্রাম, তারপর প্রাতরাশ। তারপর দেখতে যাব যাদুঘর। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যাদুঘর। কায়রো যাদুঘর যেখানে ওরা ঘুমিয়ে আছেন। ফারাও সম্রাটদের মমি। বিশ্বের তাবত ইতিহাস প্রেমী আর উৎসুক মানুষের স্বপ্ন। একবার যদি কায়রো যাদুঘরে যেতে পারতাম দুই নয়ন সার্থক হত। বিশ্বের সেরা দর্শনীয় বস্তু এখানে দেখতে পাওয়া যায়। মিশর নামটির মধ্যেই আকর্ষণ। জীবন সার্থক হয় একবার যদি মিশর ভ্রমণ করা যায়। আমরা সেই আকর্ষণের কেন্দ্র বিন্দু মিশরের রাজধানী কায়রো শহরে পা রেখেছি।

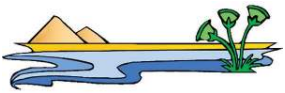

মিশরের প্রাচীন রাজবংশ
Egypt : Ancient Dynasty

মিশরের ইতিহাস দীর্ঘ আর বৈচিত্রময়। পৃথিবীতে আর কোনও দেশের এমন দীর্ঘ ও ঘটনাবহুল ইতিহাস নেই। সে জন্য মিশর নিয়ে মানুষের এত আগ্রহ, এত গবেষণা।

ইংরেজি ইজিপ্ট নামটি এসেছে গ্রীক শব্দ আইজিপটস থেকে। ফরাসি ভাষায় ইজিপটি এবং ল্যাটিন ভাষা আইজিপটাস শব্দ। স্থানীয় আরবিতে মাসর বা কুরাণের আরবি শব্দ থেকে মিশর শব্দটি এসেছে।

Egypt comes from the French 'Egypte' and comes from the Greek Aigyptos. Aigyptos came from the Greek Hikuptah, which means "Temple of the soul of Ptah", Ptah was one of the names for the god of Memphis, an ancient city on the Nile Delta

Egypt name comes from Arabic : Misr. In Egypvian Arabic : Masr

Offically : The Arab Republic of Egypt.

মিশরের প্রাচীন রাজত্বে যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে ঃ-

❒ প্রাচীন যুগ— খ্রিস্টপূর্ব ৩১১০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১৫৭০ পর্যন্ত

❒ নবরাজত্ব যুগ— খ্রিস্টপূর্ব ১৫৭০ থেকে খ্রিস্টাপূর্ব ৬৩৯ পর্যন্ত

❒ মধ্য যুগ— খ্রিস্টপূর্ব ৬৩৮ থেকে ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এবং

❒ আধুনিক যুগ— ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু হয়ে আজ পর্যন্ত।

অন্য ইতিহাসবিদরা মিশরের প্রাচীন শাসন আমলকে আরও বিশদে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ-

১. আদিম মিশর যুগ ঃ খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৩১০০-রাজবংশ শাসনামলের পূর্বের যুগ।

২. প্রাথমিক রাজবংশ যুগ ঃ খ্রিস্টপূর্ব ৩১০০ খ্রিস্টপূর্ব ২৮৬৮।

৩. প্রাচীন রাজবংশ যুগ ঃ খ্রিস্টপূর্ব ২৬৮৬ খ্রিস্টপূর্ব ২১৮১ খ্রিস্টপূর্ব পিরামিড যুগ।

৪. প্রথম অন্তর্বর্তি রাজবংশ যুগ ঃ খ্রিস্টপূর্ব ২১৮১ খ্রিস্টপূর্ব ২০৫৫।

৫. মধ্য রাজবংশ যুগ ঃ খ্রিস্টপূর্ব ২০৫৫ খ্রিস্টপূর্ব ১৭৮৬।
৬. দ্বিতীয় অন্তর্বর্তি যুগ ঃ খ্রিস্টপূর্ব ১৭৮৬-খ্রিস্টপূর্ব ১৫৬৭।
৭. নব রাজত্বের যুগ ঃ খ্রিস্টপূর্ব ১৫৬৭-খ্রিস্টপূর্ব ১০৮৫।
৮. তৃতীয় অন্তর্বর্তি যুগ ঃ খ্রিস্টপূর্ব ১০৮৫-খ্রিস্টপূর্ব ৬৬৪।
৯. কুশাইট যুগ ঃ খ্রিস্টপূর্ব ৭১৪ খ্রিস্টপূর্ব ৬৫৬।
১০. ছাব্বিশতম রাজবংশ ঃ খ্রিস্টপূর্ব ৬৬৪ খ্রিস্টপূর্ব ৫২৫।
১১. আলেকজান্ডারের মিশর বিজয় ও তারপর ঃ খ্রিস্টপূর্ব ৬৬৪ খ্রিস্টপূর্ব ৩৩২।

Ancient Egypt History :-

1. Predynastic Period (B. C. 5000-3100 B. C.)
2. Archaic (Early Dynastic) Period (B.C. 3100-2686 B. C.)
3. Old Kingdom : Age of the Pyramid Builders (B. C. 2686-2181 B.C.)
4. First Intermediate Period (B.C. 2181-2055 B.C)
5. Middle Kingdom : 12 th Dynasty (B.C. 2055-1786 B. C.)
6. Second Intermediate Period (B. C. 1786-1567 B. C.)
7. New Kingdom (B.C. 1567-1085 B. c.)
8. Third Intermediate Period (B. C. 1085-664 B. C.)
9. Kushite Egypt (BC 714-BC 656)
10. Twenty Sixth Dynasty (BC 664 - 525 BC)
11. From the Late period of Alexander's Conuest (664 BC-332 BC)

মিশরে প্রাথমিক রাজবংশ যুগের প্রথম রাজবংশ শুরু হয় খ্রিস্টপূর্ব ৩১০০ তে। মেনেস ছিলেন আপার ইজিপ্ট ও লোয়ার ইজিপ্টের সম্মিলনের পর প্রথম রাজা। যদিও ঐতিহাসিকদের মতে মেনেসকেই প্রথম রাজা বলা হয়েছে কিন্তু প্রত্নতাত্বিকদের মতানুসারে আপার ইজিপ্ট ও লোয়ার ইজিপ্টের সম্মিলনের পর প্রথম রাজা হন নাকাডা-৩ এর শেষ রাজা নারমার প্যালেট্রো। মেনেসকে বলা হচ্ছে তিনি সম্ভবত নারমারের পর প্রথম রাজবংশের দ্বিতীয় ফারাও।

প্রাচীন রাজবংশের যুগ শুরু হয় রাজা জোসারের (খ্রিস্টপূর্ব ২৬৩০-খ্রিস্টপূর্ব ২৬১১) সময় থেকে। তৃতীয় রাজবংশ থেকে ষষ্ঠ রাজবংশের রাজত্বকাল খ্রিস্টপূর্ব ২৬৮৬ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ২১৮১ সময় পর্যন্ত। তখন রাজধানী ছিল মেমফিস।

Ancient Egypt began with Egypt as a unified land (Upper and Lower Egypt), which occurred sometime around 3100 BC. According to Egyptian tradition, Menes, thought to have unified the Upper and the Lower Egypt, was the first king. Manetho said the first Pharaoh was Menes, but archeological findings depicts that the first ruler was the final king of the Naqada III period. His name was Narmer palette and became first

Pharaoh after uniting Upper and Lower Egypt. Menes is now thought to be the second Pharaoh of the First Dynasty.

The Old Kingdom is regarded as the period when Egypt was ruled by the Third Dynasty to the Sixth Dynasty (2686 BC to 2181 BC). The capital of Egypt during this period was at Memphis, King Djoser ruled from 2630 BC to 2611 BC.

খ্রিস্টপূর্ব ৩১০০ থেকে শুরু করে খ্রিস্টপূর্ব ২০৬০ পর্যন্ত সময়ে তৃতীয় রাজবংশের সময়ে মিশরে পিরামিড তৈরি হয়। মমি তৈরি যে বিশ্বাসে সেই বিশ্বাসেই মমি সংরক্ষণের প্রস্তুতি। মমি এই বিশ্বাসে তৈরি করা হত যে মৃত্যুর পর তাদের সঙ্গে ঈশ্বরের যোগাযোগ স্থাপিত হবে। সে জন্যই মৃতদেহ সংরক্ষণের প্রস্তুতি। ফারাওরা সেই ভাবনা থেকেই নিজেদের মৃতদেহ নষ্ট না হতে দিয়ে সংরক্ষণের চিন্তা শুরু করেন। শুধু মমি তৈরি করেই ক্ষান্ত হয়নি ফারাওরা। মৃতদেহ রাখতে গেলে চাই সুরক্ষিত স্থান।

সেখান থেকেই পিরামিড তৈরিতে মন দেওয়া– যেখানে মমি থাকবে ভালো পরিবেশে। সেখানে সকল ব্যবহার্য জিনিসপত্র রাখা হবে এই বিশ্বাসে যে প্রয়োজনে তারা তা ব্যবহার করবে।

প্রাচীন রাজত্বের যুগের কথা গবেষকরা প্যাপিরাস-এ লেখা, বিভিন্ন মন্দিরগাত্রে, পিরামিডের দেয়ালে ও স্তম্ভে লেখা থেকে এবং চিত্রলিপি ঘেটে উদ্ধার করেছেন। পর্যটক হেরোডেটাস নামক গ্রীক ইতিহাসবিদের লেখা থেকেও তথ্য পেয়েছেন। সর্বমোট ১৭টি রাজবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। জানা যায় তাদের উত্থান ও পতনের কাহিনি। এই যুগেই মিশরে স্থাপত্য শিল্প ও শাস্ত্র চর্চা শুরু হয়। ঐ সময় রাজা মেনেসকে মানুষ দেবতা বলে জানতেন। তিনি ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করান। বহির্বিশ্বে বাণিজ্য সম্প্রসারণ করেন। মেনেসের সময় ধাতু হিসাবে তাম্র সংগ্রহ শুরু হয় সিনাই উপত্যকার এলাকা থেকে। তাম্রের ব্যবহারও শুরু হয় রাজা মেনেসের সময়।

সে সময় সূর্যকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজো করত মিশরের মানুষ। বিশেষ করে তৃতীয় রাজবংশের সময় খ্রিস্টপূর্ব ২৭৮০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ২৬৮০ পর্যন্ত সূর্য পুজোর প্রচলনের তথ্য মেলে। এই সময় শুরু হয় মৃতদেহ সংরক্ষণ। মমি তৈরি, পিরামিড তৈরি এই সময় থেকেই। নানা রকম মত প্রচলিত থাকলেও এটা মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য যে মানুষের ধারণাছিল যে মানুষ মারা গেলেও আত্মা বেঁচে থাকে। শরীরের সঙ্গে আত্মার বিযোজন হলেও আত্মা জীবিত থাকে। প্রাণ চলে গেলেও যেন রাজার দেহ নষ্ট না হয় তাই শুরু হল দেহ রক্ষার নিয়ম। এভাবেই মমি তৈরির কাজকর্ম শুরু হয়। এটা শুরু হয় ধর্মকে আশ্রয় করেই। এটা লক্ষণীয় আজ পর্যন্ত পৃথিবীর অনেক কাজ সে ভালো হোক বা মন্দ হোক ধর্মের নামে চালু করা অনেক সহজ। ধর্মপ্রাণ মানুষ ধর্মের নামে মেনে নিয়েছে সব।

ওসিরিস ছিলেন তৎকালীন সমগ্র পৃথিবীর পৌরাণিক দেবতা। কথিত আছে যে আইসিস ওসিরিসের বোন। ওসিরিস তার বোন আইসিসকে বিয়ে করেন। মিশরে প্রাচীন যুগে রাজ পরিবারে ভাই ও বোনের মধ্যে বিয়ে চালু ছিল।

ওসিরিসের ভাই শেট ওসিরিসের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। একদিন শেট ওসিরিসকে বন্দি করেন ও প্রচণ্ড অত্যাচারের পর নৃশংসভাবে তাকে খুন করেন এবং তার দেহ টুকরো টুকরো করে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দেন। উদ্দেশ্য ছিল যেন কোনদিন ওসিরিসের দেহ আর খুঁজে না পাওয়া যায়। এরপর ওসিরিসের ভাই শেট নিজেই নিজেকে সম্রাট ঘোষণা করেন ও ক্ষমতা দখল করেন। তিনি নিজেকে দেবতা ঘোষণা করেন।

কিন্তু আইসিস তাঁর স্বামীকে খুঁজতে থাকেন। তার দেহের অংশগুলো খুঁজে বের করেন ও জড়ো করেন এবং সংযোজন করে ওসিরিসের দেহ পুনর্নির্মান করেন। দেবতাদের নির্দেশে প্রাণ ফিরে পায় ওসিরিস। পরবর্তিতে ওসিরিসের ঔরসে আইসিসের গর্ভে এক পুত্রসন্তান আসে। তার নাম হোরাস। আইসিস হোরাসকে গোপন স্থানে রেখে বড়ো করতে থাকেন যেন সে শেট এর নজরে না পড়ে বা শেট না জানতে পারে। ক্রমে হোরাস বড়ো হয়ে জানতে পারে তার বাবার হত্যাকারী শেট, তার আপন কাকা। হোরাস হয়ে ওঠেন এক পরাক্রমশালী বীর। যুদ্ধবিদ্যা শিখতে শুরু করেন হোরাস। হোরাস পরে বিশাল এক সেনাবাহিনী গঠন করেন। এক যুদ্ধে হোরাস তার কাকা শেটকে পরাজিত করেন ও শেটকে হত্যা করেন। এরপর হোরাস তার বাবার রাজত্ব দখল করেন। তিনি হয়ে ওঠেন তৃতীয় দেবতা। ওরিসিস, আইসিসের পর হোরাসের এভাবেই দেবতা ও সম্রাট হয়ে ওঠার কাহিনি সমগ্র মিশর জুড়ে।

আইসিসের হাতে তার স্বামীর এই দেহ ফিরে পাওয়া ও প্রাণ প্রতিষ্ঠার এ-কাহিনি। মিশরীয়দের মধ্যে মৃত দেবতার শরীর অক্ষত রাখা ও প্রাণ ফিরে পাওয়ার এ তত্ত্ব থেকেও মমি তৈরির ইতিহাস অনেকে সেটা মনে করেন।

২৬১৩ খ্রিস্টপূর্ব থেকে ২৪৯৪ খ্রিস্টপূর্ব সময়ে চতুর্থ রাজবংশের প্রথম রাজা স্নেফেরুর সময়ে শুরু হয় উন্নত ও সুন্দর পিরামিড তৈরির চিন্তা ভাবনা। তিনিই পদক্ষেপ নেন যে মমি রাখতে হবে সুরক্ষিত ভাবে এই মিরামিডে। তিনি তৈরি করেন উন্নত ধরনের পিরামিড।

এরপর নীলনদের পশ্চিম তীরে গিজায় খুফু বা চিওপস্, খাফরে বা চেফরেন ও মেনকাউরে তিনটি পিরামিড তৈরি করেন। এই তিনটি পিরামিড আজ বিশ্বের বিস্ময়। পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষ ভিড় করে এই পিরামিড দেখতে। পাঁচ হাজার বছর আগের তৈরি এই পিরামিড।

ফারাওদের নিয়ে নানা কাহিনি আছে। প্রথম তিন ফারাওয়ের মা হচ্ছেন রা দেবতার পুরোহিতের স্ত্রী। কথিত আছে যে রা দেবতার সঙ্গে তার পুরোহিতের স্ত্রীর সহবাসের ফলেই এই ফারওদের জন্ম। তাই বলা হয় এই ফারাওরাও দেবতা। এরা রা এর পুত্র।

ষষ্ঠ রাজবংশের শেষ ফারাও পেপি-২ মাত্র ছয় বছর বয়সে ২২৭৮ খ্রিস্টপূর্বে সিংহাসনে বসেন। তার অন্য নাম ছিল নেফারকারে। তিনি ২২৪২ খ্রিস্টপূর্ব পর্যন্ত সিংহাসনে ছিলেন।

পেপি-২ এর মৃত্যুর পর সমগ্র মিশর রাজত্ব ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। ছোটো ছোটো রাজত্বের উদ্ভব হয়। সমগ্র মিশরে অরাজকতার সৃষ্টি হয়। এ অবস্থা চলে প্রায় পঞ্চাশ বছর। এ সময়ে ফারাওদের হাতে কোন ক্ষমতা ছিল না।

খ্রিস্টপূর্ব ২১৩০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১৫৮০ পর্যন্ত মিশরের মধ্যযুগ রাজত্ব। ফারাওরা আবার শক্তি সঞ্চয় করেন ও ক্ষমতা ফিরে পেতে শুরু করেন। মধ্যবিত্তদের সাহায্যে রাজত্ব আরও বিস্তৃত হল পূর্বে ও দক্ষিণে।

একাদশ রাজবংশের মিশরের ফারাওরা ছিলেন ঃ-

❑ মানটু হোটেপ -১ (Mantu Hotep-1)

❑ মানটু হোটেপ -২ (Mantu Hotep-2)

❑ মানটু হোটেপ -৩ (Mantu Hotep -3)

❑ মানটু হোটেপ -৪ (Mantu Hotep -4)

একাদশ রাজবংশের শেষের দিকে মানটু হোটেপ-৪ কে হত্যা করা হয়। তার মৃত্যুর পর তার প্রধান উপদেষ্টা আমন এহমেট-১ দ্বাদশ রাজবংশের প্রথম রাজা হন। তিনি শুরু করেন আমন দেবতার পুজো। বংশের রাজত্ব টিকিয়ে রাখতে তিনি তার বড়ো ছেলেকে উত্তরাধিকার ঘোষণা করেন ও পরে তাকে তার স্থলাভিষিক্ত করেন।

আমন এহমেট-৩ (খ্রিস্টপূর্ব ১৮৪২ - খ্রিস্টপূর্ব ১৭৯৭) মধ্যযুগের একাদশ রাজবংশের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর রাজা হয়ে ওঠেন। সে সময় সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন এলাকা পর্যন্ত প্রভাব বিস্তৃত হয়। আমন এহমেট-৪ এর (খ্রিস্টপূর্ব ১৭৯৮ - খ্রিস্টপূর্ব ১৭৯১) ক্ষমতা কমে আসে তার দূর্বলতার কারণে। তার বোন রানি সেবেক নেফেরু খ্রিস্টপূর্ব ১৭৮৯ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১৭৮৬ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনিই মিশরের প্রথম নারী শাসক ছিলেন।

সেসোস্টিস -৩ হচ্ছেন এই আমন বংশের শেষ ফারাও। তার সময়ে শিল্পের প্রভুত উন্নতি হয়। সংস্কৃতি ও স্থপতির অগ্রগতিও হয় প্রচুর। সেসোস্টিস-৩ এর মৃত্যুর পর মধ্যযুগীয় রাজত্বের অবসান হয়। তার মতো শক্তিশালী ও বিচক্ষণ ফারাও পেরেছিলেন মিশরকে অটুট রাখতে। তার মৃত্যুর পর বিদেশিরা আধিপত্য বিস্তার করল মিশরে। তারা দখল করে নেয় মিশরের অনেক অংশ। তারা অস্ত্রেশস্ত্রে, শক্তিতে, বুদ্ধিতে ও সাহসে ফারাওদের চেয়ে অনেক এগিয়ে ছিল। পারজিত হল বিচ্ছিন্ন মিশরীয়রা।

খ্রিস্টপূর্ব ১৬৬২ তে আহামোস নামক আর এক পরাক্রমশালী ফারওয়ের আবির্ভাবে মিশরের পুনর্জীবন হয়। হারানো রাজত্ব পুনরুদ্ধার হয় এবং অষ্টাদশ রাজবংশের শুরু হয়। তার সময়কালের রাজধানী ছিল থিব্‌স। আমনর দেবতার পুরোহিতরা ছিল আরও ক্ষমতাশালী, আরও প্রভাবশালী। শিল্প সংস্কৃতিতে আরও এগিয়ে গেল মিশর। আহামোসের পরে আসলেন আরও দুজন ফারাও টুটমোস-১ এবং টুটমোস-২। এরাও খুব ক্ষমতাবান ছিলেন। ইতিহাস

থেকে তথ্য মেলে এ সময়ে একজন অত্যন্ত ক্ষমতাধর মহিলা ফারাওয়ের আবির্ভাব, হটসেপসুট। টুটমোস-৩ হলেন টুটমোস-২ এর অবৈধ সন্তান। টুটমাস-৩ ক্রমেই ক্ষমতাশালী হয়ে উঠলেন। এক সময়ে টুটমোস-২ কে সরিয়ে টুটমোস-৩ ক্ষমতা দখল করেন।

কিছুদিনের মধ্যেই ষড়যন্ত্র করে টুটমোস-৩ কে সরিয়ে তার কাকিমা হটসেপসুট ক্ষমতা কেড়ে নেন। তিনি নিজেকে ফারাও বলে পরিচয় দিতেন। ইতিহাসবিদরা জেনেছেন যে তিনি সবসময়ে পুরুষের ছদ্মবেশে থাকতেন। তিনি পরচুলা ও নকল দাড়ি ব্যবহার করতেন। পোশাক ছিল পুরুষ ফারাওদের মতো। প্রবল প্রতাপে দাপটের সাথে তিনি একটানা বাইশ বছর রাজত্ব করেছেন। তার সময়েও শিল্প, বাণিজ্য ও স্থাপত্য সকল বিষয়ে অবিস্মরণীয় অগ্রগতি হয়েছিল। হটসেপসুট এর মৃত্যুর পর টুটমোস-৩ আবার ক্ষমতা দখল করেন। তিনিও নিজকে ফারাও বলে পরিচয় দিলেন।

এবার প্রতিশোধ নিতে শুরু করেন টুটমোস-৩। হটসেপসুটের যত শিলালিপি, যত প্রস্তর খণ্ডে তার নাম অঙ্কিত ছিল সব জায়গা থেকে হটসেপসুটের নাম অপসারণ করলেন তিনি। সর্বত্র লিখলেন টুটমোস-৩ এর নিজের নাম। দাপটের সঙ্গে টুটমোস-৩ রাজত্ব করেন চৌত্রিশ বছর।

ফারাও আমন ফিস-৪ খ্রিস্টপূর্ব ১৩৭২ এ ক্ষমতা দখল করলেন মিশরের। তিনি ছিলেন একজন কবি ও স্বভাবে নম্র। তার অনেক কবিতা উদ্ধার করা গেছে। তিনি ক্ষমতায় থাকাকালিন অনেক কবিতা লিখেছেন। তার অপেক্ষাকৃত নম্র ও বিনয়ী স্বভাবের কারণে তার সময়ে পুরোহিতরা অসম্ভব রকম ক্ষমতাধর হয়ে পড়েন। আমন ফিস-৪ এর বিরুদ্ধে পুরোহিতরা সংঘবদ্ধ হন। বিভিন্ন সময়ে আমন ফিস-৪ এর বিভিন্ন সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করতে থাকেন। ক্ষমতা ধরে রাখতে আমন ফিস-৪ পুরোহিতদের সাথে আপোষের কৌশল গ্রহণ করেন।

ফারাও আমন আপোষ করে পুরোহিতদের দাবি মতো সূর্য দেবতার পুজো শুরু করলেন। আমন দেবতার পুজো গেল বন্ধ হয়ে। রাজধানী থিবস পরিত্যক্ত হল। সূর্য দেবতার নাম অনুযায়ি নতুন রাজধানীর নাম হল আখেট অ্যাটন। ফারাও কবি আমন নিজের নাম বদলে রাখলেন আখেট অ্যাটন। তখন তার মতো দুর্বল ফারাও-এর পক্ষে পুরোহিতদের সঙ্গে পেরে ওঠা সম্ভব হয়নি। পুরোহিতদের চক্রান্ত চলতে থাকে এবং ক্রমেই আখেট অ্যাটনকে চাপে ফেলতে থাকেন। নাম বদলেও ওদের মন জয় করতে পারলেন না। তাকে ক্ষমতা থেকে সরানোর চক্রান্ত চলতে থাকে।

১৩৩২ খ্রিস্টপূর্বে আখেট অ্যাটনকে সরিয়ে টুটু অ্যাঙ্ক অ্যাটন নামে এক তরুণ ফারাওকে পুরোহিতরা ক্ষমতায় বসায়। ক্ষমতায় এসেই শক্ত হাতে পরিবর্তনের দিকে নজর দেন। অচিরেই পুরোহিতদের প্রভাবমুক্ত হয়ে কাজ শুরু করেন। আবার রাজধানী সেই পুরোনো থিবসেই ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। আমন দেবতার উপাসনা শুরু হল। অ্যাটন দেবতার উপাসনা

বন্ধ করা হল। এই তরুণ ফারাও টুটু অ্যাঙ্ক অ্যাটন নতুন নাম ধারণ করলেন। টুটু অ্যাঙ্ক অ্যামন সকলের কাছে পরিচিত হলেন তুতেনখামুন নামে। পরবর্তিতে এই তুতেনখামুন সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেন।

পুরোহিতরা তুতেনখামুনকে পুরো সহযোগিতা করতে লাগলেন। তিনিও সুশাসনের নজির রাখলেন। তুতেনখামুন সবচেয়ে আলোচিত বিস্ময়কর ও রহস্যময় ফারাও। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে তুতেনখামুনের মমি পাওয়া গেল। অবিকৃত এই মমিটি সবচেয়ে বেশি—প্রায় চারশো পাউন্ড সোনায় মোড়া কফিনে ছিল। তুতেনখামুন ছিলেন দক্ষ ফারাও। পুরোহিত ও অন্যান্যদের নিয়ন্ত্রনে রেখে তরুণ বয়সে মিশর শাসন করেছেন। তিনি তার এলাকা বৃদ্ধি করেছেন, অখন্ড রেখেছিলেন মিশরকে। কিন্তু আশ্চর্জনক ভাবে ১৩২৩ খ্রিস্টপূর্বে মাত্র আঠারো বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়। তার মমির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য আবিষ্কার করেছেন গবেষকরা।

তুতেনখামুনের মৃত্যুর পর আবার মিশরে অশান্তি নেমে আসে। এবার শাসনভার গ্রহণ করেন গেরেমহেব, রামেসেস-২ ও সেটি। রামেসেসের শাসনকাল সবচেয়ে দীর্ঘ। তাকে বলা হয়ে থাকে রামেসেস দি গ্রেট। আবু সিম্বেলের বিশাল টেম্পল তার আমলে নির্মিত হয়। প্রতাপান্বিত শাসক বলেই হাজার হাজার দাস ব্যবহার করে, প্রচুর অর্থ ব্যয় করে সুদৃশ্য এই আবু সিম্বেল টেম্পল গড়ে তোলেন, যা আজ লক্ষ লক্ষ ভ্রমণপিপাসুদের আকর্ষণের কেন্দ্র বিন্দু। এছাড়াও রামেসেস-২ কারণাক টেম্পল ও লাকসার এ বিশাল বিশাল টেম্পল ও সমাধি তৈরি করেন। সুদীর্ঘ সাতাত্তর বছর তিনি মিশরের শাসক ছিলেন। রামেসেস-২ এর মৃত্যুর পর তার ছেলে মিনেপটা অল্প কিছুকালের জন্য মিশরের ফারাও হন। তার শাসনামল দীর্ঘস্থায়ি হয়নি। তার দুর্বল শাসনের কারণে অচিরেই তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন।

পরবর্তিতে মিশর বিভিন্ন সময়ে গ্রীক, ফরাসি, রোমান, আরব, অটোম্যান ও নুবিয়ান শাসনাধীনে আসে। খ্রিস্টপূর্ব ১০৮৫ থেকে শুরু হল দুর্বল রাজাদের উত্থান পতনের সংক্ষিপ্ত ও ক্ষণস্থায়ি কাহিনি। এসব রাজবংশ কোনটিই স্থায়ি হয়নি বেশি দিন। রাজাদের দুর্বলতার কারণে বিদেশি আক্রমণ হতে লাগল বারে বারে।

লিবিয়ার সম্রাটরা এসে কিছুকাল মিশর দখল করে নেয় (৯৪৩ খ্রিস্টপূর্ব থেকে ৭১৬ খ্রিস্টপূর্ব পর্যন্ত)। কিছুদিনের মধ্যেই লিবিয়ান সম্রাটদের কাছ থেকে ইথিওপিয়ার আরও শক্তিশালী শাসকরা এসে ছিনিয়ে নেয় মিশর। শাসন করে কিছুদিন। লিবিয়া ও ইথিওপিয়ার শাসকদের শাসনামল বিশেষ ঘটনাবহুল ছিল না। উল্লেখযোগ্য কোন তথ্যও ইতিহাসবিদদের হাতে নেই।

শুধু জানা যায় যে এ সময়কালে একবার মিশরের রাজধানী সুদানের নেপাটাটে সরিয়ে নেওয়া হয় কিছুদিনের জন্য। ইথিওপিয়ার দখলদারির পর খ্রিস্টপূর্ব ৫২৪ তে সপ্তদশ রাজবংশের

সময় পার্শিয়ান ক্যামবিসেস মিশর দখল করে নেয়। দীর্ঘদিন সাইটিয়ান পার্শিয়ানরা মিশর শাসন করেন।

কথিত আছে প্রায় দুশো বছর পর খ্রিস্টপূর্ব ৩৩২এ মিশরের শাসকরা গ্রীসের আলেকজান্ডারের নিকট দূত পাঠিয়ে তার সাহায্য প্রার্থনা করেন। আলেকজান্ডার দি গ্রেট তার সৈন্য সামন্ত নিয়ে মিশর অভিযান পরিচালনা করেন। বিদেশী দখলদার মুক্ত হল মিশর। আলেকজান্ডারকে মিশরীয়রা মুক্তির দূত রূপে সাদর অভ্যর্থনা জানান। এমনকি পুরোহিতরা আলেকজান্ডারকে মিশর দেবতা রা-এর সন্তান আখ্যা দিয়ে বসলেন।

আলেকজান্ডার দি গ্রেট নিজের নামেই মিশরের রাজধানী স্থাপন করলেন ভূমধ্যসাগরের তীরে। নাম দিলেন আলেকজান্দ্রিয়া। আলেকজান্ডার তার শাসনামলে মিশরের সুশাসনের দিকে দৃকপাত করেন। আলেকজান্দ্রিয়ার সৌন্দর্যায়নে মনোনিবেশ করেন। আলেকজান্দ্রিয়াকে এক অপরূপ শহরে পরিণত করেন। ৩২৩ খ্রিস্টপূর্বে গ্রীসে আলেকজান্ডার দি গ্রেটের মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর পর তাকে আলেকজান্দ্রিয়াতে এনে সমাহিত করা হয়।

আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর রোমের অধীনে মিশর চলে যায় রোমের শাসকদের আক্রমনে। রোমের আধিপত্যে মিশর শাসিত হতে থাকে। খ্রিস্টপূর্ব ২০০ থেকে চলে টলেমির শাসন। থিয়োডোসিয়াস ছিলেন শেষ রোম সম্রাট যিনি মিশর শাসন করেন। থিয়োডোসিয়াস মৃত্যু বরণ করেন ৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে। এই সঙ্গে সমাপ্ত হল রোমের শাসন।

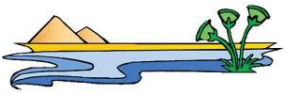

মিশরের প্রাচীন দেবতা
Ancient Gods of Egypt

মিশরে প্রাচীন কাল থেকেই বিভিন্ন রকম দেবতার পুজোর প্রচলন ছিল। বিভিন্ন স্থানে দেবতাদের বিভিন্ন নামে পুজো হত।

এ সকল প্রাচীন দেবতারা (Ancient Gods of Egypt) হলেন ঃ-

- ওসিরিস (Osiris)
- আইসিস (Isis)
- হোরাস (Horus)
- আমুন (Amun)
- আনুবিস (Anubis)
- রা (Ra)
- টা (Ptah)
- ঠথ (Thoth)
- শেঠ (Seth)

মিশরের সবচেয়ে বেশি অঞ্চলে ওসিরিস দেবতার পুজো করা হত।

ওসিরিস কে বলা হত শুভ। তিনি মঙ্গল বা ভালোর প্রতীক। হোরাসের চেহারা এক অদ্ভুত আকৃতির। তার শরীর মানুষের কিন্তু মুখ ছিল বাজপাখির। এই কাল্পনিক চেহারা ছিল শক্তির দেবতার।

মিশরে সবচেয়ে বেশি পুজো করা হয় তিন দেবতার ঃ-

- ওসিরিস (Osiris)
- আইসিস (Isis)
- হোরাস (Horus)

গিজা অঞ্চলে এই তিন দেবতাদের নাম ছিল ঃ-

❑ টা (Ptah)

❑ নেফারটাম (Nefertem)

❑ সাক্সমাট (Suxmat)

মিশরের অন্য অঞ্চলে এই তিন দেবতাই ছিল অন্য নামে যেমন, দক্ষিণ অঞ্চলে বলা হত ঃ-

❑ আমনর (Amun-Ar)

❑ মুট (Mut)

❑ খনুস (Khuns)

চেহারার বর্ণনা এক এক অঞ্চলে এক এক রকম।

এ ছাড়াও প্রাচীন মিশরে অন্য শক্তিশালী দেবতাদেরও উল্লেখ আছে। যেমন ঃ

❑ রা (Ra)

❑ নান (Nan)

❑ অটাম (Atum)

রা (Ra) ঃ-

প্রাচীন মিশরে রা দেবতাকে ওসিরিস, আইসিস এবং হোরাসেরও আগের প্রধান দেবতারূপে মান্য করা হত। তখন মানুষের ধারণা ছিল একসময় সমগ্র পৃথিবী ছিল জলের নিচে। সেই জলের গভীর থেকে উঠে আসেন দেবতা রা। মনে করা হয়ে থাকে অন্য দেবতারা সকলেই রা-এর সৃষ্টি অথবা রা-এর ইচ্ছাতেই রা-এর আত্মা থেকে সকল দেবতাদের সৃষ্টি হয়েছে।

নান (Nan) ঃ-

নান সম্বন্ধে এমন কিছু ধারণা প্রচলিত যা অবাক করা— বর্তমান যুগের পণ্ডিতদের মহাবিশ্বের রহস্যের যে মতবাদ তার সঙ্গে নানের আবির্ভাবের মতবাদের মিল আছে। তখনও ধারণা করা হত যে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয় মহাবিশ্বের অনন্ত মহাশূন্যতা থেকে। এই মহাশূন্যতার মধ্যেই নানের আবির্ভাব। এই মহাশূন্যতা থেকেই মহাবিশ্বের সৃষ্টি।

অটাম (Atum) ঃ-

আদি মিশরে বিশ্বাস ছিল যে নানের থেকেই জন্ম হয় অটামের। অটামকেও ধারণা করা হয় আদি সৃষ্টির সময়ের দেবতা। কেউ কেউ বলেন যে নানের বুক চিরে জন্ম নেন অটাম। অটামের কোন মা নেই। সরাসরি ঈশ্বরের থেকে আবির্ভাব। আবার এ মতবাদও প্রচলিত যে রা দেবতা অটামের ইচ্ছাতেই পৃথিবীতে আসেন।

মিশরে প্রাচীন আমলে মানুষের ধর্মবিশ্বাস প্রচারিত হত এক একটি এলাকা ভিত্তিক। প্রাচীন মিশরে চারটি প্রধান নগর ঘিরেই এই ধর্মবিশ্বাস। এই ধর্মবিশ্বাসের প্রচার বা চর্চা শুরু হয় যা পরবর্তিতে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র মিশরে। নগর চারটি হল (Four Cities of Ancient Egypt of Religious Culture) ঃ-

- ❑ হেলিওপোলিস (Heliopolis)
- ❑ মেমফিস (Memphis)
- ❑ হারমোপলিস (Harmopolis)
- ❑ থিবস (Thebes)

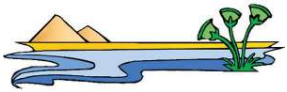

মিশর ও মিশরের রাজধানী কথা
Egypt & It's Capitals

হোটেল ওয়েসিস যেখানে আমাদের প্রথমে আনা হল সেখানে ঘরে ঢুকেই গা এলিয়ে দিলাম নরম বিছানায়। দীপালী এই ফাঁকে গুছিয়ে নিচ্ছে। এখনই বের হতে হবে আবার মিশর সন্ধানে। আগামী কিছুদিন আমরা মিশরের দক্ষিণ থেকে উত্তরে কয়েক হাজার কিলোমিটার পরিভ্রমণ করব আর মিশরকে চিনব।

মিশর দেশটি উত্তর ও দক্ষিণে দুই ভাগে বিভক্ত। মিশর দক্ষিণকে বলা হয় আপার ইজিপ্ট ও মিশর উত্তরকে বলা হয় লোয়ার ইজিপ্ট। কায়রো উত্তর অঞ্চলের দিকে। প্রাচীনকালে ছোটো ছোটো দলে মিশরীয়রা বাস করত। পরে এই দলগুলো মিলে বড়ো বড়ো দলে বাস করতে শুরু করে। উত্তরে যারা ছিল তাদের রাজধানী ছিল বুটো— যেটা হচ্ছে নীলনদের ভূমধ্যসাগর অববাহিকার নিকটবর্তি কোন স্থানে কায়রোর কাছেই।

উত্তর মিশরের সম্রাটের মুকুটে থাকত লাল কেউটের প্রতীক আর মুকুটের রঙ লাল। তাদের প্রতীক ছিল প্যাপিরাস গাছ আর প্যাপিরাস ফুল। আসোয়ান ও লাক্সারের মাঝামাঝি জায়গায় ছিল দক্ষিণ মিশর অংশের রাজধানী। সে রাজধানীর নাম ছিল নেঘেব। সম্রাট মাথায় পরতেন সাদা রঙের মুকুট ও প্রতীক থাকত শকুনি। এদের প্রতীক পদ্ম ফুল।

এক সময় উত্তর ও দক্ষিণ মিশর মিলিত হয় এবং একিভূত হয়। কথিত আছে সম্রাট নারমার এই মিলনে সহায়তা করেন। কোন কোন ইতিহাসবিদের মতে সম্রাটের নাম মেনেস। এই মিলিত মিশরের রাজধানীর নাম হয় মেমফিস। তার আগেও একটা রাজধানী ছিল — নাম ছিল থিনিস। ২৯৫০ খ্রিস্টপূর্বের আগে উত্তর ও দক্ষিণ মিশরের প্রথম মিলিত রাজধানী এটি, যদিও এই রাজধানীর সঠিক স্থান চিহ্নিত করা যায়নি। মিলিত মিশরের নতুন সম্রাটের মাথায় থাকত কোবরা ও শকুনি প্রতীক।

৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে১৬ই জুলাই আল কুয়াহিরি রাজধানী হিসাবে ঘোষণা করেন মুসলমান শাসক গোহর আল সিক্কিলি। আল কুয়াহিরিই পরবর্তিতে কায়রো নামে অবিহিত হয়—মূলত খলিফা আল মোয়েজ লিদিনোল্লাই এই রাজধানীর পত্তন করেন। এরপর সকল মুসলমান

খলিফারা কায়রোতে বসেই মিশর শাসন করেন। মিশরের প্রাণ নীলনদের পূর্বদিকে কায়রো আর নীলনদের পশ্চিম পাড়ে গিজা। যে গিজাতেই তৈরি হয় পিরামিড। বর্তমানে কায়রোর জনসংখ্যা এক কোটি কুড়ি লক্ষেরও বেশি।

মিশর দেশটির আনুষ্ঠানিক নাম হচ্ছে দি আরব রিপাবলিক অফ ইজিপ্ট। দেশটি আফ্রিকা মহাদেশের উত্তরপূর্ব প্রান্ত থেকে এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণপশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত সিনাই উপদ্বীপের ভূমিখণ্ডে বিস্তৃত। মিশর একটি ভূমধ্যসাগরীয় দেশ যার উত্তরপূর্বে গাজা ও ইজরায়েল, পূর্বে আকাবা উপসাগর এবং পূর্ব ও দক্ষিণে লোহিত সাগর এবং দক্ষিণে সুদান ও পশ্চিমে লিবিয়া।

এক সময় মিশর ছিল খ্রিস্টান ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। সপ্তম শতাব্দী থেকে মিশরে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারলাভ করতে থাকে এবং ক্রমেই সারাদেশের মানুষ ইসলাম ধর্মের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। খ্রিস্টান ধর্মানুরাগীরা এক সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠিতে পরিণত হয়।

দেশটির আয়তন — ১০, ১০, ৪০৮ বর্গ কিলোমিটার (৩৯০, ১২১ বর্গ মাইল)

স্বাধীনতা দিবস — ২৮শে ফেব্রুয়ারি ১৯২২ (ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বাধীনতা)

বিপ্লব দিবস — ২৩শে জুলাই ১৯৫২

রিপাবলিক ঘোষণার দিন — ১৮ই জুন ১৯৫৩

ষোলো থেকে কুড়ি শতকে যথাক্রমে অটোমান ও ব্রিটিশ শাসকদের অধীনে চলে যায় মিশর। ব্রিটিশ উপনিবেশ হিসাবে শাসিত হয় দীর্ঘদিন।

১৯৫২ সালে এক বিপ্লবের মাধ্যমে মিশরের দুর্নীতিবাজ রাজা ফারুককে ক্ষমতাচ্যুত করা হয় ও সপরিবারে নির্বাসনে পাঠানো হয়। ব্রিটিশ দখলে থাকা সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করা হয় এবং ব্রিটিশ সৈন্য, আমলা ও শাসকদের মিশর থেকে বিতাড়িত করে দেশটি স্বাধীন হয়।

বিংশ শতকের শেষার্ধে মিশরে সামাজিক ও ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা খুব বেড়ে যায়। রাজনৈতিক অস্থিরতা প্রচণ্ড খারাপ আকার ধারণ করে মিশরে। ১৯৪৮, ১৯৫৬, ১৯৬৭, ও ১৯৭৩ সালে ইজরায়েলের সাথে বারবার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে মিশর। মিশরের গাজা অঞ্চল হাতছাড়া হয়। ১৯৮০ সালে মিশর ও ইজরায়েলের মধ্যে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি স্বাক্ষর করে গাজা ফিরে পায়। মিশর ইজরায়েলকে স্বীকৃতি দেয়। এ সময়ে ভয়ানক রাজনৈতিক অস্থিরতা, আতঙ্কবাদ ও অর্থনৈতির মন্দার মোকাবেলা করতে হয় দেশটিকে।

দেশটির রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ও রাষ্ট্রভাষা আরবি।

Egypt has the longest history, tracing its heritage back to the 6th-4th millennia BC. Considered a cradle of civilisation, Ancient Egypt saw some of the earliest developments of writing, agriculture, Urbanisation,

organised religion and central government. Iconic Monuments such as the Giza Necropolis and its Great Sphinx, as well the ruins of Memphis, Thebes, Karnak, and the Valley of the Kings, reflect this legacy and remian a significant focus of scientific and popular interest. Egpyt's long and rich cultureal heritage is an intergral part of its national identity, which has endured, and often assimilated, various foreign influences, including –

- ❑ Greek
- ❑ Persian
- ❑ Roman
- ❑ Arab
- ❑ Ottoman
- ❑ Nubian

The Arab Republic of Egypt, is a country spanning the northeast corner of Africa and southwest corner of Asia by a land bridge formed by the Sinai Peninsula. Egypt is a Mediterranean country bordered by the Gaza Strip and Israel to the northeast, the Gulf of Aqaba to the east, the Red Sea to the east and south, Sudan to the south, and Libya to the west. Across the Gulf of Aqaba lies Jordan, and across from the Sinai Peninsula lies Saudi Arabia, although Jordan and Saudi Arabia do not share a land border with Egypt.

Egypt was an early and important centre of Christianity, but was largely Islamised in the seventh century and remains a predominantly Muslim country with a significant Christian minority.

❑ Important days of Egypt :-

❑ Independence Day : 28th February 1922

❑ Republic Day : 18th June 1953

❑ Revolution Day : 23rd July 1952

Area of Egypt –10, 10,408sq meter (390,121 sq mile)

From the 16th to the beginning of the 20th century, Egypt was ruled by foreign imperial powers :

The Ottoman Empire and

The British Empire.

Modern Egypt dates back to 1922, when it gained nominal independence from the British Empire as a monarchy. However, British milatary occupation of Egypt continued, and many Egyptians believed that the monarchy was an instrument of British colonialism.

Following the 1952 revolution, Egypt expelled British soldiers and bureaucrats and ended British occupation, nationalised the British-held Suez Canal, exiled King Farouk and his family and declared itself a Republic.

মিশরের বর্তমান রাজধানী কায়রো। কায়রোকে আরবিতে বলে আল-কা-হিরাহ আর কপটিক ভাষায় বলে কাশরোমি। কায়রো সমগ্র আফ্রিকার মধ্যে এমনকি মধ্যপ্রাচ্য ও আরব বিশ্বের বৃহত্তম শহর। সারা বিশ্বের পঞ্চদশতম বৃহৎ শহর কায়রো। প্রাচীন শহর মেমফিস ও পিরামিডের এলাকা গিজা সংলগ্ন নিউ ডেল্টা অঞ্চলে কায়রোর অবস্থান। ৯৬৯ খ্রিস্টপূর্বে ফাতিমিদ রাজবংশের সময় কায়রো রাজধানীর প্রতিষ্ঠা। এখানে প্রাচীন কায়রো শহরের অনেক অংশ এখনও দেখা যায়। দীর্ঘদিন ধরে কায়রো রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জগতের চর্চাকেন্দ্র হিসাবে পরিচিত। হাজার মিনার আর মসজিদের শহর রাজধানী কায়রো ইসলামিক স্থাপত্যের জন্য উল্লেখযোগ্য।

Cairo is the capital of Egypt. In Arabic : Al-Qahirah, In Coptic : Kashromi

The city's metropolitan area is one of the largest in Africa, the largest in the Middle East and the Arab world, and the 15th-largest in the world, and is associated with ancient Egypt, as the famous Giza pyramid complex and the ancient city of Memphis are located in its geographical area. Located near the Nile Delta, modern Cairo was founded in 969 CE by the Fatimid dynasty, but the land composing the present-day city was the site of ancient national capitals whose remnants remain visible in parts of Old Cairo. Cairo has long been a centre of the region's poligical and cultural life, and is titled "the city of a thousand minarets" for its preponderance of Islamic architecture.

রাজাদের ইচ্ছায় তাদের খুশিমত জায়গায় মিশরের রাজধানীর পরিবর্তন হয়েছে বারে বারে।

উত্তর ও দক্ষিণ দুই অংশের মিশরের মিলিত হওয়ার পর মিশরের বিভিন্ন রাজধানীর নাম ছিল এরকম (Other Capitals of Egypt) ঃ

❑ থিনিস ঃ (২৯৫০ খ্রিস্টপূর্বের আগে)

❑ মেমফিস ঃ (খ্রিস্টপূর্ব ২৯৫০ -খ্রিস্টপূর্ব ২০৬০ প্রথম রাজবংশ থেকে অষ্টম রাজবংশ পর্যন্ত)

❑ হেরাক্লিওপোলিস ম্যাগনা ঃ (খ্রিস্টপূর্ব ২১৮০ – খ্রিস্টপূর্ব ২০৬০ নবম ও দশম রাজবংশের সময় পর্যন্ত)

❑ থিবিস ঃ (খ্রিস্টপূর্ব ২১৩৫ -খ্রিস্টপূর্ব ১৯৮৫ একাদশ রাজবংশ)

❑ ইটজটাই ঃ (খ্রিস্টপূর্ব ১৯৮৫ - খ্রিস্টপূর্ব ১৭০০ দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ রাজবংশ সময়ে)

❑ আভারিস ঃ (খ্রিস্টপূর্ব ১৭১৫ - খ্রিস্টপূর্ব ১৫৮০-চতুর্দশ ও পঞ্চদশ রাজবংশ সময়ে)

❑ থিবিস ঃ (খ্রিস্টপূর্ব ১৭০০ - খ্রিস্টপূর্ব ১৩৫৩ ত্রয়োদশ রাজবংশ মেরনেফেরি আয়ি তারপর ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ রাজবংশ পর্যন্ত সময়)।

❑ আখেতাতেন ঃ (খ্রিস্টপূর্ব ১৩৫৩ - খ্রিস্টপূর্ব ১৩৩২ অষ্টাদশ রাজবংশের - রাজা আখেনাটেন)

❑ মেমফিস ঃ (খ্রিস্টপূর্ব ১৩৩২- খ্রিস্টপূর্ব –১২৭৯ অষ্টাদশ রাজবংশ ও উনবিংশ - রাজবংশ)

❑ পি-রামেসেস ঃ (খ্রিস্টপূর্ব ১২৭৯ - খ্রিস্টপূর্ব ১০৭৮ উনবিংশ রাজবংশ রামেসেস-২ ও বিংশতম রাজবংশ পর্যন্ত)

❑ তানিস ঃ (খ্রিস্টপূর্ব ১০৭৮ -খ্রিস্টপূর্ব ৯৪৫ একবিংশ রাজবংশ)

❑ বুবাস্টিস/তানিস ঃ (খ্রিস্টপূর্ব ৯৪৫ - খ্রিস্টপূর্ব ৭১৫-দ্বাবিংশ রাজবংশ)

❑ লিওনটোপোলিস/থিবিস ঃ (খ্রিস্টপূর্ব ৮১৮ - খ্রিস্টপূর্ব ৭১৫ ত্রয়োদশ রাজবংশ)

❑ সাইস ঃ (খ্রিস্টপূর্ব ৭২৫-খ্রিস্টপূর্ব ৭১৫-চতুর্বিশ রাজবংশ)

❑ নাপাতা / মেমফিস ঃ (খ্রিস্টপূর্ব ৭১৫-খ্রিস্টপূর্ব ৬৬৪ খুশাইট পঞ্চবিংশ রাজবংশ)

❑ সাইস ঃ (খ্রিস্টপূর্ব ৬৬৪- খ্রিস্টপূর্ব৫২৫ ষোড়শ রাজবংশ)
(সপ্তবিংশ রাজবংশ ছিলেন পারশিয়ান।)

❑ সাইস ঃ (খ্রিস্টপূর্ব ৪০৪-খ্রিস্টপূর্ব ৩৮০ উনত্রিশতম রাজবংশ)

❑ সেবেননিটোস ঃ (খ্রিস্টপূর্ব ৩৮০ - ৩৪৩ খ্রিস্টপূর্ব -ত্রিশতম রাজবংশ) একত্রিশতমে রাজবংশ ছিলেন পারশিয়ান।

❑ আলেকজান্দ্রিয়া ঃ (খ্রিস্টপূর্ব ৩৩২-৬৪১ খ্রিস্টাব্দ গ্রীক ও রোমান রাজত্ব)

মুসলিম সময়ের রাজধানী ঃ

❑ ফুসটাট ঃ (৬৪১ খ্রিস্টাব্দ - ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ)

❑ আল-আসকার ঃ (৭৫০ খ্রিস্টাব্দ - ৮৬৮ খ্রিস্টাব্দ)

❑ আল-কাতাই ঃ (৯০৫ খ্রিস্টাব্দ - ৯৭২ খ্রিস্টাব্দ)

❑ কায়রো ঃ (৯৭২ খ্রিস্টাব্দ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত)

Egyptian Capitals :

This is a list of Egyptian capitals in a chronological order :

❑ Thinis (Actual Location Unknown) before 2950 BC) the first capital of Upper and Lower Egypt.

❑ Memphis : (2950 BC - 2180 BC) : VIII Dynasties
❑ Herakleopolis Magna : (2180 BC - 2060 BC) - IX and X Dynasties
❑ Thebes : (2135 BC - 1985 BC) - XI Dynasty
❑ Itjtawy : (1985 BC - 1700 BC) - XII Dynasty to XIII Dynasty before Merneferre Ay
❑ Avaris : (1715 BC - 1580 BC) - XIV Dynasty to XV Dynasty (Hyksos)
❑ Thebes (1700 BC- 1353 BC) XIII Dynasty possibly starting from Merneferre Ay, Then XIV Dynasty to XVIII Dynasty before Akhenaten
❑ Akhetaten : (1353 BC - 1332 BC) - Akhenaten of XVIII Dynasty
❑ Memphis : (1332 BC - 1279 BC) - XVIII Dynasty and XIX Dynasty until Seti I
❑ Pi - Ramesses : (1279BC - 1078BC) - XIX Dynasty starting from Ramesses II and XX Dynasty
❑ Tanis : (1078 BC - 945 BC) - XXI Dynasty
❑ Bubastis/Tanis : (945 BC - 715 BC) -XXII Dynasty
❑ Leontopolis / Thebes : (818 BC -715 BC) – XXIII Dynasty
❑ Sais : (725 BC - 715 BCe) – XXIV Dynasty
❑ Napata– Memphis (715 BC - 664 BC) : The Kushite XXV Dynasty rulers were based in
❑ Napata , Sudan but ruled Egypt from Memphis
❑ Sais : (664 BC - 525 BC) XXVI Dynasty
XXVII Dynasty was Persian
❑ Sais : (404 BC - 399 BC) - XXVIII Dynasty
❑ Mendes : (399 BC - 380 BC) -XXIX Dynasty
Sebennytos : (380 BC - 343 BC) -XXX Dynasty - XXX Dynasty was Persian
❑ Alexandria : (332 BC - 641 AD) Greco - Roman period

Capitals in Muslim Period :

❑ Fusat : (641 AD - 750 AD)
❑ AI - Askar : (750 AD - 868 AD)
❑ AI - Qatai : (868 AD - 905 AD)
❑ Fustat : (905 AD - 972 AD)

কিছুক্ষণের জন্য আমরা ওয়েসিস হোটেলে। প্রাতঃক্রিয়া আর পোশাক পরিবর্তন সেরে হোটেলের ব্রেকফাস্টের ঘরে যেতে হবে। ঢুকলাম সকলে হোটেলে ব্রেকফাস্টের ফ্লোরে। সে কি আয়োজন। থরে থরে টেবিলে টেবিলে সাজানো নানা স্বাদের রকমারি খাবার। অন্ততঃ দশ

রকমের ফল কেটে কেটে তা আবার সাজিয়ে রাখা সুন্দর করে, মিশরে যত রকমের সুস্বাদু ফল পাওয়া যায় সব আছে, নাশপাতি, আপেল, কলা, পেয়ারা, তরমুজ সব। ফিস ফ্রাই, ফিস কাটলেট, এগ ওমলেট ইত্যাদি। নানা রকম মাছের বিভিন্ন পদ। সব ধরনের মাংসের সব আইটেম। ফাইভ স্টার হোটেলে সব সময়েই ব্রেকফাস্ট একটু ভারি হয়। দুপুরের খাবার থাকে হালকা।

দীপালী আমাকে বলল, 'মাংস দেখে শুনে খেও। গরুর মাংস, উটের মাংস, খাসির মাংস, মুরগীর মাংস সব আছে।'

দীপালীর কথা শুনে আমি, ডাঃ মলয় সাহা, বৈদ্যনাথদা সতর্ক হয়ে গেলাম। ভেজিটারিয়ান খাবারও সাজানো। ফ্রুট জুস - পাইনাপেল, ওয়াটার মেলন, ম্যাঙ্গো জুস, মিল্ক শেক প্রভৃতি ঠাণ্ডা পানীয় এক পাশে। রাইস, ব্রেড হরেক রকমের। কত রকমের যে মিষ্টি তা লিখে প্রকাশ করা যাবে না। সব মিলিয়ে প্রায় সত্তর রকমের আইটেম।

ওদের চা কফির স্বাদ আজও ভুলতে পারিনি। আশ্চর্যের বিষয় সব খাবার যেমন খুশি খেতে পারব, কিন্তু জল ফ্রি হবে না। জল কিনে খেতে হবে। মিশরে জলের দাম, দুধের দাম আর পেট্রোলের দাম প্রায় সমান।

ব্রেকফাস্ট শেষে হোটেল চত্বরে একটু দেখে নিলাম চোখ বুলিয়ে, মনোরম পরিবেশ। মরুভূমির দেশেও এ হোটেলে অনেক গাছপালা– সবুজে সুবজ চারিপাশ। অনেক রকম ফুলের গাছ ফুলের সমারোহ বিশেষ করে বোগানভিলা। চারিদিকে যেন বোগানভিলার মেলা। নানান রঙের বোগানভিলা। শুধু হোটেল নয় সারা কায়রোতে রাস্তার পাশে বিভিন্ন বাড়ির লনে ছাদে সর্বত্র বোগানভিলা।

হোটেল গেটে মিশরের ঐতিহ্যবাহী সুন্দর পোশাকে প্রহরী। হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে দর্শনার্থীদের। বড়ো গেটটি খুলে ধরছে কেউ আসলেই। আরও ভালো লাগল যখন রিসেপশানিস্ট হাত জোড় করে নমস্কারের ভঙ্গিমায় আমাদের বলছে, 'নমস্কার।' ওরা ততক্ষণে জেনে গেছে যে আমাদের দলটা ভারত থেকে এসেছে। দারোয়ান পর্যন্ত বলছিল–অমিতাভ বচ্চন। পরে আরও অনেকের সাথে কথা বলে বুঝেছিলাম, এরা অমিতাভ বচ্চনের কত ভক্ত, এখানেও অমিতাভ বচ্চনের সিনেমার ভক্ত অনেক।

কায়রো যাদুঘরে যাওয়ার বাস এসে হাজির ওয়েসিস হোটেলের সামনে। সকলকে ডাকাডাকি শুরু হল। তাড়াতাড়ি যেতে হবে। সার রাত ফ্লাইটে যাত্রার ফলে সবাই একটু ক্লান্ত বিদ্ধস্ত। ডেকে ডেকে আনতে হচ্ছে সকলকে।

সকলকে নিয়ে এগোতে শুরু করল টুরিস্ট বাসটি কায়রো যাদুঘরের দিকে। যাদুঘরে যেতে যেতে ট্যুর গাইড মিশরের নানা গল্প শোনাতে শোনাতে চলল। কায়রো রাস্তার দুইধারে কিছু জায়গায় দেখলাম বিভিন্ন রকমের ফল সাজিয়ে নিয়ে বিক্রি করছে। বড়ো বড়ো আপেল দেখে লোভ হচ্ছিল। কিন্তু বাস থেকে তো এখন আর নামা যাবে না।

রাস্তায় বেশির ভাগ মানুষকেই ওদের জাতীয় পোশাকে দেখা গেল। ওদের জাতীয় পোশাক - বড়ো বড়ো আলখাল্লা - বেশির ভাগ সাদা আর নিচে পায়জামা। মিশরের সকলে আরবিতে কথা বলে। মেয়েরা ঢিলা ঢালা পোশাক পরে। ইসলাম ধর্ম অনুযায়ি পোশাক পরে- এরা বেশ পর্দানসিন। শুধু মুখটি দেখা যায়। প্রকাশ্যে ছেলে ও মেয়েদের বা দুইজন পুরুষ ও মহিলার প্রকাশ্যে অবাধ মেলাশোর সুযোগ নেই এখানে। এখানে প্রকাশ্যে ছেলে ও মেয়েদের বা দুইজন পুরুষ ও মহিলার মেলামেশা করতে দখলে ভয়ানক শাস্তি হতে পারে।

কায়রোতে পঁচানব্বই শতাংশ মানুষ মুসলমান - সুন্নি মুসলমান, বাকি খ্রিস্টান। ভারতবর্ষে যেমন মুসলিম মহিলারা মসজিদে প্রবেশ করতে পারে না এখানে তেমন নয়। মিশরে মসজিদে যেতে মহিলাদের কোন বাধা নেই। এখানে মহিলারা মসজিদে যান, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজও পড়েন। এখানে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত ছাত্র ছাত্রীদের লেখাপড়া ফ্রি। লেখাপড়ার সমস্ত খরচ সরকার বহন করে।

ট্যুর গাইড তার দেশের কথা বলে চলেছে অনর্গল। এখানে নাকি সকল যুবকদের বাধ্যতামূলক ভাবে কিছু সময়ের জন্য সেনাবাহিনীতে চাকরি করতে হয়।

সুন্দর সুন্দর গাড়ি রাস্তায়। রাস্তায় আমাদের বাসের বাঁ দিক দিয়ে ওভারটেক করছে - ডান দিকে নয়। কারণ এখানে লেফট হ্যান্ড ড্রাইভ। আমাদের দেশে যেমন গাড়ির ড্রাইভার ডান দিকের সিটে বসে গাড়ি চালায়, এখানকার সব গাড়ির ড্রাইভার বাঁ দিকের সিটে বসে গাড়ি চালায়। আমাদের কোন ড্রাইভারকে এখানে হঠাৎ গাড়ি চালাতে দিলে নির্ঘাত অ্যাক্সিডেন্ট করে বসবে। এখানে খুব দামি দামি গাড়ি চোখে পড়ল। কায়রোর রাস্তায় প্রচুর বিদেশি গাড়ি দেখা গেল।

কায়রো যাদুঘর

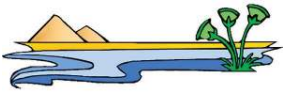

কায়রো যাদুঘর
Cairo Museum

প্রথমেই যাদুঘরের দর্শন– কায়রো যাদুঘর। কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম আমরা। কায়রো যাদুঘরের অবস্থান তাহিরির স্কয়ারে। যাদুঘরের গেটের সামনে নামিয়ে দিল সকলকে। সবার আগে ছবি তোলার হিড়িক যাদুঘর সামনে রেখে। একা একা কখনও বা গ্রুপে। বাইরেরটা আগে ঘুরে দেখে নিতে চাইলাম। নানা দেশের নানা মানুষের ভিড়। যাদুঘরের বাইরে গেটের দুই পাশে দুটি মুর্তি। আদি মিশরের ঐতিহ্য অনুসারে একজনের হাতে প্যাপিরাস এবং অন্য জনের হাতে রয়েছে পদ্ম ফুল।

প্যাপিরাস হচ্ছে পবিত্রতার ও চিরন্তন সভ্যতার প্রতীক। পদ্ম শান্তি ও ঐক্যের প্রতীক। প্যাপিরাস গাছের কাঠ থেকে তৈরি এই প্যাপিরাস কাগজ। এই প্যাপিরাসে মিশরের প্রথম লিপি শুরু। হাইরোগ্লাইফিক প্রথম বর্ণমালা। সমস্ত মিশরে এই বর্ণমালার ব্যবহার ছড়িয়ে পড়ে, যখন সারা বিশ্বের অনেক দেশ তখনও সভ্যতা থেকে অনেক পিছিয়ে।

মিশরকে সত্যিকারেই সারা পৃথিবীর অনেক দেশের মধ্যে অনন্য মনে হয়েছে আমার। একটা শান্ত সৌম্য চেহারা এখানকার মানুষের মধ্যে। বিশেষ করে বিদেশি অতিথিদের প্রতি খুবই সদয় এরা। যে কটা দিন ছিলাম এদের সদা হাসি মুখ আমাদের মন ভরিয়ে রাখত। পর্যটকদের থেকে ওদের একটা বিরাট আয় হয়। হাজার হাজার পরিবার এই পর্যটন শিল্পের উপর বেঁচে আছে। সারা বছর পর্যটক আসছে মমি পিরামিড স্ফিংস দেখতে । কারও কাছে কিছু জানতে চাইলে কিছু একটা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে। সাহায্য করার আগ্রহ খুব।

যদিও গাইড আমাদের বারবার বলেছে, 'মানিব্যাগ সাবধান, পাসপোর্ট সাবধান। ছিনতাই হতে পারে। চুরি হতে পারে।' আমরা সাবধানে থাকতাম। ভয়েও থাকতাম। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি এমন চুরি ছিনতাইকারি ঠগবাজের দেখা একদিনও পাইনি। খুব ভালো মানুষ মনে হয়েছে সকলকে। বরং আমরাই মাঝে মাঝে বিরক্ত করেছি অনেককে। এরা বিরক্তি প্রকাশ করেনি কোথাও কোনোদিন।

আমরা যাদুঘরের ভিতর প্রবেশ করলাম। গাইড টিকেট কেটে একে একে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। সিকিউরিটি খুব কড়া কড়ি। কাউকেই ছাড় দিচ্ছে না। সিকিউরিটির লোকজন সারা শরীর চেক

করছে। ব্যাগ থাকলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। জানা গেল পৃথিবীতে যত যাদুঘর আছে তার মধ্যে সব চেয়ে বেশি নিরাপত্তার কড়াকড়ি এখানে। এখানে রয়েছে প্রায় একশটি প্রদর্শনী ঘর। গাইড জানাল এই বিশ্ববিখ্যাত যাদুঘরে প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার দ্রষ্টব্য আছে। হাজার হাজার বছরের ইতিহাস এই যাদুঘরে সেটা ভেবে অবাক হতে হয়। যাদুঘর খোলা সকাল নটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা। ইচ্ছা আছে সবই দেখব। কিছুই যেন বাদ না পড়ে।

ভিতরে প্রবেশ করলাম। বিভিন্ন দ্রষ্টব্য — মিশরের প্রাচীন বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন ব্যবহার্য জিনিস চারিদিকে সাজিয়ে রাখা। আগে ভেবেছিলাম শুধু মমিই রাখা আছে যাদুঘরে। ফারাওদের নানা মূর্তি, প্রতিকৃতি, পেইন্টিংস, মডেল – চোখ ফেরানো যায় না। কোনটা ছেড়ে কোনটা দেখব।

আর একটি মজার জিনিস লক্ষ্য করার মতো— অনেক গবেষক যারা বাইরে থেকে এসেছেন তারা ওই সকল দ্রষ্টব্য নিয়ে এক মনে কি সব দেখছেন। সঙ্গে বইপত্রও আছে। কি সব লিখছেনও। ইচ্ছে হল কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি।

এক জনের কাছে গিয়ে বললাম, 'এক্সকিউজ মি।' আমার দিকে চোখ তুলে তাকালেনও না। আবারও জোরে বললাম, 'এক্সকিউজ মি, আই লাইক টু টক টু ইউ।'

কোনো উত্তর নেই। অমিতাভ এসে বলল, 'কি রে কি বলছিস'?

অমিতাভকে বোঝালামে ব্যাপারটা। ভাবলাম কানে খাটো নাকি!

এবার কাছে গিয়ে একেবারে বাংলা ভাষায় জোরে বললাম, 'এই যে দাদা শুনছেন।'

এবার লোকটা মুখ তুলে আমার দিকে তাকালেন যেন ভূত দেখছেন। বললেন, 'হোয়াট?'

আসলে এরা গবেষণা করেন ধ্যানস্থের মত। বিশ্বের কোনোদিকে খেয়াল থাকে না এদের। তবু ভাব জমানোর চেষ্টা করলাম। বললেন, ব্রিটেন থেকে এসেছেন। মিশর নিয়ে পড়াশুনা, গবেষণা দুটোই করছেন। মমি নিয়ে পি এইচ ডি করছেন।

দেখে দেখে ফিরছি এদিক থেকে ওদিক। সোনায় মোড়ানো মমি, কাঠের কারুকাজ, পাথরের কাজ, হাইরোগ্লাইফিকে প্যাপিরাস, পাথর ও কাঠে লেখা আরও কত কি সব। ঘুরে ঘুরে আর মন ভরে না। আশ্চর্য এই যাদুঘর। পৃথিবীর অন্যান্য বড় যাদুঘরের মত এখানেও ভিতরে ফটো তোলা নিষেধ। ফ্লাশ লাইটের জন্য নাকি এসবের ক্ষতি হয়। ফটো তুলতে না পারার জন্য তাই সকলের মন খুব খারাপ।

কায়রো মিউজিয়ামে দুটো বড়ো বড়ো হল ঘরে সংরক্ষিত আছে রাজাদের মমি। মিশরের ফারাও ও রাজপরিবারের সদস্যদের মমিগুলো বিভিন্নভাবে কাঁচের পাত্রে রাখা আছে বিশেষ যত্নে। আরও মন খারাপ হয়ে গেল যখন জানলাম যে কায়রো যাদুঘরে তুতেনখামুনের মমি নেই। এটা আছে ভ্যালি অফ দি কিংসে। মিশরের সেরা আকর্ষণ তুতেনখামুনের মমি। সোনায় মোড়া। কথিত আছে যে প্রায় সাড়ে চারশো পাউন্ড সোনা দিয়ে মোড়া। একেবারে খাঁটি সোনা।

একটা জায়গায় দেখলাম অতি যত্নে কাঁচের বাক্সে রাখা মমি। লেখা আছে ফারাও রামেসেস-২ এর মমি– সেই প্রবল প্রতাপাদিত্য বিখ্যাত ফারাও রামেসেস-২ যিনি তৈরি করেছিলেন আবু সিম্বেল টেম্পল।

তার মৃত্যুর পর মমিটি তৈরি করে রাখা হয়েছিল ভ্যালি অফ দি কিংসের কে ভি ৭ নং সমাধিতে। কিন্তু চোরেদের লুঠপাটের কারণে মমিটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মমিটির গায়ে আবার নতুন করে কাপড়ের ও সোনার পাতের আস্তরণ লাগানো হয়। পুরোহিতরা তার মমিটি সরিয়ে নিয়ে আহমোসে গোপন জায়গায় রাখেন। কিন্তু এখানকার অবস্থানও সঙ্গে সঙ্গে জেনে যায় চোরেরা। ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই মমিটি সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। রামেসেস-২ এর মমিকে পিনেডজেম-২ পুরোহিতের সমাধিতে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। এই সবই রামেসেস-২ পুরোহিতের সমাধিতে রাখার ব্যবস্থা করা হয় অত্যন্ত গোপনীয়তার মধ্যে। এ সব রামেসেস-২ এর মমির গায়ে কাপড়ের আস্তরণের উপর হাইরোগ্লাইফিকে লেখা তথ্য থেকে জানা গেছে।

ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম হাজার হাজার বছরের প্রাচীন নিদর্শন। এক জায়গায় দেখলাম তিনটি মূর্তি বেশ যত্ন সহকারে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে রাখা। নিচে লেখা আছে ওদের নাম। এরাই সেই তিন ফারাও যাদের জন্য মিশর পৃথিবী বিখ্যাত হয়েছে। গিজার তিনটি বড়ো পিরামিড নির্মাণ এদেরই হাতে। পাশাপশি তিনজনের মূর্তি আছে— চিওপস্, চেফরেন আর মেনকাউরের।

এদিকে দেখলাম এক রাজা আর তার স্ত্রী, দু'জনে আছেন পাশাপাশি। পাথর কেটে কেটে কি নিখুঁত ভাবে তৈরি করা হয়েছে ভাবলে অবাক হতে হয়ে। পাথরের তৈরি দুটি মুর্তির রঙও আলাদা। পুরুষ যে রাজা তার গায়ের রঙ তামাটে। আর তার স্ত্রীর রঙ সাদা। এটাও তৈরির সময় খেয়াল রেখেছেন।

তার পাশে একটি পরিবারে একজন পুরুষ একজন মহিলা পাশে তাদের কন্যা। পাথরের কাজ। মনে হচ্ছিল যেন জীবন্ত। এখনই কথা বলে উঠবে যেন।

চারিদিকে কত যে মুর্তি দেখে শেষ করা যায় না। ফারাও রানি হটসেপসুট-এর মুর্তিও শোভা পাচ্ছে যিনি পুরুষের ছদ্মবেশে মিশরে রাজত্ব করেছেন দাপটের সাথে।

কায়রো যাদুঘরে একটি জায়গায় জটলা দেখে এগিয়ে গেলাম। একটি বামন পরিবারের মূর্তি। ছেলে বুড়ো সকলেই খুব উৎসুক নয়নে দেখছে। মজার বেশ। গাইড বলল ওর নাম সেনেব। তার স্ত্রী সেনেবের চেয়েও লম্বা। সেনেব আসন করে বসে আছে। স্ত্রী পাশে দাঁড়িয়ে। ছেলে আর ওরা আবার বামন। সেনেব উবু হয়ে কি যেন দেখছে।

পাশে কাঠের তৈরি পুরোহিত মনে হচ্ছে দেখে। হাতে লাঠি। আগের কালে সব দেশের পুরোহিতদের হাতে লাঠির চলন আছে। তার চোখ যেন তাকিয়ে আছে কটমট করে।

এদিকে একজন প্যাপিরাস-এর পাতা সামনে নিয়ে বসে আছে যেন লিখবে এমন ভাব। পাশে স্ত্রী ও কন্যা। সুন্দর পালিশ করা কালো গ্রানাইটের কাজটি। আলোর প্রতিফলন হচ্ছে যেন - এত চকচক করছে।

মুর্তির পাশের ঘরে অনেক কাঠের কাজ। কাঠ যে এত পুরোনো হয়েও এত মজবুতি নিয়ে টিকে আছে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। এদিকে একটি কাঠের নৌকা। সব নৌকাগুলোই অনেক লম্বা আর সরু। প্রাচীন আমলের নৌকা এখনও একই রকম রয়েছে। শুধু রক্ষণাবেক্ষণের জন্য হয়তো কিছু রাসায়নিক বা কেমিক্যাল মেশানো হয়ে থাকতে পারে।

একটা নৌকা আছে খুব যত্নে রাখা। গাইড বলল যে নৌকাটা নাকি তুতেনখামুনের। ওই নৌকাটি তৈরি করেন তুতেনখামুন স্বর্গে যাওয়ার জন্য। একটি নৌকা একজনকে একবারই স্বর্গে নিয়ে যেতে পারে সেই বিশ্বাসে নিজের নিজের নৌকা তৈরির এই ইতিহাস। কাঠের খিলান দিয়ে দিয়ে নৌকাগুলোর কাঠ জোড়া হয়েছিল এবং আজও তা শক্তপোক্ত।

কাঠের মুর্তিও অনেক রকম। কোনও কোনওটি মানুষের মুর্তি কিন্তু মাথা শকুনের। কাঠের উপর লেখা হাইরোগ্লাইফিকে নানান বার্তা। পাথরেও এই ভাবে কত ঈশারা অংকিত রয়েছে। সাদা চুল বয়স্ক গবেষকরা দেখছেন সেগুলো আর পাশে বই খুলে কি সব বিড়বিড় করছেন আর লিখে নিচ্ছেন ওদের ডায়েরিতে।

পিরামিডের মধ্যে পাওয়া সুদৃশ্য সামগ্রি যা পিরামিডের মধ্যে সাজিয়ে রাখা হত সে সব যাদুঘরে এনে রাখা হয়েছে। ভারি ভারি সোনার অলংকারের আলাদা কাঁচের বাক্স। সেকালে মহিলারা এ ধরনের ভারি ভারি অলংকার পরত। বিশেষ করে ফারাওদের স্ত্রীরা। পাশে রয়েছে পিরামিড থেকে উদ্ধার করা লোহা ও পাথরের তৈরি অনেক অস্ত্রশস্ত্র। ধাতব ও পাথরের বাসনপত্রও আছে। হাইরোগ্লাইফিকে লেখা অনেক পাথরখণ্ড পিরামিডে মমির পাশে থাকত সেগুলোও স্থান পেয়েছে যাদুঘরে।

কায়রো যাদুঘরে রয়েছে তুতেনখামুনের জন্য আলাদা একটা পুরো হল। এখানে তুতেনখামুনের মমি না থাকলে কি হবে সেখানে দেখানো হয়েছে তুতেনখামুনের ব্যবহার্য জিনিসপত্র, তার সোনা, পাথর আর কাঁচের তৈরি সিংহাসন। তুতেনখামুনের ঘরে আছে প্রায় ২,০০০ রকমের প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রব্য যেগুলো তার সমাধি থেকে সংগৃহিত হয়েছিল।

The Egyptian Museum or Museum of Cairo (The Museum of Epyptian Antiquities) in Cairo, Egypt, is home to an extensive collection of ancient Egyptain antiquities. It has 120,000 items, with a representative amount on display, the remainder in storerooms.

The Egyptian Museum of Antiquities contains many important pieces of ancient Egyptian hostory. It houses the world's largest collection of Pharaonic antiquities. The Egyptian Government established the museum built in 1835

near Ezbekeyah garden and later moved to the Cairo Citadel. In 1855 Archduke Maximilan, of Astria was given all of the artifacts by the Egyptian government, these are now in the Kunsthistorisches Museum, Viena.

A New museum was established at Boulaq in 1858 in a former warehouse, following the foundation of the new Antiquities Department under the direction of Auguste Mariette. The building lay on the bank of the Nile River, and in 1878 it suffered significant damage in a flood of the Nile River. In 1891, the collections were moved to a former royal palace, in the Giza district of Cairo. They remained there until 1902 when they were moved, for the last time, to the current museum in Tahirir Square.

There is an entire section within the museum which has been dedicated to the boy king. Tutankhamun, the most famous of all the Egyptian Pharaohs. Unlike many of the tombs which have been discovered during the years, that of King Tutankhamun was still reliatively intact when it was initially discovered in 1922 by Howard Carter.

Tomb of Tutankhamun : At the time excavation work was completed, more than 3,500 artifacts had been recovered, including the gold face mask which has since become a global icon of ancient Egyptian civilization.

The face mask which is believed to be a representation of Tutankhamun's face, was crafted from solid gold and weighs in at 11 kg (24.5 pounds). The mask was found in its original position where it had been placed over Tutankhamun, concealing the bandages that covered his head.

Other artifacts recovered from his tomb include a range of Jewllery vases; pots; a large finely decorated chest, and several weapons and instruments which historians believe he might have used prior to his death.

The Egyptian Museum houses a truly spectacular jewllary display, and one which is considered by many to be the world's finest display, Coincidentally, the display also often includes two beautiful ivory and gold bracelets that were recovered from the tomb of Tutankhamun.

Perhaps the most striking thing of all about this display, is the fact that the items you look at have all been worn by people who lived so many thousands of years ago.

Sculptures were held in high regard in Ancient Egypt, and there served several purposes. As a result, sculptures of every shape; form and size have been recovered from Egypt's archeological sites. Some have come

from pyramids,some from the remains of ancient temples and monasteries, and some have simply been recovered from the desert sands. From tiny talismans to huge statues, the Egyptian Museum has enough sculptures to keep you busy all day.

The Royel Mummy Room at the museum never fails to impress visitors. In 1981, the then President of Egypt ordered to close the Royal Mummy Room, but it was later reopened again in 1985, but with fewer mummies on display. The original room had 27 mummies on display, whereas the room as it stands today only has 11 mummies, including the most recently discovered mummy, that of Hatshepsut.

There are two main floors in the museum, the ground floor and the first floor. On the ground floor there is an extensive collection of papyrus and coins used in the Ancient world. The numerous pieces of papyrus are generally small fragments, due to their decay over the past two millennia. Several languages are found on these pieces, including Greek, Latin, Arabic, and ancient Egyptian. The coins found on this floor are made of many different metals, including gold, silver, and bronze. The coins are not only Egyptian, but also Greek, Roman, and Islamic. This has helped historians research the history of Ancient Egyptain trade.

Also on the the ground floor are artifacts from the New Kingdom, the time period bewtwen 1550 and 1069 BC. These artifacts are genrally larger than items created in earlier centuries. Those items include statues, tables, and coffins (Sarcophagi), it also contains 42 rooms, upon entering through the security check in the building, one looks toward the atrium and the rear of the building with many items on view from sarcophagi and boats to enormous statues.

On the first floor there are artifacts from the final two dynasties of Egypt, including items from the tombs of :

- ❑ Pharaohs Thutmosis III
- ❑ Thutmosis IV
- ❑ Amenophis II And
- ❑ The Courtier Maiherpri.

Also there are many artifacts from the Valley of the Kings, in particular the material from the intact tombs of Tutankhamun and Psussenes-I Two special rooms contain a number of mummies of kings and other royal family members of the New Kingdom.

In the garden adjacent to the building of the museum a memorial of famous Egyptologists of the world is located. If features the busts of the following famous Egyptologists :-

- ❑ Auguste Mariette
- ❑ Francois Chabas
- ❑ Johannes Dumichen
- ❑ Conradus Leemans
- ❑ Charies Wycliffe Goodwin
- ❑ Eemmanuel de Rouge
- ❑ Samuel Birch
- ❑ Edward Hincks
- ❑ Luigi Vassalli
- ❑ Emile Brugsch
- ❑ Karl Richard Lepsius
- ❑ Theodule Deveria
- ❑ Vladimir Golenishchev
- ❑ Ippolito Rosellini
- ❑ Labib Habachi
- ❑ Sami Gabra
- ❑ Selim Hassan
- ❑ Ahmed Kamal
- ❑ Zakaria Goneim
- ❑ Jean-Francois Champollion
- ❑ Amedeo Peyron
- ❑ Willem Pleyte
- ❑ Gaston Maspero and
- ❑ Peter le Page Renouf

হাইরোগ্লাইফিক

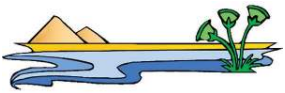

হাইরোগ্লাইফিক
Hieroglyphic

যাদুঘরে ঘুরতে ঘুরতে একটা জায়গায় বিভিন্ন রকমের হাইরোগ্লাইফিকের লেখা দেখলাম। আটকে গেলাম সেখানে প্যাপিরাসে, পাথরে, কাঠে সে সময় বিভিন্ন বিভিন্ন জনের লেখা বিভিন্ন সময়ের। এই হাইরোগ্লাইফিকের লেখা থেকেই পণ্ডিতেরা মিশরের ইতিহাস জানতে পেরেছেন।

মিশরের প্রাচীন, মধ্য ও নব রাজবংশের সময়ে ভাব প্রকাশের মাধ্যম ছিল হাইরোগ্লাইফিক লিপি। হাইরোগ্লাইফিক অর্থ পবিত্র লিপি। হাইরোগ্লাইফিক শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ হাইরোগ্লাইফিকস থেকে। টলেমি যুগে বলা হত হাইরোগ্লাইফিকা।

পণ্ডিতেরা গবেষণায় হাইরোগ্লাইফিকের পাঠোদ্ধার করতে পেরেছেন। তার ফলে মিশরীয়দের পাঁচ হাজার বছর আগের ইতিহাস উদ্ধার করা অনেক সহজ হয়েছে।

সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন সময়ে সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে হাইরোগ্লাইফিকের প্রচলন হয় ভাব প্রকাশের মাধ্যম রূপে। এ পর্যন্ত বিভিন্ন রকম হাইরোগ্লাইফিকের (List of Hieroglyphic scripts) পরিচয় জানা গিয়েছে, যেমন ঃ-

- ❑ অ্যানাটোলিয়ান হাইরোগ্লাইফিক (Anatolian Hieroglyphic)
- ❑ আন হাইরোগ্লাইফ্লিক (Cretan Hieroglyphic)
- ❑ মিশরীয় হাইরোগ্লাইফক (Egyptian Hieroglyphic)
- ❑ মায়ান হাইরোগ্লাইফিক (Mayan Heiroglyphic)
- ❑ মিকম্যাক হাইরোগ্লাইফিক (Mikmaq Hieroglyphic)
- ❑ অজিবি হাইরোগ্লাইফিক (Ojibwe Hieroglyphic)
- ❑ ওলমিক হাইরোগ্লাইফিক (Olmec Hieroglyphic)

প্রাচীন যুগে মিশরে হাইরোগ্লাইফিককে বলা হত ঈশ্বরের লিপি। এই লিপির অনেক সংকেত প্রধানত প্রাচীন চিত্রকলা থেকে নেওয়া হত ও ব্যবহার করা হত।

মিশরীয় হাইরোগ্লাইফিক লিপি তিন প্রকারের উপাদান বা মূলসূত্র (সাংকেতিক চিহ্ন, চিত্র ও অক্ষর) দ্বারা গঠিত।

যে তিন প্রকারে উপাদানে লেখার পদ্ধতি প্রাচীন মিশরে প্রচলিত ছিল তা হল (Egyptian hieroglyphs were the formal writing system used in Ancient Egypt) :-

❑ লেগোগ্রাফিক (Logographic)

❑ সিলেবিকে (Syllabic)

❑ আলফাবেটিক (Alphabetic elements)

এগুলি মিলিয়ে সর্বমোট এক হাজারটি আকৃতি ও অক্ষর ছিল এই মিশরীয় হাইরোগ্লাইফিকে যার দ্বারা বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন স্থানে লিখিত হত। ধর্মীয় কথা ও কাহিনি পেঁচানো বা জড়ানো লেখায় লেখা হত প্যাপিরাস ও কাঠের উপর। চার হাজার খ্রিস্টপূর্ব থেকেই মূলতঃ ফারাও ও পুরোহিতরা এগুলো লিখতে ও পড়তে পারতেন। মিশরে বর্তমানে আরবি রাষ্ট্র ভাষা। আরবি লেখা হয় ডান দিক থেকে বাঁয়ে। হাইরোগ্লাইফিকের লেখা বাম থেকে ডাইনে।

মিশরীয় হাইরোগ্লাইফিক লিপি তিন ধরনের ছিল ঃ-

❑ হাইরেটিক (Hieratic)

❑ ডেমোটিক (Demotic)

❑ মেরোইটিক (Merotic)

খ্রিস্টপূর্ব বত্রিশ শতকে প্রথম ব্রোঞ্জ যুগে নাকাডা-৩ এর সময়ে মিশরীয় হাইরোগ্লাইফিকের প্রচলন শুরু বলে ধারণা করা হয়। হাইরোগ্লাইফিকের লেখা প্রথম পাঠযোগ্য বাক্য উদ্ধার করা হয়েছে খ্রিস্টপূর্ব আটাশ শতকে দ্বিতীয় রাজবংশের সময়ে উম-এল-কাব অঞ্চলে শেঠ-পেরিবসেন সমাধিতে। ইতিহাসবিদ জিওফ্রে শ্যাম্পসন বলেছেন যে হাইরোগ্লাইফিকের লেখা সম্ভবতঃ সুমেরিয়ান মেসোপটেমিয়ার লিপির পরপরই শুরু হয়, যদিও এর সঠিক প্রমান এখনও কেউ দিতে পারেনি।

ধীরে ধীরে মধ্য রাজবংশ পর্যন্ত সময়ে হাইরোগ্লাইফিক একটা পরিণত রূপ পায়। তখন প্রায় ৯০০ রকম আকৃতি , অক্ষর ও সাংকেতিক চিহ্নের দ্বারা হাইরোগ্লাইফিকে লেখা হতে থাকে। এই পদ্ধতির লিপি প্রাচীন রাজবংশ, মধ্য রাজবংশ ও নব রাজবংশের শেষ সময়কাল পর্যন্ত চলতে থাকে। এমনকি সম্রাট আলেকজান্ডার দি গ্রেটের মিশর জয়ের পর পারশিয়ান ও টলেমিক রাজত্বে হাইরোগ্লাইফিকে লেখার প্রচলন ছিল বলে জানা গেছে। খ্রিস্টাব্দ চতুর্থ শতক পর্যন্ত রোমান রাজত্বের সময়ে হাইরোগ্লাইফিকে লেখার শেষ অধ্যায় বলা যায়।

খ্রিস্টাব্দ পঞ্চম শতকে পৌত্তলিক মন্দিরের দরজা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাইরোগ্লাইফিকে লেখার প্রচলনও হারিয়ে যায়। নবম ও দশম শতকে ধুল-নুন-আল-মিশরি ও ওয়হশিয়ার সময়ে হাইরোগ্লাইফিকের পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করেন। পরে অ্যাথেনাসিয়াস কারসার হাইরোগ্লাইফিকের পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করেন ও অনুবাদ করেন। ১৬৪৩ খ্রিস্টাব্দে তার লেখা লিঙ্গুয়া অ্যাজেপ্টিয়াসা রেসটিটুয়া বইয়ে তিনি হাইরোগ্লাইফিকের উচ্চারণ ও অর্থ সব লিখেছেন।

হাইরোগ্লাইফিকের পাঠোদ্ধারে যুগান্তকারী ঘটনা হল ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে নেপোলিয়ানের মিশর অভিযানের সময় তার সৈন্যরা রোসেটা স্টোন খুঁজে পান। সেই পাথরে লেখা হাইরোগ্লাইফিকের পাশাপাশি ডোমেটিক সংস্করণে এবং তার গ্রীক অনুবাদ পাওয়া যায়।

উনবিংশ শতকে তিনজন পণ্ডিত সিলভেস্টার ডি ক্যাসি, জন ডেভিড আকেরব্লাড এবং টমাস ইয়ং নেপোলিয়ানের রোসেটা স্টোন নিয়ে গবেষণা করে আরো চাঞ্চল্যকর তথ্য আবিষ্কার করেন। সর্বশেষ ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে জিন ফ্রাস্কোইস ক্যাম্পোলিয়ান হাইরোগ্লাইফিকের পরিপূর্ণ পাঠোদ্ধার করেন। ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে তার লিখিত লেটার এ এম ডাসিয়ার বইয়ে হাইরোগ্লাইফিকের সম্পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করেন।

Egyptian hieroglyphs were the formal writing system used in Ancient Egypt. It combined logographic, syllabic and alphabetic elements, with a total of some 1, 000 distinct characters. Cursive hieroglyphs were used for religious literature on papyrus and wood. The later hieratic and demotic Egyptian scripts were derived from hieroglyphic writing; Meroitic was a late derivation from demotic.

The use of hieroglyphic writing arose from proto-literate symbol systems in the Early Bronze Age, around the 32nd century BC period of Naqada III with the first decipherable sentence written in the Egyptian language dating to the Second Dynasty. Egyptian hieroglyphs developed into a mature writing system used for monumental insription in the Classical language of the Middle Kingdom period; during this period, the system made use of about 900 distinct signs. The use of this writing system continued through the New Kingdom and Late Period, and on into the Persian and Ptolemaic periods. Late survivals of hieroglyphic use are found well into the Roman period, extendeing into the 4th century AD.

With the final closing of pagan temples in the 5th century, knowledge of hieroglyphic writing was lost. Although attempts were made, the script remained undeciphered throughtout the Middle Ages and the early modern period. The decipherment of hieroglyphic writing would only be accomplished in the 1820s by Jean-Francois Champollion, with the help of the Rosetta Stone.

একটি মমি

হাওয়ার্ড কার্টার কর্তৃক তুতেনখামুনের মমি উদ্ধার

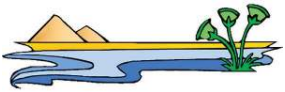

মমি
Mummy

দৃষ্টি পড়ল কাঁচের বাক্সে শোয়ানো মমির দিকে। মমি দেখেই চমকে উঠলাম। এই সেই মমি যা দেখার জন্য এত সাধ্য সাধনা! আর এখন তার সামনে দাঁড়িয়ে!

সেগুলো কাপড় জড়ানো। সবগুলো মমি পিরামিড ও ভ্যালি অফ দি কিংস থেকে উদ্ধার করা। কয়েকটি ভ্যালি দি কুইনস থেকেও আনা হয়েছে।

মমিগুলোর মুখমণ্ডল ও দাঁতের পাটি আংশিক খোলা। হাড়গুলো কালচে, কোনও কোনোটি বাদামি রঙের হয়ে গিয়েছে। সাদা নয়। দুইজনে কতক্ষণ যে মমির সামনে দাঁড়িয়ে আছি ভুলেই গেছিলাম। যেন স্বপ্নাবিষ্টের মতো তাকিয়ে রয়েছি একদৃষ্টে মমির দিকে।

মমি শব্দের উৎপত্তি ঃ- ল্যাটিন শব্দ মুমিয়া, ফরাসি শব্দ মোমি, আরবিতে মুমাইয়া।

মৃতদেহ সংরক্ষণ করে প্রাণ স্থাপনের তত্ত্ব থেকে শুরু হয় গবেষণা। মিশরীয়দের মধ্যে ধর্মীয় আবেগ কাজ করেছে আদি থেকেই। ফারাওদের দেহকে সংরক্ষণের চিন্তা ভাবনা থেকেই মমি তৈরিতে উৎসাহ শুরু হল। মমি তৈরিতে বিভিন্ন রাসায়নিক প্রয়োগ ও পদ্ধতি নেওয়া হয়। মমি তৈরি করতে দুই মাস থেকে ছয় মাস সময় লাগত বলে মনে করা হয়। মৃত্যুর পরই শরীরের ভেতর থেকে নাড়ি ভুঁড়ি, পাকস্থলি, লিভার, কিডনি ও হার্ট কেটে বের করে বিশেষ ধরনের তেল বা রাসায়নিকে আলাদা করে চুবিয়ে রাখা হত।

এও মনে করা হত যে এ সকল অঙ্গ রাসায়নিকের পাত্রে মূল দেহের সঙ্গে জীবিত থাকবে। প্রথমে নাসিকা ছিদ্র দিয়ে ব্রেন বা মগজ বের করে আনা হত। মগজ বের করার পর গরম তরল বিটুমিন জাতীয় দ্রব্য খুলির মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হত। পেটের থেকে নাড়িভুড়ি বের করার পর পেটের মধ্যেও তরল বিটুমিন জাতীয় দ্রব্য ঢুকিয়ে দেওয়া হত।

শরীরটা শুকিয়ে গেলে বিভিন্ন গাছ থেকে সংগৃহিত বিশেষ ধরনের আঠা ও সুগন্ধি সারা শরীরে মাখানো হত ও ছড়িয়ে দেওয়া হত। এর কিছুদিন পর সমগ্র দেহটাকে ন্যাট্রন দ্রবণে প্রায় দুই মাস থেকে তিন মাস চুবিয়ে রাখা হত। এজন্যে দেহে আর কোন চর্বি থাকত না। ফলে পচনের আর কোন সম্ভাবনাই থাকে না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে এরা কতখানি বিজ্ঞানমনস্ক ছিল এবং পুরোপুরি বিজ্ঞান ভিত্তিক ভাবেই এরা মৃত দেহকে মমিতে রূপান্তরিত করত।

পুরুষদের মাথার চুল সব কেটে নেওয়া হত আর মেয়েদের চুল লম্বা করে শরীরের দুই পাশে কাঁধ বরাবর থাকত। দুই মাস পর ন্যাট্রন দ্রবন থেকে বের করে রেজিন জাতীয় এক প্রকার দ্রব্য মেশানো ব্যান্ডেজ দিয়ে হাত পা মাথা শরীর পেঁচানো হত। গাছের এক ধরণের রস মাখানো অত্যন্ত সুক্ষ্ম এক প্রকার কাপড় দিয়ে ব্যান্ডেজ বানানো হত। ব্যান্ডেজ দিয়ে পেঁচানোর পর মমির শরীর সোনার পাতলা পাত দিয়ে মোড়া হত। সেই সময়ে কোথা থেকে এত সোনা জোগাড় হত, কিভাবে তা পরিশুদ্ধ করা হত, কি ভাবে এত সুক্ষ্ম ও মশৃণ পাত তৈরি করা হত সে এখনও বিস্ময়ের। মমি চিত করে শোয়ানো, দুই হাত দুই পাশে রাখা। কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া সহ বিশ্বের অন্যান্য যাদুঘরে রক্ষিত সব মমি একই রকমে একই ভাবে শায়িত আছে।

সে সময় মিশরীয় পণ্ডিতেরা এমন বিশেষ পদ্ধতিতে মমি তৈরী করেছিলেন যে তা আজও অবিকৃত অবস্থায় আছে। সে সময়ের তৈরি এই মমি পাঁচ হাজার বছরের বেশি সময় রয়ে গেছে সকলের বিস্ময় সৃষ্টি করে।

Mummy word comes from Anglo Norman Mumie, from Middle French-momie, from Medieval Latin-mumia, from Arabic-mumiya, from Persian-muya.

Mummy-making practice existed all over the world, ancient Egypt is best known for preserving body to pass from death to an afterlife, embalmers painstakingly prepare the body. The Egyptians believed that five nonphysical aspects coexisted with their body - the major ones were the ba, the ka, and akh (similar to the idea of sprits and souls). After death the ba and ka took care of the paerson but only if there was a mummy. Without a mummy, the person would not travel their long journey to their after life (akh) to a state of immortality.

Egypt's hot climate caused a rapid decomposition. Immediate attention was given to the body's organs, which were the first to decay. Embalmers, who were always men, worked in open-air tents on the west bank of the Nile River-the side associated with death where the sun died' each day. The body was intitially purified by washing it in a solution of natron (mineral salts). A team of embalmers in the 'House of Beauty' each quickly handled a specific task. First the 'non-essential' brain was broken down, suctioned out through the left nostril, and discarded. A 'Scribe' marked an incision line along the abdomen. The left side of the abdomen was then opened by the 'slitter' and with his bare hands, the lungs, liver, intestines, and stomach were removed. These organs were individually mummified and

placed in canopic jars by the 'pickler' The essential heart and kidneys were left undisturbed.

The next phase of mummification consisted of drying out the body, removing as much moisture as possible. As much as 500 lbs, of natron might be used. Rags and straw were also inserted into the body cavity to give it a lifelike shape. Complete dehydration would take 40 days. The final stage was wrapping the body in linen strips - a job that took 15 days. In the case of Pharaohs, items of jewelry, plaques, and all sorts of amulets were included within the wrapping. The nummy of Tutankhamun contained 143 such items. In all, the entire process of Mummification took 70 days.

দীপালীকে বললাম, 'কি দেখছ আর কি ভাবছ এত, এই মৃত মমির মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে? যাবে না?

গাইড এসে সকলকে বারে বারে বলে গেল 'এখনই বের হতে হবে।'

এদিকে দেখে দেখে মন ভরে না। অনেকেই গাইডের কথায় বাইরে বেরিয়ে গেছে। আমি আর দীপালী তখনও চেয়ে আছি অবাক বিস্ময়ে।

ডাঃ চন্দন ঘোষাল এসে আমাকে ধমক লাগাল, 'এদিকে সবাই বাসে উঠে পড়েছে আর তোরা আছিস মমি নিয়ে ? সবাই বেরিয়ে গেছে, বাস ছেড়ে দেবে।'

সুনীলদা এসে ধমকের সুরে বলল, 'তোমরা কি এই যাদুঘরেই থেকে যাবে?'

কায়রো যাদুঘর থেকে অনেককে এক রকম জোর করেই বের করে আনলেন ডাঃ সুনীল নাগ। কারও কি আর বের হতে মন চায়? পুরো মিশর দেশটাই যেন ঢুকে গেছে কায়রো যাদুঘরে। যাদুঘর মানেই তো সে দেশের ইতিহাস-ভুগোল-সংস্কৃতি।

যেতে মন চাইছিল না সত্যি। অগত্যা যাদুঘরের বাইরে বেরোতেই হল। তখনও মনের মধ্যে যাদুঘরের আবেশ মস্তিষ্কে ঘুরঘুর করছে।

যাদুঘরের পাশেই একটা সুদৃশ্য বাগান দেখলাম। সেখানে তেমন ভিড় দেখলাম না। সকলে যাদুঘরের ভিতরে ঢোকার জন্যই ব্যস্ত। আমি দীপালীকে বললাম, চল দেখি যাদুঘরের বাইরে ওখানে সুন্দর সুন্দর মূর্তি দেখতে পাচ্ছি। কাদের মূর্তি দেখে আসি, আর তো কখনও দেখা হবে না। বলে ওকে নিয়ে ঢুকলাম। ওখানে গিয়ে তো অবাক। যত মিশর বিশেষজ্ঞ তাদের সকলের মূর্তি স্থাপিত হয়েছে খুব যত্নে। প্রত্যেকের নাম লেখা আছে তাদের মূর্তির নিচে। যাদের মূর্তি আছে তারা হলেন ঃ

❑ অগাস্টে মারিয়েট

❑ ফ্রাঙ্কোইস সাবাচ

❑ জোহানেস ডুমিসেন

❑ কনরাডাস লিমানস

❑ চার্লস ইউক্লিফ গুডুইন
❑ ইমানুএল ডি রুজ
❑ স্যামুয়েল বার্চ
❑ এডওয়ার্ড হিংকস
❑ লউজি ভাসেলি
❑ এমেলি ব্লুচ
❑ কার্ল রিচার্ড লেপসিয়াস
❑ থিওডুল ডিভেরিয়া
❑ ভ্লাদিমির গেলেনিশচেভ
❑ ইপোলিটো রোসেলিনি
❑ লাবিব হাবাসি
❑ সামি গাবরা
❑ সেলিম হাসান
❑ আহমেদ কামাল
❑ জাকারিয়া গোনিয়েম
❑ জিন ফ্রাস্কোয়িস চ্যাম্পোলিয়ান
❑ অ্যামেডিও পাইরন
❑ উইলিয়াম প্লেইটি
❑ গ্যাসটন ম্যাসপেরো ও
❑ পিটার লি পাজে রিনাউফ।

বেরিয়ে ভাবছি কত পণ্ডিত এই মিশর নিয়ে গবেষণা করেছেন। তাদের জীবনের একটা বিরাট অংশ হয়ত শুধু মিশর গবেষণা করতেই এখানে কাটিয়ে দিয়েছেন।

আমাদের ট্যুরিস্ট বাস দাঁড়িয়ে আছে। গাইড সবাইকে নিয়ে চলল।

ওখান থেকে বেরিয়েই বাসে উঠলাম। দেখি সবাই আমাদের বাসে উঠে বসে আছে আর আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

আমাদের সকলকে নিয়ে বাস চলেছে কায়রো শহরের মাঝ দিয়ে। কায়রো একটি উন্নত শহর। কায়রো শহরটিতে দুই রকম চেহারাই আছে। সব শহরে যেমন থাকে। একটি দিক ঝকঝকে পরিপাটি গোছানো ঝা চকচকে আকাশচুম্বি বাড়ি ঘর। রাস্তা ঘাট পরিচ্ছন্ন। আর অন্য দিকটায় নোংরা। পরিবেশটাও ভালো নয়। যানজট মোড়ে মোড়ে যত্রতত্র। ফুটপাথে ফল সব্জি বিছিয়ে ব্যবসা চলছে কোথাও।

এই কায়রো একদিনে তৈরি হয়নি। ইতিহাস বলে আয়ুবিদ যুগে প্রথম রাজধানী ছিল কায়রো। এর পর আসে মামলুক যুগ– ১২৫০ সাল থেকে ১৫১৭ সাল পর্যন্ত। তখনও কায়রো ছিল রাজধানী। এরপর আসে অটোমানরা– ১৫১৭ সাল থেকে ১৭৯৮ সাল পর্যন্ত। সম্রাট নেপোলিয়ান তার আয়ুবিদ সাম্রাজ্য বাড়াতে বাড়াতে মিশর পর্যন্ত এসে পড়েন। তার নজর পড়ল মিশরের উপর। সেনা দুর্বলতার কারণে মিশর দখল করে নেন সম্রাট নেপোলিয়ান। মুসলমানরা এই আক্রমণ ও দখলদারিকে সহজ ভাবে মেনে নিতে পারেনি। মুসলমানরা ভিতরে ভিতরে প্রস্তুতি নিতে থাকে নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে।

মহম্মদ আলি মিশরের ইতিহাস পাল্টে দেন। এই বীরের জন্ম মিশরের কাভানিয়াতে ১৭৬১ সালে। মৃত্যু ১৮৪৯ সালে। নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি বিশাল সেনাবাহিনী সংগঠিত করেন এবং নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৭৯৯ সালে আবু খির এর স্থলযুদ্ধে অংশ নেন এবং মিশরকে দখলমুক্ত করেন। ১৮০৫ সালে তিনি নিজে সেনাপ্রধান থেকে মিশরের ক্ষমতা দখল করেন।

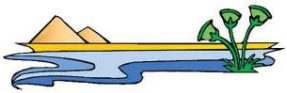

একটি আতরের শো-রুম
An Attar Show Room

বিকেলে আবার কায়রোর বিখ্যাত খালিলি মার্কেটে যেতে হবে। সেখানেও মিশরের নানা জিনিস পাওয়া যাবে। সস্তায়ও মিলবে, বলল গাইড। খালিলি মার্কেটে খুব দরদাম হয়। বিদেশি দেখলে ওরা দশগুন বেশি দাম হাঁকে।

'দেখে শুনে তারপর দাম বলবেন।' গাইড বলে দিল, 'যে দাম বলুন না কেন এরা আপনাকে কটুক্তি করবে না, রাগ করবে না। তাই বুঝেই দামটা বলবেন। একবার দাম বললে আপনাকে নিতেই হবে। তবে দরাদরি করতে হবে। তা না হলে ঠকতে হতে পারে। ঠকিয়ে দিলে তখন তো আপনারা আমাদের গালিগালাজ করবেন যে মিশরীয়রা ভালো নয়। আসলে বুঝলেন, সমস্ত পৃথিবীর ব্যবসায়ি এক, ওদের ধর্মও এক– মুনাফা লাভ করা।

বাস চলল আমাদের নিয়ে। একটি রেস্টুরেন্টে নিয়ে গেল লাঞ্চ করাতে। মিশরীয় মেনু। রুটি, চাপাতি, সব্জি, মাছ, মাংস ইত্যাদি। ওদের মতো করে রান্না। তেল মশলা হলুদের ব্যবহার খুব কম। খেতে খারাপ নয়। আবার আমাদের দেশের মত স্বাদেরও নয়। স্যুপ ছিল দু'রকমের। স্যুপটা অসাধারণ। এখনও স্যুপের স্বাদ মুখে লেগে রয়েছে। যাদুঘর দেখতে দেখতে খিদের কথা মনেই ছিল না কারও। রেস্টুরেন্টে বসে কেমন খিদে লেগেছে টের পেলাম। পেট পুরে খেলাম। প্রচুর ফলের রসও খেলাম। সেই সকালে ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়েছিলাম। আর এই ছয় সাত ঘণ্টা কি অনায়াসে যাদুঘরে কাটালাম সব ভুলে।

রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে আমাদের নিয়ে বাস এগিয়ে চলল। সন্ধ্যায় গিজা স্টেশনে যেতে হবে। এখানে সন্ধ্যা নামে বেশ দেরিতে। এখানকার সময় ৮টায় সন্ধ্যা। তাই সময় নিয়ে একটু কায়রো শহর ঘুরিয়ে নেবে আমাদের গাইড বলল। প্রথমে গাইড নিয়ে ঢুকল একটি আতরের দোকানে। অনেক বড়ো দোকান। বড়ো বড়ো হল ঘরে বিরাট বিরাট কাঁচের শোকেস সাজানো। দামি দামি কাঁচের নানান রকম সুদৃশ্য জার বা বোতলে আতর রাখা। নানা রঙের নানা সাইজের বোতল। আতরের দোকানটি নাকি কায়রোর সবচেয়ে ভালো আতরের দোকান।

সুবেশা তরুণীরা আমাদের আপ্যায়ন করল মিশরীয় স্টাইলে অভিবাদন জানিয়ে। সবাইকে আরামদায়ক বড়ো বড়ো সোফায় বসতে দিল। সকলকে একটা করে পেন্সিল, কাগজ আর বোর্ড ধরিয়ে দিল। তারপর বলে চলল ওদের সিনিয়র সেলস গার্ল। অন্যান্য সেলস গার্লরা প্রত্যেকের হাতের তালুর বিপরীতে আতর লাগিয়ে দিচ্ছে। এক একটি আতরের গন্ধ বলে দিচ্ছে আর লিখে রাখতে বলছে। গোলাপ, পদ্ম, জেসমিন ইত্যাদি মিশরীয় ফুলের গন্ধ। আর বলছে, 'শুঁকে শুঁকে দেখুন আর মনে রাখুন।'

এর ফাঁকে ওরা আমাদের সকলকে গরম গরম চা পরিবেশন করল। আতরের গন্ধ কেমন তা নিয়ে আমার সন্দেহ আর প্রশ্ন থাকলেও ওদের চা যে দারুণ লেগেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমি চায়ে আগ্রহি বেশি আর গন্ধ বিষয়ে অপটু। অবশ্য অন্যরাও আতর নিয়ে বিশেষ আগ্রহ না দেখালেও আতর দোকানি কোন হতাশা প্রকাশ করেনি। আমি দাম জিজ্ঞাসা করায় ওরা যা দাম বলল তাতে ভিতরে ভিতরে চমকে যাওয়ার মতই। এত দাম হয় নাকি আতরের! অস্বাভাবিক রকমের বেশি দাম বলছে। মনে হচ্ছে অনেকগুন বাড়িয়েই বলছে।

আমি একটু রসিকতা করে একজন সেলসগার্লকে বললাম যে দরাদরি চলবে কিনা। কোন কথা না বলে মাথা ঝাঁকিয়ে একটা হাসি দিয়ে সেলস গার্ল বুঝিয়ে দিল দরাদরি চলবে না। প্রায় সকলেই কিছু না কিনেই বেরিয়ে আসছি এমন সময় দেখি ডাঃ সুনীল নাগ সস্ত্রীক আতর কেনার জন্য এগিয়ে গেছেন কাউন্টারে। আমাদের অবাক করে দিয়ে ডাঃ সুনীল নাগ বেশ দাম দিয়েই এক শিশি আতর কিনলেন।

আমি বললাম, 'সুনীল দা, আপনি বুঝি আতরের খুব ভক্ত? এত দামি আতর কিনলেন।'

বেরিয়ে সুনীলদা বললেন, 'এরা সবাইকে চা খাইয়ে আপ্যায়ন করল। আমরা এতগুলো মানুষ। কেউ কিছু না কিনলে কি ভাববে বলত, তপন?' সকলের সম্মান রক্ষার্থে ডাঃ সুনীল নাগ এক শিশি আতর কিনলেন অনেক টাকায়। বুঝলাম আমাদের এখনও অনেক কিছু শেখার আছে সুনীলদার কাছে।

বাসে যেতে যেতে একটা এলাকায় পৌঁছোলে গাইড বলল 'এটা কায়রোর একটি চিড়িয়াখানা।' উট জিরাফ দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল। গাইডকে বললাম বাস থামিয়ে কিছুক্ষণের জন্য চিড়িয়াখানা ঘুরিয়ে দেখাতে। বিনয়ের সাথে গাইড বলল, 'সময় হবে না, স্যার। যে ট্যুর প্রোগ্রাম আছে সময়ে কুলোবে না।'

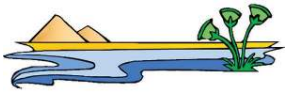

খালিলি মার্কেট
Khan El Khalili

কায়রো শহর ঘুরতে ঘুরতে এরপর সকলকে নিয়ে চলল খালিলি মার্কেটের দিকে। ওরা বলে খান-এল খালিলি। গাইড বলল ওখানে সস্তায় নানান রকম জিনিস পাওয়া যায়। তবে অবশ্যই দরাদরি করে নিতে হবে। না হলে নির্ঘাত ঠকবেন। বিকেলের দিকে পৌঁছোলাম খান এল খালিলি তে। লোকে গমগম করছে খালিলি মার্কেট। সবই বিদেশি লোকজন ট্যুরিস্ট। এশিয়ার লোকজন যেমন আছে তেমনি আছে ইউরোপ আফ্রিকা থেকে আগত ট্যুরিস্টরা। আমরা বাস থেকে নামার আগেই বলে দেওয়া হয়েছিল বাসটি কোথায় দাঁড়াবে। বলা হল সকলে নেমে যেন এক জায়গায় এসে বাসে ওঠেন ঠিক সন্ধ্যা ছয়টায়। আমরা যে যার মত বাজারে ঘোরাঘুরি করলাম। সকলেই কিছু না কিছু কিনলামও।

পুরুষ ও মহিলারা পসরা সাজিয়ে বিক্রি করছে সব। এখানে বেশ কয়েকটি হুকা বার দেখলাম। বেশ দেখার মত নানা সাইজের কারুকাজ করা হুকা সেজে এনে দিচ্ছে খরিদ্দারদের। যুবক যুবতীদের হুকা বারে ভিড় জমাতেও দেখলাম। ট্যুরিস্টদের আকৃষ্ট করার জন্য দোকানে দোকানে মেয়েরা খুব সাজগোজ করে আছে দেখলাম। পুরুষ হোক বা মহিলা এদের ব্যবহার খুব ভালো। কোন ট্যুরিস্ট যে দাম বলুক না কেন রাগ করে না। মুখে হাসি লেগেই আছে এদের। ওরাও পাল্টা দাম বলে খুশি করে বিক্রির চেষ্টা করে যায়। আমিও কিছু কিছু জিনিসের এতে কম দাম বলছিলাম ভাবাই যায় না। তবু রাগ করেনি।

ওখানে একটা গলির মধ্যে একটা দোকানে বেশ ভিড়। দেখলাম সেই দোকান থেকে কেউ সেন্ট কিনলে দোকানের মেয়েগুলো ক্রেতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ছবি তোলার পোজ দিচ্ছে। সে কারণে হোক বা সেন্ট কেনার জন্যেই হোক অনেকেই ভিড় জমিয়েছে। সেন্ট বিক্রিও হচ্ছে দেদার। আমিও দাঁড়িয়ে দেখছিলাম কাণ্ডকারখানা।

কোথা থেকে দীপালী এসে আমার কানে কানে বলছে, 'কি ওদের সাথে তুমিও ছবি তুলবে নাকি? খুব আগ্রহ নিয়ে মেয়েদের ছবি তোলা দেখছ যে! ছবি তুলবে তো পাশে গিয়ে দাঁড়াও, আমি তুলে দিচ্ছি।'

'পাগল হয়েছ নাকি? ওদের সাথে কি জন্য ছবি তুলতে হবে? – বললাম ওকে।

'না না এত সুন্দরী মেয়ে! ওদের সাথে দুই একটা ছবি তুলে রাখলে মন্দ কি? লজ্জা পাচ্ছ কেন?

'ধ্যাৎ। ছাড় তো। চল ওদিকে।' – ওকে নিয়ে সামনে এগোলাম।

দোকানগুলোতে অনেক রকম জিনিস পাওয়া যায়। ভাল মিশরীয় কটনের পোশাক পাওয়া যায়। ধাতব জিনিস পাওয়া গেল। খেজুর কিসমিস নানা শুকনো খাবার দেখার মত। নকল জিনিসও নাকি বাজারে আছে তাই সাবধানে কিনতে হবে।

খান-এল-খালিলি বাজারে সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ হোসেন মসজিদ। বিশ্বের অন্যতম সেরা মসজিদ গুলির মধ্যে এটি একটি। এই মসজিদের সামনে প্রায় পঞ্চাশ ফুট দুটি উঁচু ফাইবারের সোনালি রঙের ছাতা আছে। ছাতাগুলি যন্ত্র চালিত। সে গুলি বন্ধ থাকে সব সময়। নামাজের সময় নামাজিদের জন্য ছাতাগুলি খুলে যায় রোদ থেকে দুরে রাখার জন্য। অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম সোনালি রঙের ছাতাগুলো।

সারা বাজার প্রায় ঘণ্টা খানেক আমি আর দীপালী ঘুরে নিলাম। কিছু কিনি বা নাই কিনি, জিনিস পত্র দেখলাম, দরাদরিও করলাম। দেখার মত জিনিস সব। মনে হচ্ছিল সব কিনে নিয়ে যাই। সে তো আর এই দূর দেশ থেকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব না। তাই দেখে নয়ন সার্থক করা। সকলেই কিছু না কিছু কিনল অবশ্য।

আমিও একটি স্মারক কিনলাম। এ তো ঠিক দেশে এখানকার কিছু নিয়ে যাব স্মারক হিসাবে আর সাজিয়ে রাখব টেবিলে না হয় ড্রয়িং ক্রমের শোকেসে। অনেক বছর পর শোকেসের সামনে গিয়ে এর দিকে হয়তো একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকব দুই এক মুহূর্ত। তখন কি জানি হয়ত মনের পর্দায় ভেসে উঠবে মিশরের এই খালিলি মার্কেটের কথা আর আমাদের এই আঠারো জনের কথা। তখন আমরা কে কোথায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকব– অনেক বছর পরে কে জানে।

এক মিশরীয় মেয়ে বিক্রেতা দীপালীকে একটা রূপোর হার দেখাল। বলল, খাঁটি রুপোর তৈরি। দামও বলল একশ পাউণ্ড।

দীপালী আমাকে দেখিয়ে বলল, 'এটা নেব?'

আমি বললাম, 'তোমার পছন্দ? তোমার যদি পছন্দ হয় নিয়ে নাও।'

দীপালী বলল, 'না না। খাঁটি রুপো কিনা সেটা দেখে বল। পরে বাড়ি গিয়ে বলবে নকল জিনিস কিনেছ। তাই তোমাকে দেখানো।'

'ঠিক বলেছ। আমি তো পাক্কা জহুরি! দেখেই চিনে নেব আসল না নকল রুপো!' দীপালী আমার কথায় খুশি না হয়ে দর দামে মনোনিবেশ করল। আর হারটি কিনেও নিল – দরাদরি করে দীপালী কিনল দশ পাউন্ডে।

দেখলাম বাজরের এক কোনে হিজাব আর বোরখাপরা বেশ কিছু মিশরীয় মহিলা বসে জটলা করছিল। দীপালী এগিয়ে গেল ওদের কাছে ভাব জমাতে। কথা বলার চেষ্টা করল। উভয় পক্ষের যথেষ্ট আগ্রহ কিন্তু ভাষার দূরত্বের কারণে শুধু হাসি বিনিময়েই খুশি থাকা। ওদের মধ্যে একজন একটু ইংরেজি বোঝে সে বলল যে ওরা পাশেই থাকে। প্রায়ই বিকেলে ওরা খালিলি মার্কেটে আসে আড্ডা দিতে। আমি সেই ফাঁকে ওদের ভিডিও করে নিয়েছিলাম অনেকটা। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না মিশরীয় মেয়েরা খুবই সুন্দর দেখতে। লম্বাও বেশ। আর প্রাণবন্ত হাসি খুশি।

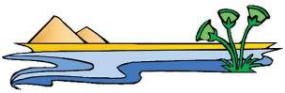

ট্রেনে আসোয়ান যাত্রা
To Aswan by Train

কেনাকাটা শেষে বাসে ওঠার পালা। সকলেরই হাতে কিছু না কিছু জিনিস আছে। সবাই একটা তৃপ্তির হাসি নিয়ে বাসে উঠছে। দরাদরি করে কিনলে একটা তৃপ্তি হয়ই। জয়ের তৃপ্তি।

বাস চলল গিজা রেল স্টেশনের দিকে। আমাদের লাগেজ হোটেল থেকে বেরোনোর সময়েই বাসে তুলে নিয়েছিল।

গিজা স্টেশনে পৌছেই যার যার লাগেজ বুঝে নিলাম। ট্রেন আসতে দেরি আছে। স্টেশনে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করার চেষ্টা করলাম। আমাদের স্টেশনের মতোই গিজা স্টেশন তবে খুব পরিচ্ছন্ন, ঝকঝকে। প্লাটফরমে স্টল আছে নানা রকম। বিস্কুট, চকোলেট, কোল্ড, ড্রিঙ্কস সব আছে। আমাদের কেউ কেউ কিনলেনও। আমি একটি টি স্টল থেকে চা খেলাম। জলের দাম প্লাটফরমে একটু বেশি। তবু কিনলাম এক বোতল পাঁচ পাউন্ড দিয়ে। রাতে ট্রেনে খাওয়ার জল দেবে কিনা কে জানে? পরে দেখেছিলাম—রাতে খাবার দিয়েছিল সকল যাত্রিকে অথচ খাওয়ার জল দেয়নি।

ট্রেন আসছে যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গা থেকে। আমাদের ট্রেন ঠিক সময়েই এসে পৌছোল। গাইড বলল, 'এখানে ট্রেন দেরি করে চলার কোন ব্যাপার নেই।'

ট্রেন আসলে একে একে উঠলাম। কি ঝকঝকে ট্রেন। লোকজনও কম। ট্রেনের কার কোন কামরা ট্রেনের দায়িত্বপ্রাপ্ত লোকজন এসে বুঝিয়ে দিলেন। এসি ফার্স্ট ক্লাস স্লিপার। সারারাত চলবে ট্রেন। প্রত্যেক কামরায় দুইজনের জন্য সংরক্ষিত। আমি আর দীপালী একটাতে উঠলাম। দুটো বেড। টয়লেট বেসিন কম্বল চাদর বালিশ– একেবারে সুসজ্জিত। পুরো ট্রেন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। ট্রেন ছাড়ল। কিছুক্ষণ পর ট্রেনের চেকার এসে খোঁজ খবর নিলেন। অবশ্য আমাদের দেশের ট্রেনের মত কালো কোট পরা টিকিট চেকার দেখা পাই নি। এরা সাদা কোট প্যান্ট পরা।

কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম, একটু ঘুম ঘুম এসে গেছিল সারাদিনের পরিশ্রমের পর। হঠাৎ দীপালী ডাকল। বলল, 'ওঠ, ডিনার দিয়ে গেছে। খেয়ে নাও গরম গরম।'

ট্রেতে করে খাবার দিয়ে গেছে। সবই সুন্দর ভাবে প্যাক করা। খাবার গরম আছে বেশ। রুটি, সব্জি, মাংস, মিষ্টি, কলা আরও অনেক খাবার ট্রে ভর্তি। খিদে পেটে ভালোই লাগল সব খাবার।

ডিনার শেষে পাশের কামরাগুলোতে আমাদের টিমের যারা আছে তাদের ঘরে ঘুরতে গেলাম। সবাই যে যার মত গল্প আড্ডা দিচ্ছে। আমি আর দীপালী ডাঃ অমিতাভ ভট্টাচার্যের কামরায় বসে পড়লাম আড্ডায়। ভারতীও যোগ দিল। একটু পর দেখি ডাঃ চন্দন ঘোষাল এসে পড়ল। আবদার করলাম সকলে একটা গান শোনাবার। বেশ মুডে আছে ডাঃ চন্দন ঘোষাল। দু'চারটে গান শুনিয়ে আবার গেল পাশের কামরায়। এভাবে অনেক রাত হয়ে গেল গল্প আর আড্ডায়।

আসোয়ান যেতে হবে বিশ্বের অন্যতম সেরা ও বড়ো বাঁধ দেখতে।

এবার শোবার পালা। ভোরে উঠতে হবে। আমাদের কামরায় ফিরে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমের আয়োজন সারলাম। সারাদিনের যে ধকল গেছে সহজেই ঘুম এসে গেল।

এক ঘুমেই ভোর হয়ে এল ট্রেনে। ঘুম ভেঙে দেখি দীপালী ট্রেনের জানালা দিয়ে মিশরের প্রাকৃতিক শোভা দেখতে ব্যস্ত একমনে। আমি বুঝলাম বেশ আগেই উঠেছে দীপালী। আর চুপি চুপি আমাকে ফাঁকি দিয়ে একাই উপভোগ করছে মিশরের সৌন্দর্য।

বললাম, 'তুমি উঠে পড়েছ। আমাকে ডাকনি কেন?

ও বলল, 'তুমি যেমন ভাবে ঘুমোচ্ছ। ভাবলাম আগের দিনটায় কষ্ট গেছে অনেক। তাই আর তোমাকে ডিসটার্ব করিনি।'

তাড়াতাড়ি উঠে প্রাতঃকর্ম সেরে নিলাম। ট্রেনের কম্বল গায়ে চড়িয়েই প্রকৃতির দৃশ্য উপভোগে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম দু'জনে একসাথে। ট্রেনের জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য আর ভিতরে দীপালী এই ভাবে ভিডিও ক্যামেরায় বন্দি করলাম।

এর মধ্যে লাকসার পৌঁছে গেছি। খুব সুন্দর শহর লাকসার। প্রাচীন নাম থিবস। মিশরের এক সময়ের রাজধানী ফারাওদের। এখানে থেকে ফারাও রাজবংশের শেষ দিকের রাজারা মিশর শাসন করেছেন। এই জায়গা থেকেই মিশরের যাত্রা শুরু। নতুন যুগের দিকে মিশরের অগ্রযাত্রা এই থিবস থেকে। এই শহরে অনেক বড়ো বড়ো প্রাচীন সমাধি আছে ফারাওদের। সে সকল সমাধির মধ্যে অনেক শিল্পকর্মের নিদর্শন পাওয়া যায়। অনেক প্রাচীন মন্দির আছে সারা লাকসার জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। সেগুলো ফারাও রাজবংশের সময়ে তৈরি।

আমরা লাকসার অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছি আসোয়ানের দিকে। দক্ষিণ দিকে আমাদের ট্রেন এগোচ্ছে। আসোয়ান কায়রো থেকে প্রায় এক হাজার কিলোমিটার দক্ষিণে। সকাল বেলায় ট্রেন যাচ্ছে মরুভূমির মাঝ দিয়ে। এর মধ্যে আছে অনেক খেজুর গাছের সারি। যেদিকে তাকাই এক সময় শুধু খেজুর গাছ আর খেজুর গাছ। অন্যান্য গাছও দেখা যাচ্ছে চারিদিকে।

সকলেই ঘুম থেকে উঠে পড়েছে ইতিমধ্যে। এ ওর ঘরে আসছে। গুড মর্নিং-সুপ্রভাত বিনিময় চলছে। 'ঘুম কেমন হল তোমাদের, দীপালী?' ডাঃ সুনীল নাগ জিজ্ঞাসা করলেন।

'এমন আরামের ট্রেন, ঘুম ভালো না হয়ে পারে?' প্রতি উত্তর দীপালীর।

সকাল বেলায় ট্রেনের করিডোরে সবাই বেরিয়ে পড়েছে। সবাই ফ্রেশ ঘুম থেকে উঠে। নতুন গাইড এসেছে। মিশরীয় তরুণ। ঝর ঝরে ইংরেজিতে কথা বলছে। রাতে সেও ট্রেনের একটা কামরায় ছিল। খুব স্মার্ট তরুণ– হাসি খুশি।

সে সকলকে জানাল, 'প্রস্তুত হয়ে নিন। আমরা আসোয়ান স্টেশনে নামব। যার যার লাগেজ গুছিয়ে নিন। কিছু ফেলে যাবেন না।'

সতর্ক করল সকলকে। আপাতঃ ব্যস্ততা সকলের মধ্যে। লাগেজ গুছিয়ে নেওয়ার হুলুস্থুল। আমাদের বাঙালিদের মধ্যে সব বিষয়েই একটি অতি সতর্কতা বা অতি সক্রিয়তা কাজ করে। সে রকমই ডাঃ মলয় সাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করছে, 'সব ঠিক ঠাক গুছিয়েছ?'

নামতে যাব এমন সময় সেই মলয় সাহারই একটি ব্যাগ আমি না দেখলে হয়ত ফেলেই যেত। শেষ মুহূর্তে গুনে দেখি দুজন কম। সে কি? ট্রেন আর বেশিক্ষণ আসোয়ান ষ্টেশনে দাঁড়াবে না। আমি দৌড়ে গেলাম ট্রেনের কামরাগুলোতে। দেখি ডাঃ দুয়া পরিবার অর্থাৎ ডাঃ নরেন্দ্র সিং দুয়া আর ডঃ মিসেস রবিন্দর সিং কাউর তখনও রেডি হননি। দু'জনে তখনও নাইট ড্রেসে।

বললাম, 'কি ডাঃ দুয়া, আপনারা নামবেন না? তাড়াতাড়ি নামুন। আসোয়ান এসে গেছি। সবাই আমরা নেমে গেছি। ট্রেন ছেড়ে দেবে এখনই।'

ওই রাতের পোশাকেই আমি তাদের ধরাধরি করে নামিয়ে আনলাম। একটু পরই ট্রেনটি ছেড়ে দিল।

বললাম তাদের, 'কি হত বলুন তো এই ট্রেনে থেকে গেলে? কোথায় গিয়ে থামত আর আপনারা আমাদের কি করে খুঁজে পেতেন?'

ট্রেন ছেড়ে দিলে কি হত ভেবে তারাও আতঙ্কিত হচ্ছেন।

আমরা আঠারো জন সকলে আসোয়ান রেল স্টেশনে। বাস দাঁড়িয়ে সামনে। অপূর্ব সুন্দর একটা লাক্সারি বাস এসেছে আমাদের নিতে। বাসের গায়ে আরবি ভাষায় কি সব লেখা। উদ্ধার করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু যা সম্ভব সেটা সকলে করে যাচ্ছি। সকলেরই ক্যামেরা কাজ করছে। ক্লিক ক্লিক।

এর মধ্যে একটা সুন্দর ব্যাপার আমার চোখে পড়ল। রেল স্টেশনের এলাকাতেই আমাদের বাসটা যেখানে দাঁড়িয়েছে সেখানে একটা বড়ো ঝাকড়া গাছ। কি গাছ নাম বলতে পারব না। নাম জানার চেষ্টাও করলাম না। গাছটিতে অনেকগুলো পাখি ডাকছে এই সকালে। আমাদের দেশের পাখিদের কথা মনে করিয়ে দিল ক্ষণিকের জন্য। সব দেশের সব পাখিরাই যেন এক

সুত্রে গাঁথা। একই রকম মন ভরানো পাখির গান আর সুর। মনটা উদাস হয়ে যায় অল্প সময়ের জন্য হলেও। মলয়দার ডাকে আমার আর মন দিয়ে পাখি দেখা হল না। বাসের দিকে এগোতে হল।

বাসে উঠে পড়লাম সকলে। যারা সামনের দিকের সিটে বসতে চায় তারা একটু হুড়োহুড়ি করে আগে ওঠে। আমাদের দুজনের অত তাড়া নেই। তাই ধীরে সুস্থে উঠলাম। লাগেজ বাসের নিচে একটা বড় জায়গা সেখানে সব ঢুকিয়ে দিয়েছিল আগেই। মনে হয় যেন বাসের পেটের মধ্যে সব মালামাল ঢুকিয়ে নিয়ে ছুটল আমাদের বাসটি। রাতে ট্রেনে ভালো ঘুম হয়েছে, সবাই বেশ ফুরফুরে মেজাজে সকাল বেলা। বাসের ড্রাইভার পর্যন্ত রসিক আর আমুদে। আমাদের সঙ্গেও মজা করছিল অনেক সময়। গাইড প্যাকেট ব্রেকফাস্ট আর জল এক বোতল করে দিয়ে দিল।

বলল, 'এখন আর কোন রেস্টুরেন্টে খাওয়ায় সময় দেওয়া যাবে না। বাসেই ব্রেকফাস্ট করে নেবেন।'

আমরা এতেই খুশি। হৈ হুল্লোড় করে বাসের মধ্যে খাওয়া সারলাম। বোতলের জল যেটুকু বাঁচল রেখে দিলাম যত্ন করে।

সবার নজর জানলার বাইরে যতদূর চোখ যায়। মিশরের সব সৌন্দর্য দেখে নেওয়া। আসোয়ান বাঁধে নিয়ে যাবে এখন। এর মধ্যে যেতে যেতে রাস্তার দুপাশে যা কিছু দেখা যায় দেখে নয়ন সার্থক করি। বাইরে খুব গরম। ৪০ ডিগ্রী সেলসিয়াস। কিন্তু ভিতরে টের পাচ্ছিলাম না। এসি বাস। খুব আরামদায়ক। বাসের মধ্যে ছোট্ট একটা টয়লেট পর্যন্ত আছে। এটা বাড়তি সুবিধা সকলের জন্য। আঠারো জনের জন্য বড়ো একটা বাস। অনেক বাড়তি খালি জায়গাও বাসের মধ্যে। তাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসা আরাম করে। আমাদের বাসের মধ্যে তিনজন এ গ্রেডের শিল্পী। ডাঃ চন্দন ঘোষালের কথা আগেই বলেছি। ডাঃ ভাস্করমণি, ডাঃ রবিন্দর সিং কাউর এরাও বেশ।

এরা প্রত্যেকেই যা জমিয়ে রেখেছিল আজও তা ভাবলে মনটা ভারি হয়ে আসে। মনের আয়নায় ভাসছে ওদের সেই মন ভরানো গান।

ডাঃ চন্দন ঘোষাল গান ধরলেন — মহারাজা, তোমারে সেলাম, অনুপ ঘোষালের। বাসে মাইক্রোফোনের ব্যবস্থা আছে। গাইড ওদের দেশের গুনগান করতে করতে চলেছে। ওর কাছ থেকে মাইক্রোফোন নিয়ে এরা তিনজন পালা করে গান করল। এই বয়সে এত ব্যস্ততার মধ্যেও ওদের সঙ্গীতচর্চা এত সুন্দর, অবাক হতেই হবে।

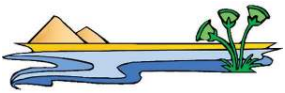

আসোয়ান বাঁধ
Aswan High Dam

গাইড বলল, 'আমরা আসোয়ান বাঁধের কাছে এসে গেছি। গাড়িতেই লাগেজ থাকবে। সকলে গাড়ি থেকে নেমে পড়ুন, বাঁধ দেখবেন। ফটো তুলবেন। এক ঘণ্টা সময়। বলে রাখা ভালো এটা দ্বিতীয় আসোয়ান বাঁধ।

নীলনদের জলে প্রতি বছর বন্যায় মিশরের বিপুল এলাকা ভেসে যেত। মানুষের দুর্গতির শেষ থাকত না। নীলনদের বিপুল জলরাশি নিয়ন্ত্রণের জন্য অনেক আগে থেকেই চেষ্টা চলছে।

জানা যায় একাদশ শতক থেকেই নীলনদের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু হয়। মিশরের ফাতিমিদ খলিফা আল হাকিম বিন আমির আলিয়াহ আরবের ইঞ্জিনিয়ার আল হাইথাম যিনি পশ্চিমী দেশে আলহাজেন বলে পরিচিত তাকে ডেকে আনেন। তাকে মিশরের খলিফা নীলনদের জল নিয়ন্ত্রণের উপায় খুঁজতে বলেন। খলিফা আল হাকিম বিন আমির আলিয়াহ তাকে আসোয়ানেই বাঁধ নির্মানের কথা ভাবতে বলেন।

ইঞ্জিনিয়ার আল হাইথাম অনেক দিন ধরে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। হিসাব করে দেখেন এই বিপুল জলরাশি নিয়ন্ত্রণ একেবারেই অসম্ভব। এ কথা তিনি খলিফা আল হাকিম বিন আমির আলিয়াকে বলেন। শুনে খলিফা বেজায় রুষ্ট হন আল হাইথামের উপর। খলিফা ভাবেন ইঞ্জিনিয়ার আল হাইথাম এটা করতে পারেন কিন্তু দুশমনি করে এটা করছে না। তিনি তাকে গ্রেফতার করেন ও কারাগারে প্রেরণ করেন। ১০২১ সালে তার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত কারগারেই জীবন কাটে ইঞ্জিনিয়ার আল হাইথামের।

এরপর মিশর দেশটি চলে যায় ইংরেজ শাসনাধীনে। ইংরেজরা এসে আবার নীলনদের জল নিয়ন্ত্রণের কথা ভাবেত শুরু করেন। ১৮৯৮ সালে ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ারার কাজ শুরু করেন আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে। এই বাঁধের নকশা তৈরি করেন স্যার উইলিয়াম বিলককস। তাকে সহযোগিতা করেন স্যার বেঞ্জামিন বেকার এবং স্যার জন আইরিড নামের দুই বিশিষ্ট বিজ্ঞানী।

জন আইরিড এন্ড কোম্পানি এই কাজে কনট্রাক্ট পায়। আসোয়ান বাঁধের কাজ শুরু হয় ১৮৯৮ সালে ও কাজ শেষ হয় ১৯০২ সালে। ১৯০২ সালে ১০ই ডিসেম্বর এই বাঁধ চালু

আসোয়ান বাঁধ

আসোয়ান বাঁধের পাড়ে ডাঃ দীপালী বিশ্বাস

হয়। বাঁধটি চালু করার পর দেখা গেল এ বাঁধটি নীলনদকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম নয়। এর উচ্চতা ছিল ৫৪ মিটার এবং দৈর্ঘ্য ১৯০০ মিটার।

১৯১২ সালে আদ্রিয়ান ড্যানিনোস নামের এক গ্রীক-মিশরীয় ইঞ্জিনিয়ার এই লো ড্যাম বা পুরোনো বাঁধটিকে আরও পরিবর্ধিত করার পরিকল্পনা নেন। আরও বড়ো ও মজবুত করার চিন্তা ভাবনা করেন। সে অনুযায়ী তিনি একটা খসড়া তৈরি করে সম্রাট ফারুককে দেখান। কিন্তু সম্রাট ফারুক আদ্রিয়ান ড্যানিনোস এর পরিকল্পনাকে আমল দিলেন না। বরং ইংরেজ জল-বিজ্ঞানী হ্যারল্ড এডুইন হার্স্ট নীলনদের উৎস সুদান ও ইথিওপিয়ায় নীলনদের জল আটকে রাখার পরিকল্পনা দেন সম্রাট ফারুককে। সম্রাট ফারুক এ প্রস্তাবে রাজী হন ও পরিকল্পনা গ্রহণ করতে বলেন হ্যারল্ড এডুইন হার্স্টকে। এরপর ঘটে পালা বদল। মিশরের একনায়ক ফারুককে ক্ষমতাচ্যুত করা হয় এবং ইটালিতে নির্বাসনে পাঠানো হয়। ফলে হ্যারল্ড এডুইন হার্স্টের পরিকল্পনা বাতিল হয়।

গামাল আব্দেল নাসেরের নেতৃত্বে ফ্রি-অফিসার আন্দোলনে মিশরে গঠিত হল ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক। গামাল আব্দেল নাসেরের নিতৃত্বধীন সরকার মনে করেন নীলনদের জল সুদান বা ইথিওপিয়ায় নয় মিশরেই বাঁধের সাহায্যে আবদ্ধ রাখতে হবে। সম্রাট ফারুককে হটিয়ে মিশরে দায়িত্ব নেওয়ার পর তিনি মিশরের সার্বিক উন্নয়নের কথা ভাবতে শুরু করেন। তিনি দ্রুত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দিকে এগোলেন, কারণ তিনি বুঝেছিলেন যে একদিকে প্রচণ্ড খরা অন্যদিকে মারাত্মক বন্যা দুটোই মিশরের অগ্রগতিতে বড় বাধা।

আদ্রিয়ান ড্যানিনোসের আসোয়ান বাঁধ নির্মানের পরিকল্পনা খতিয়ে দেখেন গামাল আব্দেল নাসের। তিনি বুঝতে পারেন এই আসোয়ান বাঁধ পরিকল্পনা মিশরের বর্তমান অবস্থার আমুল পরিবর্তন ঘটাবে।

গামাল আব্দুল নাসের বুঝেছিলেন এই বাঁধ তৈরি করলে ঃ

মিশরের একটা বিরাট অংশে সারা বছর লেগে থাকা খরা দূর হবে।

বন্যায় যে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয় তা থেকে মুক্তি পাবে মিশর।

বাঁধের সাহায্যে জল বিদুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে পারলে মিশরের বিপুল এলাকায় বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া যাবে।

এ সবের ফলে বিপুল কর্মসংস্থান হবে।

এক আধুনিক শক্তিশালী মিশরের স্বপ্ন দেখতে থাকেন গামাল আব্দুল নাসের। মাত্র দুই মাসের মধ্যেই নাসের ড্যানিনোসের পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন ও কার্যকর করার কাজে হাত লাগান। ইতিমধ্যে আমেরিকা ও রাশিয়া দুই দেশে এই বাঁধ নির্মানের জন্য নাসেরের কাছে আগ্রহ প্রকাশ করে।

তখন আমেরিকা ও রাশিয়া এই দুই মহাশক্তির মধ্যে চলছে ঠাণ্ডা যুদ্ধ। এর মধ্যে নাসের নিজেকে সমগ্র আরব রাষ্ট্রগুলির নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। ১৯৫৫ সালে

ইরাকের হাসেমতাই রাজত্বে বাগদাদ প্যাক্ট চুক্তি স্বাক্ষর হয়, এটাও এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আমেরিকা আশঙ্কা করে যে রাশিয়ার প্রত্যক্ষ মদতে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে কম্যুনিষ্ট প্রভাব বাড়তে পারে।

আমেরিকা দেখল যে গামাল আব্দুল নাসের ধীরে ধীরে আরব লিগের এক অবিসম্বাদিত নেতা রূপে আবির্ভুত হচ্ছেন। তাছাড়া তারা ভাবল তিনি কম্যুনিস্ট বিরোধী ধনতান্ত্রিক মানসিকতার এক শক্তিধর রাষ্ট্রনেতা। এটা ভেবে মিশরকে রাশিয়া ও কম্যুনিজমের প্রভাব মুক্ত রাখতে আমেরিকা ও ব্রিটেন যৌথভাবে মিশরের এই আসোয়ান বাঁধের তৈরিতে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। তারা ধার হিসাবে মিশরকে ২৭০ মিলিয়ন ডলার দিতে রাজি হয়। বিনিময়ে বর্তমান আরব ইজরায়েল বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এই প্রতিশ্রুতি চান নাসেরের কাছে।

নাসের সমগ্র আরব রাষ্ট্রগুলির কাছে নিজেকে সমাজতন্ত্র বিরোধী ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জোট নিরপেক্ষ নেতার ভাবমূর্তিতে তুলে ধরেন। মিশরের ও সমগ্র আরব রাষ্ট্রগুলির জন্য তিনি আমেরিকা ও রাশিয়া দুই দেশেরই সাহায্য কামনা করেন। যখন নাসের নিজেকে সমগ্র আরব রাষ্ট্রগুলির কাছে এক শক্তিশালী আরব নেতারূপে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট তখন ইজরায়েল ১৯৫৫ সালে মিশরের গাজা উপত্যাকায় আক্রমণ করে বসে ও বিশাল চাপের মধ্যে ফেলে দেন নাসেরকে।

নাসের অনুধাবন করলেন যে তিনি যদি তার দেশের উপর ইজরায়েলের সামরিক আগ্রাসন প্রতিহত না করতে পারেন তা হলে তিনি কখনোই সমগ্র আরব জাতির নেতা রূপে প্রতিষ্ঠা পাবেন না। তিনি বুঝলেন মিশরের অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সাথে মিশরের সামরিক শক্তির আধুনিকায়ন ঘটাতে হবে। মিশরের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি না ঘটলে সমগ্র আরব জাতির কাছে নিজেকে তাদের নেতা রূপে উপস্থাপন সম্ভব নয়। এবার তাই তার দেশের সামরিক বাহিনীর আধুনিক অস্ত্রসম্ভার বাড়ানোর জন্য সরাসরি আমেরিকার দ্বারস্থ হলেন।

আমেরিকান সেক্রেটারি অফ স্টেট জন ফস্টার ডালেস ও আমেরিকান প্রেসিডেন্ট আইজেন আওয়ার মিশরকে প্রস্তাব দেন যে তারা মিশরকে শর্তসাপেক্ষে অস্ত্র সরবরাহ করতে প্রস্তুত।

শর্তগুলো ছিল এরকম ঃ-

মিশর প্রতিশ্রুতি দেবে যে সে এই অস্ত্র কোন দেশ আক্রমণের জন্য ব্যবহার করবে না।

সে অস্ত্র ব্যবহার করতে পারবে শুধু মাত্র মিশরের আত্মরক্ষার জন্য।

আর সমগ্র অস্ত্র ভাণ্ডার আমেরিকার সেনাবাহিনীর নজরদারিতে রাখতে হবে।

মিশরের সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেবে আমেরিকা।

এ প্রস্তাবে মিশর রাজি হয় না। নাসের সরাসরি আমেরিকার এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

নাসের তখন রাশিয়ার দ্বারস্থ হন এবং তাদের সাহায্যপ্রার্থী হন। জন ফস্টার ডালেস বিশ্বাস করতেন যে রাশিয়া কখনোই মিশরের দাবি মতো সাহায্য করবে না। ডালেস ভাবতেন

নাসের রাশিয়াকেও ঠকাবে। কিন্তু অচিরেই ডালেসের চিন্তা ভাবনা ভুল প্রমানিত হল। রাশিয়া মিশরকে অস্ত্র সামগ্রি দিতে রাজি হল, মিশরকে অস্ত্রের মূল্য তার তুলা ও শস্যের বিনিময়ে পরিশোধ করতে হবে। ১৯৫৫ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর চেকোস্লোভাকিয়ার মাধ্যমে রাশিয়ার সঙ্গে এক সামরিক অস্ত্র ক্রয়ের চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

রাশিয়ার দিকে নাসেরর এই ঝুঁকে পড়ার জন্য আমেরিকা নাসেরের বিরোধিতায় না গিয়ে বরং নাসেরের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করেন। ডালেস মিশরকে তাদের আসোয়ান বাঁধের নির্মানের জন্য আমেরিকার আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করেন। ১৯৫৫ সালের ডিসেম্বরে ডালেস বলেন আমেরিকা আসোয়ান বাঁধ নির্মানে ৫৬ মিলিয়ন ডলার সাহায্য দেবে। একই সঙ্গে ব্রিটেন বাঁধ নির্মানে ১৪ মিলিয়ন ডলার সাহায্য করবে প্রতিশ্রুতি দেয়।

চেকোস্লোভাকিয়া অস্ত্র চুক্তির ফলে মিশরের প্রতি আমেরিকার আগ্রহ আরও বেড়ে যায় রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার কারণে। আমেরিকা আসোয়ান বাঁধ তৈরিতে আগ্রহ দেখাতে থাকে। ব্রিটেন তাদের প্রতিশ্রুতি মত অর্থ দিতে রাজি হয়।

এই সময় আর একটি যুগান্তকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে মিশর। মিশর চিনকে স্বীকৃতি দেয়। চিনের স্বীকৃতির ফলে ডালেস খুব ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং সরাসরি মিশর বিরোধিতার পথ অবলম্বন করেন। তখন আমেরিকা চিনকে স্বীকৃতি দেয়নি, বরং তাইওয়ানকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। এমনকি চিনকে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ভেটো ক্ষমতাধরদের মধ্যেও জায়গা দিতে আপত্তি জানিয়ে আসছে আমেরিকা।

আমেরিকা এতই ক্ষুব্ধ হয়ে যে মিশরকে যে অর্থ সাহায্য দেওয়ার কথা আমেরিকা তা প্রত্যাহার করে নেয়। ডালেসের তখনও বিশ্বাস যে রাশিয়া সর্বপ্রকার সাহায্য মিশরকে দিতে পারবে না। ডালেস আরও অসন্তুষ্ট হন এই জন্য যে নাসের রাশিয়া ও আমেরিকার স্নায়ু যুদ্ধে উভয় পক্ষের সাথে নোংরা খেলা খেলছেন। আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্যের অন্য বন্ধু দেশগুলো বিশেষ করে তুরস্ক ও ইরাককে আরও আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশগুলো মিশরের উন্নতিতে ক্রমেই হিংসান্বিত হয়ে পড়ছিল। আমেরিকা এ সুযোগ কাজে লাগানোর চেষ্টা করে।

১৯শে জুলাই ১৯৫৬ তারিখে আমেরিকা ঘোষণা করে বর্তমান পরিস্থিতিতে মিশরকে বাঁধ নির্মানের জন্য আর কোন আর্থিক অনুদানই দেবে না। ২৬শে জুলাই ১৯৫৬ মিশর সুয়েজ খালের জাতীয়করণ ঘোষণা করেন। নাসের ঘোষণা করেন, এই সুয়েজ খাল দিয়ে যে সকল জাহাজ যাতায়াত করবে তাদেরকে কর দিতে হবে। নাসের ঠিক করেন এই করের অর্থ আসোয়ান বাঁধের নির্মানে খরচ করবেন।

ব্রিটেন, ফ্রান্স, ও ইজরায়েল এই কর দিতে আপত্তি করে। ইজরায়েল যুদ্ধ বাধিয়ে সুয়েজ খাল ও সিনাই উপত্যকা দখল করে নেয়। তখন রাশিয়া জাতিসংঘে বিষয়টি উত্থাপন করে।

রাশিয়া ও জাতিসংঘের প্রবল চাপের মুখে ইজরায়েল সুয়েজ খাল ও সিনাই উপত্যকার দখল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

১৯৫৮ সালে রাশিয়া ভারি যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি দিয়ে বাঁধ নির্মানের কাজ শুরু করে দেয়। মিশরের প্রায় ২৫,০০০ ইঞ্জিনিয়ার ও শ্রমিক এই কাজে অংশ নেয়। মিশরের দিক থেকে ওসমান আহমেদ ওসমান কনট্রাক্টর বাঁধ নির্মানের কাজের দায়িত্ব পায়।

আসোয়ান বাঁধ নির্মানের দিনপঞ্জী এ রকম ঃ-

❑ ১৯৬০ ঃ বাঁধের নির্মাণকাজ শুরু—৯ই জানুয়ারী

❑ ১৯৬৪ ঃ বাঁধ নির্মানের প্রথম ধাপ সম্পূর্ণ হয়

❑ ১৯৭০ ঃ বাঁধ নির্মানের কাজ চুড়ান্ত হয় নামকরণ হয় সাদ আল আলি

❑ ১৯৭৬ ঃ জলাধার পূর্ণ হয়।

আসোয়ান বাঁধের পরিমাপ যদি দেখতে চাই ঃ

দৈর্ঘ্য ১৩,০০০ ফুট (৪০০ মিটার)

চওড়া ঃ ভিত্তি - ৩,২২০ ফুট (৯৮০ মিটার)

চওড়া ঃ উপরে ১৩০ ফুট (৪০ দৈর্ঘ মিটার)।

উচ্চতা ঃ ৩৬৪ ফুট (১১১ মিটার)

প্রতি সেকেন্ডে বাঁধের ভিতর দিয়ে ৩,৯০,০০০ ঘন ফুট (১১, ০০০ ঘন মিটার) জল যেতে পারে। তোসকা খাল দিয়ে লেক নাসের বা নাসের জলাধারে জল ধরে রাখার ব্যবস্থা আছে।

এই নাসের জলাধারের পরিমাপ ঃ

৫৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ ও

৩৫ কিলোমিটার চওড়া।

এই জলাধার ১৩২ ঘন কিলোমিটার জল ধারণ করতে সক্ষম।

আসোয়ান বাঁধের জন্য খরা বন্যার মোকাবেলা ছাড়াও ১২টি জেনারেটরে মোট ১৭৫ মেগাওয়াট বিদ্যুত তৈরি হচ্ছে যা সমগ্র মিশরের সমগ্র চাহিদার প্রায় অর্ধেক। লেক নাসের ঘিরে চলছে মৎস্য প্রকল্প ও সহযোগী শিল্প ও কর্মসংস্থান।

The Aswan High Dam is 4,000 metres (13,000ft) long. 980m (3,220ft) wide at the base, 40m (130ft) wide at the crest and 111m (364ft) tall. Maximum, 11,000 cubic metres per second (390,000 cu ft/s) of water can pass through the dam.

There are further emergency spilways for an extra 5,000 cubic metres per second (180,000 cu ft's) and the Toshka Canal links the reservoir to the Toshka Depression.

The reservoir, Lake Nasser, is 550 km long and 35 km at its widest, with a surface area of 5,250 square kilometres (2,030 sq mile). It holds 132 cubic Kilometres of water.

Aswan Dam :- The earliest recorded attempt to build a dam near Aswan was in the 11th century, when the Arab Polymath and Engineer Ibn Al-Haytham (known as Alhazen in the West) as summoned to Egypt by the Fatimid Caliph, Al-Hakim-bi-Amr Allah, to regulate the flooding of the Nile, a task requiring an early attempt at an Aswan Dam. His field work convinced him of the impracticality of this scheme.

Aswan Low Dam, (1898-1902) :

The British began construction of the first dam across the Nile in 1898. Construction lasted until 1902, and the dam was opened on 10 December 1902. The project was designed by Sir William Willcocks and involved several eminent engineers, including Sir Benjamin Baker and Sir John Airid, whose firm. John Airid & Co. was the main contractor.

Aswan High Dam, (1954-1959) :

In 1912, the Greek-Egyptian Engineer Adrian Daninos began to develop the plan of the new Aswan Dam. Although the Low Dam was almost overtopped in 1946 the government of King Farouk showed no interest in Daninos's plans. Instead the Nile Valley Plan by the British hydrologist Harold Edwin Hurst to store water in Sudan and Ethiopia, where evaporation is much lower, was favored.

The Egyptian position changed completely with the overthrow of the monarchy, led by the Free Officers Movement including Gamal Abdel Nasser. The Free Officers were convinced that the Nile Water had to be stored in Egypt for political reasons, and within two months, the plan of Daninos was accepted. Initially, both the United States and the USSR were interested in helping the development of the dam, but this movement happened in the midst of the Cold War, as well as of growing intra-Arab rivalries.

in 1955, Nasser was trying to portray himself as the leader of Arab nationalism, in opposition to the traditional monarchies, especially the Hashemite Kingdom of Iraq following its signing of the 1955 Baghdad Pact. At that time the U. S. feared that communism would spread to the Middle East, and it saw Nasser as a natural leader of an anticommunist procapitalist Arab League. America and Britain offered to help finance construction of the High Dam, with a loan of $ 270 million, in return for

Nasser's leadership in resolving the Arab-Israeli conflict. While opposed to communism, capitalism, and imperialism, Nasser pressented himself as a tactical neutralist, and sought to work with both the U.S. and the USSR for Egyptian and Arab benefit. After a particularly criticized raid by Israel against Egyptian forces in Gaza in 1955, Nasser realized that he could not legitimately portray himself as the leader of pan-Arab nationalism if he could not defend his country militarily against Israel. In addition to his development plans, he looked to quickly modernize his military, and he turned first to the U.S.

Egyptian President Nasser and Russian leader Nikita Khruscheve were at the ceremony to divert the Nile during the construction of the Aswan High Dam on 14 May 1964, there Khrushchev called it "**the eighth wonder of the the world."**

The American Secretary of State John Foster Dulles and the American President Dwight Eisenhower told Nasser that the U.S. would supply him with weapons only if they were used for defensive purposes and accompanied by American military personnel for supervision and training. Nasser did not accept these conditions, but then he looked to the USSR for support.

Although Dulles believed that Nasser was only bluffing and that the USSR would not aid Nasser, he was wrong- the USSR promised Nasser a quantity of arms in exchange for a deferred payment of Egyptian grain and cotton. On 27 September 1955, Nasser announced an arms deal, with Czechoslovakia acting as a middleman for the Soviet support. Instead of attacking Nasser for turning to the Soviets, Dulles sought to improve relations with him. This explains the later offer of December 1955, in which the U.S. and Britain pledged $56 and $14 million respectively towards the construction of the dam.

Though the Czech arms deal actually increased the American willingness to invest at Aswan, Great Britain cited the deal as a reason for reversing its promise of funds. What angered Dulles much more was Nasser's diplomatic recognition of China, which was in direct conflict with Dulles's policy of containment. There are several other reasons why the U.S. decided to withdraw its offer of funding dulles believed that the USSR would not fulfill its commitment to help the Egyptians. He was also irritated by Nasser's neutrality and attempts to play both sides of the cold War. At the time, other western allies in the Middle East,

including Turkey and Iraq, were irritated and jealous the Egypt, a persistently neutral country. was being offered so much aid.

In June 1956 the Soviets offered Nasser $1. 12 bilion at 2% interest for the construction of the dam. On 19 July the U. S. State Department announced that American financial assistance for the High Dam was not feasible in present circumstances.

On 26 July 1956,with wide Egyptian acclaim, Nasser announced the nationalization of the Suez Canal as well as fair compensation for the former owners, Nasser planned on the revenues generated by the canal helping to fund construction of the high Dam. When the Suez War broke out, the United Kingdom, France, and Isrqel seized the canal and the Sinai, but pressure from USSR at the United Nations and elsewhere forced them to withdraw.

In 1958, the USSR went ahead in providing support for the High Dam project.

The Soviets also provided technicians and heavy machinery. The enormous rock and clay dam was designed by the soviet Hydroproject Institute along with some Egyptain engineers. 25,000 Egyptian engineers and workers contributed to the Construction of the dams.

On the Egyptian side, the project was led by Osman Ahmed Osman's Arab Contractors. The relatively young Osman underbid his only competitor by one-half.

Years from starting :

❑ 1960 : Start of construction on 9 January

❑ 1964 : First dam construction stage completed, reservior started filling

❑ 1970 : The High Dam, as-Sad Aali, completed on 21 July

❑ 1976 : Reservoir reached capacity.

কিন্তু এই আসোয়ান বাঁধের কারণে অনেক সমস্যাও দেখা দেয়। ওয়াড়ি হালফা শহর ও আসে পাশের অনেকগুলি গ্রাম জলের নিচে হারিয়ে যায়।

নুবিয়ার বিপুল অঞ্চল জলের নিচে চলে যাওয়ার কারণে প্রায় ১,০০,০০০ থেকে ১, ২০,০০০ জন মিশরীয় সুদান ও ইথিওপিয়ায় চলে যেতে বাধ্য হয়।

সুদানেই প্রায় ৫০,০০০ থেকে ৭০,০০০ জন সুদানি নুবিয়ানদের ওল্ড ওয়াড়ি হালফা থেকে আশে পাশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সরিয়ে নেওয়া হয়। অনেক অধিবাসিদের লেক নাসেরের পাশ থেকে সরিয়ে নিউ ওয়াড়ি হালফাতে বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়। বুটানা সমতল থেকে

বিপুল সংখ্যক মিশরীয়কে ৭০০ কিলোমিটার দক্ষিণে আটবারা নদির ধারে কাশেম শহরের পাশে সরিয়ে নেওয়া হয়। মিশরের ৫০,০০০ জন নুবিয়ানকে নীলনদের ৩ থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে কমওম্বো শহরের নিচে নিউ নুবিয়াতে বসতি স্থাপন করতে হয়। আসোয়ান থেকে প্রায় ৪৫ কিলোমিটার উত্তরে প্রায় ৪৫টি গ্রামের সৃষ্টি করে বসতির ব্যবস্থা করা হয়। এরা অনেকে নতুন অবস্থায় খাপ খাইয়ে নিতে না পেরে পুরোনো সংস্কৃতি খুঁজে পেতে লেক নাসেরের তীরে চলে আসে পুরোনো জায়গায়।

আর একটি মারত্মক সমস্যা সৃষ্টি হয়– ফারাওদের অনেক পুরাকীর্তি ও স্থাপত্য জলের নিচে চলে যায় এবং এগুলো প্রায় নষ্ট হতে বসেছিল। রামেসেস দি গ্রেট এর বিশাল আবু সিম্বেল টেম্পল বন্যায় জলমগ্ন হয়ে যায়। ১৯৬৭ সালে ইউনেস্কোর সহযোগিতায় এই বিশাল টেম্পল সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় বহু অর্থ ব্যয় করে।

মিশরের আদি সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখতে মোট বাইশটি পুরাকীর্তি ও স্থাপত্য সরিয়ে নিতে হয়, তার মধ্যে যেগুলি প্রধান ঃ-

❑ ডেবোড টেম্পল
❑ ডেনডুর টেম্পল
❑ টেম্পল অফ তাফেহ
❑ টেম্পল অফ এলিসিয়া প্রভৃতি।

এগুলিকে খারতুমের সুদান ন্যাশনাল মিউজিয়ামের পাশের বিশাল বাগানে স্থানান্তর করে রক্ষা করা হয়।

এছাড়াও সরিয়ে নিতে হয় ঃ

❑ আকসার টেম্পল অফ রামেসেস-২
❑ বুহেনের হাটসেপসুট টেম্পল,
❑ কুমার খানুম টেম্পল
❑ ডেবেরিয়ায় নুবিয়ান রাজপুত্র দেহুটি হোটেপের সমাধি এবং
❑ সেমনরা সেসোসত্রিস-৩ এর টেম্পল।

Monuments and architectural complexes which were flooded and went under water, and those were moved :-

To save Great Temple of Abu Simbel from being flooded it was reassembled after having been moved in 1967.

22 monuments and acrhitectural complexes those were threatened by flooding from Lake Nasser, including the Abu Simbel temples, were preserved by moving them to the shores of the lake. Also moved were Philae, Kalabsha and Amada.

These monuments were granted to countries that helped with the works:

❑ The Debod temple to Madrid

❑ The Temple of Dendur to the Meropolitan Museum of Art of New York

❑ The Temple of Taffeh to the The Rijksmuseum van Oudheden of Leiden

❑ The Temple of Ellesyia to the Museo Egizio of Turin

❑ These items were removed to the garden area of the Sudan National Museum of Khartoum

❑ The temple of Ramses II at Aksha

❑ The temple of Hatshepsut at Buhen

❑ The temple of Khnum at Kumma

❑ The tomb of the Nubian prince Djehuti-hotep at Debira

❑ The temples of Dedwen and Sesostris III at Semna

❑ The granite columns from the Faras Cathedral

❑ A part of the paintings of the Faras Cathedral ; the other part is in the National Museum of Warsaw.

ক্যাথেড্রালের গ্রানাইট স্তম্ভগুলিও সরিয়ে নিতে হয়। এগুলি স্থানান্তর করা শুধু ব্যয় সাপেক্ষই ছিল না, ছিল দুরূহ ও কঠিন কাজ। কিন্তু সেটাও করা হয়েছিল। এই অসাধ্য সাধনে বিশ্বের অনেক দেশ এগিয়ে এসেছিল সাহায্য করতে যার ফলে বিশ্বের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরাকীর্তি রক্ষা করা গেছে।

আসোয়ান বাঁধ নির্মানের পূর্বে যখন বন্যা হত তখন নীলনদ পলি মাটি বয়ে নিয়ে আসত কৃষি জমিতে। এর ফলে উর্বর থাকত জমি। ফসল ফলত প্রচুর, কোন কষ্ট ছাড়াই। কিন্তু বাঁধ নির্মাণের ফলে জমির উর্বরতা কমে যায়। ফসলের উৎপাদনও কমে যায়। বেশি ফসল ফলাতে প্রচুর রাসায়নিক সার ব্যবহার শুরু হল। সমগ্র এলাকায় রাসায়নিক দূষণ বেড়ে যেতে লাগল। লবনাক্ততা বেড়ে গেল নীলনদের অববাহিকায় যেখানে নীলনদ মিলেছে ভূমধ্যসাগরে। মৎস্য উৎপাদন কমে গেল প্রচণ্ড ভাবে। পূর্বে যে ভাবে মৎস্য যোগান দিতে পারত তাও এই আসোয়ান বাঁধের নির্মানের ফলে মার খেতে লাগল।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপর আসোয়ান বাঁধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। সিসটোসোমা ম্যানসনি নামক প্যারাসাইটের আক্রমনে মানুষের গায়ের চামড়ায় ক্ষত সৃষ্টি করে। রক্ত ও মূত্রের মাধ্যমে আক্রান্ত হয়ে বহু মানুষ রোগগ্রস্ত হয়ে পড়তে থাকে।

১৯৯০ সালে সিসেটোসোমিয়াসিস আক্রান্ত মানুষের মধ্যে চিকিৎসা শুরু করা হয়। সরকারি পর্যায়ে ব্যাপক প্রতিরোধক ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয় এবং এই রোগটিকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনা সম্ভব হয়।

আসোয়ান বাঁধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া লাভের চেয়ে কম ছিল না।

আমাদের লাক্সারি বাসটি ইতিমধ্যে আসোয়ান বাঁধের গায়ে এনে দাঁড় করিয়েছে। এত শুনেছি এই বাঁধের বিষয়ে তা সচক্ষে দেখার জন্য ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে যাওয়ার উপক্রম আমাদের। সকলে হুড়মুড়িয়ে নামলাম বাস থেকে। বিশ্বের অন্যতম সেরা বাঁধ এই আসোয়ান বাঁধ। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম বাঁধ এই আসোয়ান বাঁধ।

অনেক মানুষ, অনেক দল বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছে আসোয়ান বাঁধ দেখতে। চড়া রোদ উপেক্ষা করে যত দূর চোখ যায় বাঁধ দেখছে সবাই। সকলেই আসোয়ান বাঁধ পিছনে রেখে নিজের ছবিটি ক্যামেরাবন্দি করতে চাইছে। নিজের ক্যামেরা অন্যকে দিয়ে একটু সবিনয় অনুরোধ, 'আমার ছবিটি একটু তুলে দাও না।'

এর মধ্যে অনেক বিদেশি যারা এসেছে তাদের নিয়েও ছবি তোলার বেশ আগ্রহও সকলের।

প্রথমে ইতঃস্তত ভাব ছিল সকলের মধ্যে ছবি তোলা নিয়ে। একটু এগিয়ে গিয়ে জড়তা কাটিয়ে দীপালী জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা কি একসঙ্গে ছবি তুলে রাখতে পারি?' সঙ্গে সঙ্গে সুইডেন থেকে আসা ইয়ং ম্যান হেসে বলে ওঠে, 'হোয়াই নট? হোয়াই নট?'

তার পর দল বেঁধে গ্রুপ ছবি তোলা। বাঁধের কথা ভুলেই সারা বিশ্ব যেন এক ফ্রেমে বন্দি হবার উদগ্র বাসনা। ইউরোপ থেকে আসা এক দঙ্গল ছেলে মেয়েদের নিয়ে ছবি তোলায় সে কি আগ্রহ। নানা ভঙ্গি নানা ভাবে ছবি তোলা আর শেষ হয় না। একটি বাঁধ যে এত ভিন্ন স্বাদের ভিন্ন দেশের অচেনা মানুষদের এমন কাছে নিয়ে আসতে পারে এখানে যারা এসেছে তারাই সাক্ষী হয়ে থাকলাম। হঠাৎ যেন মিলে মিশে একাকার এশিয়া ইউরোপ আর আফ্রিকার মানুষেরা। নিজেদের দম্ভ অহংকার আভিজাত্য বাড়িতে রেখে এখানে এসেছে তাই সব মানুষ সমান। কোন বিভেদ নেই পর্যটনে।

এরমধ্যে আবার কিছু ইরানি পরিবার এসেছে বাঁধ দেখতে। আসোয়ান বাঁধের কাছে এই পরিবেশে মহিলাদের পর্দার বালাই নেই। খোলামেলা হাসি আর ছবি তোলাতেই ব্যস্ত। কেউ কারও ভাষা বুঝতে পারছে না অথচ হাসি তো বোঝা যায়।

ইরানি পরিবারগুলোর একটি পরিবারে পোশাক পরিচ্ছদে বোঝা গেল উচ্চ শিক্ষিত স্মার্ট সকলে। আমি কথা বলার জন্য এগিয়ে গেলাম। ভদ্রলোক পেশায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ার সঙ্গে তার দুই স্ত্রী, শ্যালিকা ও চার কন্যা সকলে এসেছে মিশর ভ্রমণে। তার প্রথম দিনে ওরা এসেছে আসোয়ান বাঁধ দেখতে। বেশ ভাব হয়ে গেল আমার সঙ্গে। ওদের সঙ্গে অনেক ছবি তুললাম। দীপালী অনেকগুলো ছবি তুলে দিল আমার আর ওদের। হাসি আর উচ্ছল ইরানি সুন্দরী তরুণীরা। সে স্মৃতি এখনও গেঁথে আছে মনে।

দেখি এক কৃষ্ণাঙ্গ তরুণী আর এক শ্বেতাঙ্গ তরুণকে একেবারে বগলদাবা করে ঘুরছে এদিক ওদিক। তরুণীর দিকে হাত বাড়িয়ে বললাম, 'দিস ইজ ডাঃ তপন কুমার বিশ্বাস ফ্রম ইন্ডিয়া।'

সে এক গাল হেসে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডশেক করল 'মিস কিনান্থা ফ্রম ইথিওপিয়া। এন্ড দিস ইস জন ফ্রম লন্ডন, মাই ফ্রেন্ড।'

আমি জনের দিকেও হাত বাড়ালাম। অবাক হলাম আসোয়ানের বাঁধ কি সুন্দর বেঁধে দিয়েছে আফ্রিকার কিনান্থা আর ইউরোপের জনকে। আমার সাথে অনেক গল্প করল। ওরা দুই বন্ধু। এক সাথে দু'জন লন্ডনে ম্যানেজমেন্ট পড়ে। বেড়াতে এসেছে মিশর। তিনজনে ছবি তুললাম। ভ্রমণে এটাই মজা। মুহূর্তে বন্ধুত্ব হয়ে যায়। এশিয়া আফ্রিকা ইউরোপ সব এক ফ্রেমে বন্দি ছবি। ক্ষণিকের হলেও এক অনাবিল বন্ধুত্ব। ঠিকানা– ফোন নম্বর বিনিময় হল। বিদায় বেলায় মন খারাপ একটু হয়ই। যদিও বলতে ভুলিনি, 'সি ইউ এগেইন। আবার দেখা হবে অন্য কোথাও অন্য কোনও দিন।'

অনেক ছবি তোলা হল। এবার ফেরার পালা। পরবর্তি গন্তব্যে যেতে হবে।

ফিরে যেতে হবে যার যার দেশে। তাই মন খারাপও সকলের। সকলের কাছে একসময় এই ছবিগুলো সেই আসোয়ান বাঁধের স্মৃতিচারণায় উঠে আসবে সকলের অ্যালবামে।

গাইডের তাড়ায় যে যার বাসে উঠতে বাধ্য হলাম।

একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। এখন না লিখলে পরে ভুলে যাব। সারাদিনের শেষে রাত্রে ঘুমোতে যাওয়ার আগে ডায়েরি লিখে রাখার অভ্যাস। এদিনও বাঁধ দেখে ফিরে রাত্রে রুমে ঘুমোনোর আগে বিছানায় শুয়ে যথারীতি ডায়েরিটা নিয়ে লিখছি।

এমন সময় দীপালী বলল, 'আজ আর রাত জাগতে হবে না। ঘুমিয়ে পড়। কাল ভোরে উঠতে হবে। লাইট অফ করব?

আমি বললাম, 'একটু দাঁড়াও। দু মিনিট। আজকের বিষয়টি লিখে রাখি। না হলে ভুলে যাব পরে।'

দীপালী ঝুকে পড়ে দেখতে চাইল, 'কি লিখছ– ওই ইরানি মেয়েগুলোকে নিয়ে কবিতা লিখছ নাকি? মনে ধরেছে মনে হচ্ছে ইরানি মেয়েগুলোকে।'

'না না। সব লিখছি, আজকের সবকিছু। শুধু ইরানি মেয়েগুলোকে নিয়ে লিখব কেন? সব কিছুই লিখছি।'

'লেখ লেখ। আর ওদের দেখা কোনদিনও পাবে না। কবিতায় যদি স্বাদ মেটে।'

বলে দু'জনে একপ্রস্থ হাসি।

সে রাতে আর লেখা হয়নি কোনও কিছু।

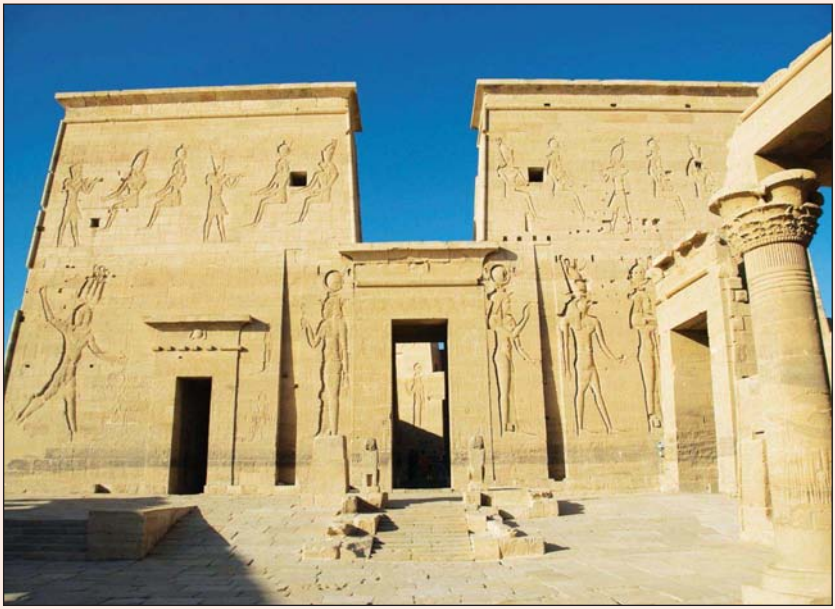

ফিলি টেম্পল

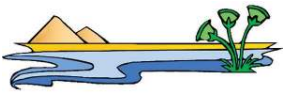

ফিলি দ্বীপ-ফিলি টেম্পল
Philae Island-Philae Temple

সকলে আবার উঠলাম আমাদের ময়ুরপঙ্খীতে। ময়ুরপঙ্খী মানে আমাদের বাসটি। সত্যি সুন্দর দেখতে বিলাসবহুল বাসটি। বাস যাবে ফিলি নামক একটি দ্বীপে। গাইড বলল দ্বীপটি নাকি খুব সুন্দর। তাই মিশরের রাস্তায় ছুটল আমাদের ময়ুরপঙ্খী। আর বলে চলল তার দেশের জয়গাথা। গাড়ির মধ্যেই আছে মাইক্রোফোন। হঠাৎ দেখি আবেগ আপ্লুত হয়ে মিসেস ডাঃ রবিন্দর সিং কাউর গাইডের কাছে মাইক্রোফোন চেয়ে নিল। বলল একটা গান শোনাবে। বাহ মিশরে এসে দেশের গান। গানটি ছিল জনপ্রিয় গান— মেরা নাম চিন চিন চু। অসাধারণ হিন্দি গানটি দেশে সকলের মুখে মুখে। বাসের মধ্যে সকলেই গলা মেলালেন। নাচলেন কেউ কেউ–আনন্দে আত্মহারা।

ডাঃ চন্দন ঘোষাল উসখুস করছিল।

রবিন্দর সিং এর কাছ থেকে হাতে মাইক্রোফোন নিয়ে শুরু করল। চন্দন ঘোষাল গাইলেন শচীন দেব বর্মণের বিখ্যাত গান ঃ

আমি তাকদুম তাকদুম বাজাই বাংলাদেশের ঢোল
আমি তাকদুম তাকদুম বাজাই।
সব ভুলে যাই তাও ভুলিনা বাংলা মায়ের কোল।
আমি তাকদুম তাকদুম বাজাই বাংলাদেশের ঢোল।

সারা বাসের সকলে সে কি টালমাটাল অবস্থা। সবাই নাচছে। সবাই গাইছে। সাবাশ ডাঃ চন্দন ঘোষাল। মিশর ভ্রমণ একেবারে জমিয়ে দিয়েছে। এরপর মাইক ধরলেন ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জী। গাইলেন অনেকগুলো রবীন্দ্র সঙ্গীত। এই বয়সেও সে কি গলা। মন ভরে গেল আমাদের।

আমাদের বাসের গতি কমে এল। গানের আনন্দে বুঝতে পারিনি এতটা পথ চলে এসেছি। বুঝলাম নামতে হবে। গান থেমে গেল ভাস্করমণির। গাইড বলল সামনে ফিলি দ্বীপ। ওখানে যেতে হবে লঞ্চে। আসোয়ান বাঁধের ফলে যে বিরাট জলাভূমি তৈরি

হয়েছে সেখানেই এই ফিলি। পাশে নীলনদ বয়ে চলেছে। সবাই উঠলাম লঞ্চে একে একে— সাবধানে। লঞ্চ দুলে দুলে উঠছে। এ ওকে ধরাধরি করে তুললাম। টল টল পরিষ্কার জল— ছোটো লঞ্চ। পাশের দিকের বেঞ্চে বসে জলে হাত দিয়ে সে এক আলাদা ঠাণ্ডা অনুভব।

দীপালী আমাকে সাবধান করল, 'দেখো বেশি মজা করতে গিয়ে নিচে পড়ে যেও না।'

ওর কথায় সতর্ক হলাম। লঞ্চের একটা রড ধরলাম। বেশ বাতাসও হচ্ছিল। দু'পাশে কি সুন্দর দৃশ্য। খেজুর গাছের বন। আরও কত কি সব নাম না জানা বড়ো বড়ো গাছ। আরও অনেক ট্যুরিস্টদের লঞ্চ যাচ্ছে আমাদের পাশাপাশি। হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানালাম অচেনা দেশের ট্যুরিস্টদের। ওরাও আনন্দের আতিশয্যে হাত নাড়ল।

লঞ্চ ভিড়ল ফিলি নামের ছোট্ট দ্বীপে। একে একে লাফিয়ে লাফিয়ে নামলাম। পাহাড় ঘেরা ছোট্ট দ্বীপ। ছুটে গেলাম সামনের দিকে। অতি পুরাতন বেশ কটি ছোটো বড়ো মন্দির। ছোটো ছোটো পুরোনো প্রাসাদ এদিক ওদিক দাঁড়িয়ে। অদ্ভুত ব্যাপার এই যে এই দ্বীপটিতে স্থানীয় কোন মানুষ থাকে না। রাতে তো কেউই থাকে না। যারা আসে সকলেই আবার দিনে দিনে ফিরে যায়। মিশরীয় কিছু হকার দেখলাম। তারা ফারওদের ছোটো বড়ো পুতুল তাই বিক্রি করছে। কেউ কেউ অন্যান্য ছোটো ছোটো বিভিন্ন পসরা নিয়ে বসে আছে। বেলা শেষে সন্ধ্যায় যখন ট্যুরিস্টরা ফিরে যাবে তখন ওরাও ফিরে যাবে ওদের ঘরে। কোন জন বসতি নেই এখানে।

ফিলি দ্বীপের একটি ছোট্ট ইতিহাস আছে। যে দ্বীপটিতে আমরা এসেছি এটি আসল ফিলি দ্বীপ নয়। দ্বিতীয় আসোয়ান বাঁধ তৈরির পর সমগ্র স্থাপত্য ও পুরাকীর্তি সমেত মূল ফিলি দ্বীপটি জলের নিচে চলে যায়। পরে মিশর সরকার ফিলি দ্বীপের মন্দির ও স্থাপত্য তুলে এনে এই জল বেষ্টিত উঁচু জনহীন দ্বীপটিতে সরিয়ে আনে অবিকৃত অবস্থায়। এই দ্বীপটিরও নামকরণ করে ফিলি দ্বীপ। ফিলি শব্দের অর্থ ভালোবাসা। তাই এ দ্বীপকে নাকি মিশরীয়রা প্রেমের দ্বীপ বলে আখ্যায়িত করে থাকে।

দ্বীপটিকে হাইরোগ্লাইফিকে বলা হয় আপো (Apo) আর গ্রীক ভাষায় বলা হয় এলিফ্যান্টাইন (Elephantine) । নতুন এই দ্বীপটির বর্তমান নাম অ্যাজিলিকা (Egilica or Agilika)

এই মন্দিরটি নির্মাণ শুরু হয় টলেমি রাজবংশের সময়ে। রাজা টলেমি-২ এটির কাজ শুরু করেন। পরে টলেমি-৪, টলেমি-৫, টলেমি-৬, টলেমি-৭ ও টলেমি-১১ এর সময়কাল পর্যন্ত এর নির্মাণ কাজ চলে।

পঁচিশতম রাজবংশের রাজা তাহারকার সময় দেবী আইসিসের অংশ নির্মিত হয়।

ট্রাজান, ওসিরিস, হোরাস ও হাথোরের মন্দির নির্মিত হয়েছে পাশাপাশি। টিবেরিয়াস ও ডায়োক্লেটিয়ানের ফটক এবং অগাস্টাসের মন্দির তৈরি হয়েছিল একই সময়ে।

মিশর রোমান সম্রাটদের অধীনে চলে গেলে সকল মন্দিরগুলি চুড়ান্ত অবহেলার শিকার হয়। খ্রিস্টান প্রভাবাধীন ৫২৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৫৬৫ খ্রিস্টাব্দ সময়ে রোমান সম্রাট জাস্টিনিয়ান মূল মন্দিরটিকে চার্চএ রূপান্তর ঘটান।

ইতিহাসবিদ ও গবেষকদের রিপোর্ট (যে সকল স্থাপত্য নির্মাণ করা হয়) ঃ-

In 25th Dynasty the Temple of Philae under the reign of King Taharqa was built :

❑ The first Chapel for the Gooddess Isis.
❑ The Kiosk of Trajan
❑ The Chapel of Osiris
❑ The Temple of Horus
❑ The Temple of Hathor
❑ The Gateway of Tiberius
❑ The Gateway of Diocletian and
❑ The Temple of Augustus

(The temples of the island were neglected and some of them were destroyed, during the Chirstians by the Roman Emperors. During the reign of the Emperor Justinian from 527AD to 565 AD the main Temple was converted to a church.)

এই ফিলি দ্বীপে আছে আইসিস দেবীর মন্দির। আগেই বলেছি আইসিস হচ্ছে প্রেমের দেবী। ওসিরিসের আপন ভাই শেট ক্ষমতা দখলের জন্য তাকে নৃশংসভাবে খুন করে। খুন করে তার দেহ টুকরো টুকরো করে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দেয় যেন আর খুঁজে না পাওয়া যায়। আইসিস সেই দেহের টুকরো খুঁজে খুঁজে বের করেন ও তা জোড়া লগিয়ে সেই দেহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। পরে ওসিরিসের ঔরসে আইসিসের গর্ভে তার সন্তান হোরাসের জন্ম। সেই আইসিসের মন্দির এখানে। মিশরের মানুষ এই ফিলি দ্বীপকে তাদের জীবনের এক আলাদা তীর্থক্ষেত্র মনে করেন। তাই তারাও ভাবেন জীবনে একবার প্রেমের দ্বীপ ফিলিতে পা রাখার। বহু মানুষ এখানে আসেন এই প্রেমের দেবীর আকর্ষণে।

Temple of Philae : Philae Island was rocky Island in the middle of the River Nile, South of Aswan. It was called in Hieroglyphic "Apo" which means Ivory. It was also known by the Greek "Elephantine" most probably because it was an important center of trade, especially for ivory.

The Ancient Egyptians built a beautiful and magnificent Temple on this island for the Goddess Isis, but it became submerged after the first Aswan Dam was built in 1906, and it was not until the seventies that many nations attempted to save the Temple. All these countries, together with UNESCO, selected a suitable place, but they had to wait until the completion of the High Dam, in 1971, which would stabilize the level of the water.

The new island was called Egilica (also called Agilika), and it was completely reshaped to imitate Philae Island as closely as possible.

Firstly, a cofferdam was build around the temple and the water was drained. Next, the temple was dismantled and transferred, stone by stone, from the submerged Philae island to the redesigned Egilica Island. Each and every stone had to be numbered and then replaced, in the same position, in the new location. It was a massive, and very complicated, project taking over 9 years to be accomplished. The Temple of Philae was reopened in 1980.

The Temple of Isis :

The temple of Isis is one of the greatest Temmples in Egypt and it occupies about a quarter of the island. It is also the temple's main island with its huge, complete, pylons and beautiful scenes.

The construction began during the reign of King Ptolemy II, and then other Ptolemaic Kings (Ptolemy's IV, V, VI, VIII, and XI) contributed by adding more parts to the main Temple.

The Temple is buit in the same style as the Temples of the New Kingdom, as well as some other elements, which appeared in the Greco-roman period, such as the Mamisi (the house of the divine of horus), and a Nilometer.

The Temple of Isis consists of the 1st Pylon, which is a great traditional pylon with two towers, and an open forecourt, which leads to the 2nd pylon.

On the left side of this court is the Mamisi, which has scenes depicting the birth of the God Horus by his mother Isis.

The 2nd Pylon leads to a Hypostyle Hall with 10 columns, and then 3 vestibules leading to a sanctuary.

The oldest remains of the Temple of Philae date back to the reign of King Taharqa (25th Dynasty), who built the first chapel for the Goddess Isis.

There are other monuments here, as well, including The Kiosk of Trajan, the Chapel of Osiris. The Temple of Horus. The Temple of Hathor, The Gateway of Tiberius, the Gateway of Diocletain, and the Temple of Augustus.

The temples of the island were neglected, and some of them even destroyed, after the persecution of the Christians by the Roman Emperors, During the reign of the Emperor Justinian (527 AD- 565 A.D), the main temple was converted to a church.

সব ঘুরে দেখার পর আমাদের এবার ফিলি থেকে ফেরার পালা। সকলে ফেরার পথে হকারদের কাছ থেকে টুকিটাকি কিছু কেনাকাটাও সেরে নিলেন এর ফাঁকে স্যুভেনির হিসাবে। আমি নিলাম তুতেনখামুনের একটি ছোট্ট মূর্তি। খুব পছন্দ হয়েছে আমার। দরদাম করে কিনতেই হয়, আমিও তাই করলাম। পঞ্চাশ ইজিপ্সিয়ান পাউন্ড চাইল আর দুই চার কথাতেই মাত্র দশ পাউন্ডে নেমে এল। এটি রেখে দেব শোকেসে। যখনই চোখে পড়বে এই তুতেনখামুনের মুর্তি তখনই ভেসে উঠবে এই ফিলি দ্বীপের স্মৃতি। আমার এ এক অভ্যাস যেখানেই বেড়াতে যাই সেখানকার একটা কিছু স্যুভেনির কিনবই আর বাড়িতে নিয়ে সাজিয়ে রাখবে দীপালী।

লঞ্চে উঠে একই পথে ফেরা। তারপর বাসে উঠলাম। সকলেই যে খুব ক্লান্ত তা বাসে ওঠার পর বোঝা গেল। ভোরে উঠে আসোয়ান বাঁধ তারপর একই দিনে ফিলি দ্বীপে ঘোরা তাও এই গরমে। সবাই বেশ ক্লান্ত। গরমও পড়েছে প্রচন্ড। এবার একটু বিশ্রাম চাই। আর যেন শরীর টানছে না।

বিকেলে বাস গিয়ে থামল নীলনদের ধারে। পাশে ফ্লোটেল জেসমিন ভাসমান প্রমোদতরী। সত্যি অপরূপ সেই জেসমিন। বাইরে থেকে দেখেই চোখ ধাঁধিয়ে যায়। পাঁচতলা ফ্লোটেল। খুব সুন্দর দেখতে। পাটাতন ফেলা আছে পাড় থেকে জেসমিনে। আমরা একে একে উঠলাম জেসমিনের নীচতলায়। ভিতরে বিশাল অভ্যর্থনা কক্ষ। আরামদায়ক বিশাল বিশাল সোফা। সাদা ধবধবে সোফা কভার। একটা অন্যরকম পরিবেশ ভিতরে। ফ্লোটেলের সকলে আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাল। জেসমিনের কর্মিরা তারা সাদা পোশাকে। আমাদের ঢোকা মাত্রই ওয়েলকাম ড্রিংকস দিয়ে আপ্যায়ন করল। ঠান্ডা ফলের রস। সারাদিনের কষ্ট আর খিদেয় ফলের রস খুব তৃপ্তির সাথে পান করলাম।

এর মধ্যেই ফ্লোটেলে আমাদের থাকার ঘর বন্টন করার পালা। প্রতি দুইজনের জন্য একটা রুম। যারা সস্ত্রীক বা বান্ধবী নিয়ে এসেছে তাদের জন্য এক রুম। টুইন শেয়ার। আমাদের পাশের কেবিনেই ডাঃ মলয় সাহা আর ডাঃ অমিয় হাটি এক রুমে।

ডাঃ অমিয় হাটিও একটি ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখবেন বলেছিলেন। তিনিও মাঝে মধ্যে লিখে রাখেন। আর আমি আমার ভিডিও ক্যামেরায় ভিডিও করে রাখছি সব। যেন ভ্রমণের উপর লিখতে গেলে এই ভিডিওটি কাজে লাগাতে পারি। দীপালীও মাঝে মাঝেই তার স্টিল ক্যামেরাতে ছবি তুলে রাখছে। আমার ভিডিও ক্যামেরাও দীপালী হাতে তুলে নিচ্ছে মাঝে মাঝে।

এর মধ্যে শুনি বাইরে হুলস্থূল বাঁধিয়েছে ডাঃ মলয় সাহা আর ডাঃ অমিয় হাটি। ডাঃ অমিয় হাটির ব্যাগ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সবাই আঁতিপাঁতি করে তার ব্যাগ খুঁজতে লাগলাম। খোঁজ খোঁজ চিৎকার চেঁচামেচি। বাসের মধ্যেই মনে হয় রয়ে গেছে। বাস তো চলে গেছে কোথায়। গাইডকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আরও দুতিনটে দল অন্য দেশের তারাও ঢুকেছে জেসমিনে। তাদের সঙ্গে মিশে গিয়ে তাদের কারও কেবিনে ঢুকল কিনা সেও এক চিন্তা। মহা দুশ্চিন্তায় ওরা। আমরাও। ডাঃ হাটির সব কিছুই নাকি ব্যাগের মধ্যে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে পাওয়া গেল। দেখা গেল রিসেপশানের এক কোণে পড়ে আছে অনাদরে। ব্যাগ পেয়ে শান্তি ডাঃ হাটির তার চেয়ে বেশি স্বস্তি ডাঃ মলয় সাহার।

ফ্লোটেলের লোকেরা রুমের চাবি দিয়ে দিল। রুম দেখিয়ে দিল। এর মধ্যে আমাদের লাগেজ এসে গেছে। নিয়ে ঢুকলাম ঘরে। দুপাশে দুটো বিছানা। কার্পেট বিছানো। অ্যাটাচড বাথ। ঘরে ঢুকেই একটু চোখে মুখে জল ছিটিয়ে বিছানায় ধপাস করে পড়লাম। এত ক্লান্ত তাই না শুয়ে পারলাম না।

বেশ কিছুক্ষণ নিদ্রালু অবস্থা। এর মধ্যে কেবিনের দরজায় টোকা।

-'কে?'

-'আমি মলয়দা। ওঠ। লাঞ্চে যেতে হবে।'

আমি ভুলেই গেছিলাম। রিসেপশান থেকে বলে দিয়েছিল দুপুরে লাঞ্চের কথা। 'তাড়াতাড়ি সেরে নেবেন, আবার একটু কোথাও ঘুরিয়ে আনব বিকেলে।' দীপালী উঠে ঘর খুলে দিল। মলয়দা আর ডাঃ হাটি ভিতরে ঢুকলেন। ঘরে এসে বসে একপ্রস্থ অভিজ্ঞতা বিনিময়। ওরাও খুশি আমরাও খুশি- এখনও পর্যন্ত যা ম্যানেজমেন্ট কোনও ত্রুটি ধরা পড়ে নি।

মিশরের এত গরম কিন্তু গরমে কাবু করতে পারেনি আমাদের। সব কিছু এসি। বাস, জেসমিনের সবগুলো তলা এসি। তাই গরমের আঁচ গায়ে লাগেনি। অথচ বাইরে চল্লিশ বিয়াল্লিশ ডিগ্রি তাপমাত্রা।

একটু পর ইনটারকম টেলিফোন বেজে উঠল। লাঞ্চে যেতে হব। মলয়দা আর অমিয় হাটির সঙ্গে গল্প করতে করতে একটু দেরি করে ফেললাম। এক পর্যায়ে অমিয় হাটি

বললেন, 'চল উঠি। ওদিকে দেরি হয়ে যাবে। সবাই হয়ত লাঞ্চে বসে গেছে। তিন তলায় ডাইনিং হল।'

ডাইনিং হলে ঢুকে দেখি সকলেই এসে গেছে আমরা চারজন বাদে।

ডাঃ সুনীল নাগ আর ডাঃ ভট্টাচার্য রে রে করে উঠল -'এত দেরি কেন তোমাদের?' -'তপন তো কখনও এত দেরি করিস না। কি ব্যাপার?'

-'আরে বলো না। মলয়দা আর ডাঃ অমিয় হাটির সাথে গল্প করতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল।'

পেছন থেকে ডাঃ চন্দন ঘোষাল আবার টিপ্পনি কাটতে লাগল। সবাই একপ্রস্থ হাসি। যেন এইটুকু দেরিতে আমরা মহাভারত অশুদ্ধ করে ফেলেছি। আসলে যে আমরা এক পরিবার হয়ে উঠেছি। তাই এত হাসি এক মশকরা এত টিপ্পনি।

খাবারের দিকে মনোনিবেশ করলাম। বুফে পদ্ধতির খাওয়া। লাঞ্চ আইটেম সব চারিদিকে টেবিলে সাজানো। সাদা ফেজ টুপি আর সাদা গাউনে সার্ভ করছে ওপাশ থেকে। স্যুপ থেকে ডেজার্ট। কি নেই। একটু বেশি বেশি করে স্যুপ খেয়ে নিলাম। এর পর এক প্লেটে ফ্রুটস নিয়ে নিলাম। ওটা শেষ করে রুটি, ফিস, একটু চিকেন, একটু ভেজিটেবল নিলাম আরও কি সব নাম না জানা খাবার। সব একটু একটু টেষ্ট করতে হয় - এটা দীপালীর পরামর্শ। তাই করলাম। প্লেটে সব সাজিয়ে নিয়ে পাশে একটা টেবিলে গিয়ে বসলাম। ওপাশে ডাঃ বৈদ্যনাথ মুখার্জী ও তাঁর স্ত্রী সুচেতা মুখার্জী। সকলেরই খাওয়া প্রায় শেষের দিকে। আমরা তাই একটু চালিয়ে খেলাম। তবে হ্যাঁ সবকিছুই একটু একটু টেষ্ট করলাম। শেষে মিষ্টি তো খাবোই। আমি আবার মিষ্টির খুব ভক্ত। খাবারের সাথে জল পাওয়া যায় না। ওটা কিনে খেতে হয়। এক অদ্ভুত রীতি এদের। কিনলাম এক লিটারের একটা জলের বোতল চার ইজিপ্সিয়ান পাউন্ড দিয়ে। দুজনে ভাগ করে খেলাম- আমি আর দীপালী।

গাইড খেতেই খেতেই জনে জনে বলে গেল, 'দেরি করা যাবে না। খাওয়ার পরপরই বের হতে হবে- লঞ্চে ঘোরা নীলনদে।' আমাদের খাওয়া শেষ। দেখছি ডাঃ চন্দন ঘোষাল তখনও প্লেটে খাবার নিয়ে চলেছে।

বললাম, 'কি গো দাদা, তখন তো কত কথা শোনালে? আর এখন নিজের বেলা? এখনও খাচ্ছ? খেয়েই চলেছ দেখছি?'

মুচকি হাসি দিয়ে আবার মগ্ন খাওয়াতেই। আর একটা ফিস ফ্রাই মুখে তুলে নিতে ব্যস্ত।

অমিতাভ- তারও একই অবস্থা। বাঙালি ভোজন রসিক। বললাম, 'কি ভায়া, একটু দেরি করেছি তখন কত কথা না শোনালে? এখনও তো শেষ করতে পারনি।'

সেই একই পদ্ধতি। একটু হেসে আবার ব্যস্ত। খাদ্যবস্তু অন্বষণে ব্যস্ত। শেষের টেবিলে ডেজার্ট- ভাল মিষ্টি আর কেকের টুকরোটা তুলে নিতে অমিতাভের হাসি, 'আরে খুব খিদে পেয়েছে। তাই পেটপুরে খেয়ে নিচ্ছি। নজর দিও না।'

সকলের চোখে মুখে একটা পরিতৃপ্তির চিহ্ন। বুঝলাম সকলের দুপুরের খাওয়া ভালোই হয়েছে। একটুখানি বিশ্রাম নিতে পারলে ভালো হত।

গাইডকে বললাম, 'কিছু রেষ্ট নিয়ে বেরোবো না এখনই বেরোতে হবে?'

ও বলল, 'এখনই।'

দীপালীকে বললাম, 'আমি রুম লক করে আসিনি। জিনিসপত্র রয়েছে ঘরে।'

দীপালী একটু রেগেই বলল, 'তোমার এই এক ভুলো মন। চাবি রাখবে নিজের কাছে, অথচ ঘর লক করবে না। যাও এবার দৌড়ে যাও, ঘর খোলা রেখে যাওয়া যায় না।'

গাইডকে বললাম, 'একটু অপেক্ষা কর। ঘর বন্ধ করে আসি।'

ও বলল, 'কিছু হবে না। এখানে তো সব ঘরেরই ডুপ্লিকেট চাবি এদের কাছেই থাকে। কিচ্ছু ভয় নেই। হারাবে না কিছু।'

কে শোনে কার কথা। আমি ছুটে গিয়ে লক করে এলাম। ঝুঁকি নিতে রাজি নই।

জেসমিন থেকে বের হলাম। লঞ্চের উদ্দেশ্যে এগোচ্ছি সকলে। নীলনদের উপর দিয়ে ঘোরাবে এখন। জেসমিন নোঙর করাই থাকল।

সকলে উঠলাম লঞ্চে। আমাদের আঠারো জন বসতে পারে এমন ছোটো লঞ্চ। নীলনদের জল কেটে কেটে আমাদের লঞ্চ এগিয়ে চলেছে। অনেক ছোটো লঞ্চ আমাদের চার পাশে। দেশ বিদেশের পর্যটকরা। একটা লঞ্চে তরুণ তরুণীরা গাইছে আর গানের তালে নাচছে। তা দেখে আমরাও তাল মেলালাম কিছুটা। আমাদের লঞ্চের চালককে বললাম ওটার পাশে নিয়ে যেতে। আমাদের গাইড বলল, 'সম্ভবতঃ ওরা ইউরোপের কোন দেশের হবে।' পোশাক আর গায়ের রঙ দেখে ও আন্দাজ করল।

ওদের সাথে পাল্লা দিয়ে ডাঃ চন্দন ঘোষাল ধরল রবীন্দ্র সঙ্গীত-

তোরা যে যা বলিস ভাই
আমার সোনার হরিণ চাই।
মনোহরণ চপল চরণ
সোনার হরিণ চাই
সে যে চমকে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায়
যায় না তারে বাঁধা
সে যে নাগাল পেলে
পালায় ফেলে

লাগায় চোখে ধাঁ ধাঁ
আমি ছুটব পিছে মিছে মিছে
পাই বা নাহি পাই....

আমরাও সঙ্গে সঙ্গে গলা মেলালাম।

দেখি আসে পাশে থেকে বেশ কিছু উৎসাহী পর্যটক তাদের লঞ্চ নিয়ে আমাদের কাছে চলে এসেছে। ভাবলাম, ওরা কি জানে আমরা আমাদের নোবেলজয়ী রবীন্দ্রনাথের একটি সেরা গান ওদের উদ্দেশ্যেই গাইছি-আমার সোনার হরিণ চাই...

লঞ্চ এত কাছে চলে এসেছিল যে হাত ছোঁয়াছুঁয়ি করল কিছু তরুণ তরুণী।

গাইড আমাদের গান থামিয়ে দেখাল দূরে একটা বিশাল মসজিদ। বিরাট তার মিনার। আকাশচুম্বি মিনার আশেপাশের সব অট্টালিকা ছাড়িয়ে। বলল ওখানে বিশ্বের অন্যতম ধনকুবের আগা খানের সমাধি। গাইড শোনাল আগা খানের সঙ্গে সুন্দরী হাবিবার প্রেমকাহিনি। ধনকুবের আগা খানের সম্পত্তি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ১৯৫৭ সালে আগা খান এখানেই মৃত্যুবরণ করেন। তার উত্তরাধিকারিরা আগা খানের স্মৃতিসৌধ গড়ে তোলে এখানে। অপূর্ব সুন্দর এই সমাধি।

গাইডকে বললাম, 'কাছে গিয়ে দেখা যাবে না? নিয়ে চল না ওর কাছে।'

গাইড বিনয়ের সাথে শোনাল, 'ওটা অনেক দূরে। যেতে গেলে ঘন্টা দু'য়েক লাগবে। দেখতে এক ঘন্টা। ফিরতে আবার দুঘন্টা। এত সময় কোথায়?'

আমরা দূর থেকে দেখে নয়ন সার্থক করায় মগ্ন হলাম। কি আর করা যাবে।

আরও এগিয়ে চলল আমাদের লঞ্চ। আসে পাশে বড়ো বড়ো জাহাজ। সবই প্রমোদতরী। নানা রঙের নানা চেহারায়। যেন ছবির মত। কিছু কিছু নাম না জানা বড়ো বড়ো পাখিও উড়তে দেখলাম এই জায়গাটায়। রঙিন রঙিন পাখি। গাইড কে জিজ্ঞাসা করাতেও সে কি একটা নাম বলল।

সামনের দিকে চলেছি। চারদিকে অনেক গাছপালা ঝোপ ঝাড়। ছোটো ছোটো টিলার মত। লঞ্চ থেকে আমাদের কোথাও নামিয়ে কিছু দেখাবে ভেবেছিলাম। গাইড বলল, নীলনদের এই যে জায়গাটা ঘোরালাম— এটা নীলনদের ঘুরে দেখার মতই জায়গা ও পরিবেশ। এত সুন্দর দৃশ্য মেলা ভার। সত্যি চোখ ভরে যায়। টল টল জল। উপরে উড়ছে সারি সারি পাখি। চারিদিকে নানা রঙের নানা আকারের লঞ্চ। ওদিকের লঞ্চে উচ্ছল তরুণ তরুণী। দূরে ঘন বন জঙ্গল টিলা। সূর্য এখন অস্তাচলে ঢলে পড়েছে।

এর পর লঞ্চে করে ফিরে আসার পালা। ৬টার দিকে ফিরে এলাম জেসমিনে। কেবিনে ঢুকে হাত মুখ ধুয়ে বিছানায় এলিয়ে পড়লাম। একটু পর ডিনারে যেতে হবে। দীপালীও গড়িয়ে পড়ল বিছানায়। বুঝলাম সেও ক্লান্ত বেশ।

ফ্লোটেল জেসমিনে শুয়ে আজকের এই লঞ্চে নীলনদ ভ্রমণের রেশ উপভোগ করছিলাম। যেন ভাসছি জলের ঢেউয়ে নীলনদের সাথে।

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুম ভাঙল ইন্টারকম টেলিফোনের ডাকে। রিসেপশন থেকে ডাক এসেছে ডিনারে যেতে হবে। সকলে এখনই রিসেপশনে রিপোর্ট করতে হবে। দীপালী এমন ঘুমিয়ে পড়েছে যে রীতিমত ধাক্কা দিয়ে জাগাতে হল। রেডি হয়ে দুজনে রিসেপশনে হাজির। তখনও সেখানে অনেকেই আসেনি।

আসতে দেরি দেখে আমরা দুজন আর ভারতী আমরা তিনজন উপর তলায় জেসমিনেই একটা শপিং মল আছে সেখানে গেলাম। অনেক রকম জিনিস সাজিয়ে আছে। পোশাক, বিভিন্ন রকমারি হস্তশিল্প, ঘর সাজানোর জিনিস। পাশে একটা গয়নার দোকান। গয়নার দোকানের দিকে এগিয়ে যেতেই সেলসগার্ল হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা জানাল। সেলসগার্ল বলল, খাঁটি সোনার গয়না। অন্যান্য গয়নাও আছে। দীপালী আর ভারতী বেশ মন দিয়েই গয়না দেখছিল। যেমন মেয়েরা দেখে। কিনুক না বা কিনুক দেখতে এরা পটু। দোকানি ভাববে ভালো ক্রেতা জুটেছে হয়ত।

একটু পর এসে যোগ দিলেন মিসেস রবিন্দর কাউর। তিন জনে মিলে গয়না দেখছে। দোকানিও বেশ খুশি। মিসেস রবিন্দর কাউর কিনলেন দুটো সোনার বালা আর হার। দীপালী আর ভারতীও কিছু কেনার জন্য দরদাম করছিল। বাদ সাধলেন ডাঃ চন্দন ঘোষাল।

এসেই তাড়া দিলেন, 'তাড়াতাড়ি চল। ডিনারে যেতে হবে।' সকলে তাড়াহুড়ো করেই ডিনারে এলাম।

ডিনার শেষে গাইড আমাদের এক জায়গায় জড় করে বলল, 'আগামী কাল আমরা আবু সিম্বেল টেম্পল দেখতে যাব। মিশরের অন্যতম সেরা দর্শনীয় স্থান। ভোর তিনটেয় রেডি হতে হবে। একসাথে যত গাড়ি আবু সিম্বেল টেম্পলে যাবে তারা একটি কনভয় করে যাবে। কনভয়ের সামনে ও পিছনে আমাদের পাহারায় থাকবে মিশর পুলিশের সশস্ত্র গাড়ি। এখানে রাতের বেলায় রওনা হতে হয় যেন ভোর হতে হতে পৌঁছোনো যায়। দুর্ধর্ষ আতঙ্কবাদী ও দুর্বৃত্বদের আক্রমণের আশংকা থাকে। সে জন্য এক সাথে এভাবে সশস্ত্র প্রহরায় যেতে হবে। সুদান থেকে আসে ওরা। ফাঁকা পেলে পুরো গাড়ি লোপাট করে দেবে। বাড়ি ফিরতে হবে না কাউকে। ফেরার সময়ও একই পদ্ধতি। বেলা থাকতে থাকতে এক কনভয়ে আসতে হবে। দেরি করলে কনভয় ধরতে না পারলে আজ ফেরা হবে না। সুতরাং সকলে যেন সময় মেনে চলি।'

যার যার কেবিনে গিয়ে শুয়ে পড়ার আয়োজন করছি। ভোরের প্রস্তুতির কথা মাথায় রেখে। অনেকে আবার ভয় পাচ্ছিল এত সব সতর্কতার কথা শুনে। আমাদের দুজনের ভয় একটু কমই। এত সহজে ভয় পাওয়ার মানুষ আমরা নই। জীবনে অনেক ঝড় ঝাপটা

গিয়েছে। এমন অনেক বড় বড় বিপদ এসেছে আমাদের আর আমরা সে সব বিপদ মোকাবিলা করেছি বুদ্ধি আর সাহসের সাথে। তাই বিপদ শুনলে আর ভয় পাই না। বরং প্রস্তুতি নিই যে কি করতে হবে বিপদ আসলে।

এসব কথায় ভয় তো পাইই না বরং মজাই পাই, ভয় আর শংকাটাকেই উপভোগ করি। একটু থ্রিল আর একটু আতঙ্ক না থাকলে কিসের মজা। ম্যাড়ম্যাড়ে লাগে।

দীপালী বলেই উঠল, 'কাল তাহলে খুব মজার কিছু দেখতে যাচ্ছি, কি বল? পথে আতঙ্কবাদীর ভয় তারপর বিখ্যাত আবু সিম্বেল টেম্পল দর্শন।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, সে ঠিক। শুয়ে পড় এখন। কাল রাত তিনটেয় উঠতে হবে।'

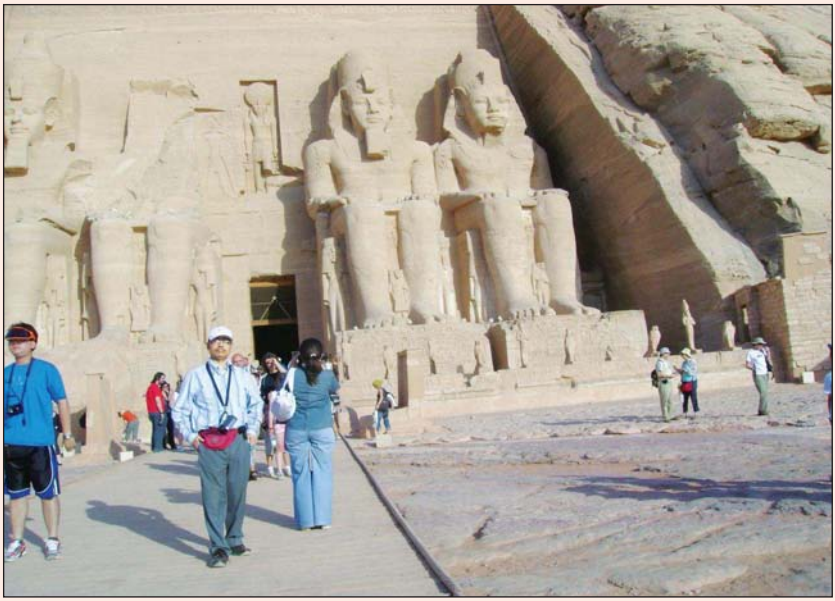

আবূ সিম্বেল টেম্পলের সামনে লেখক

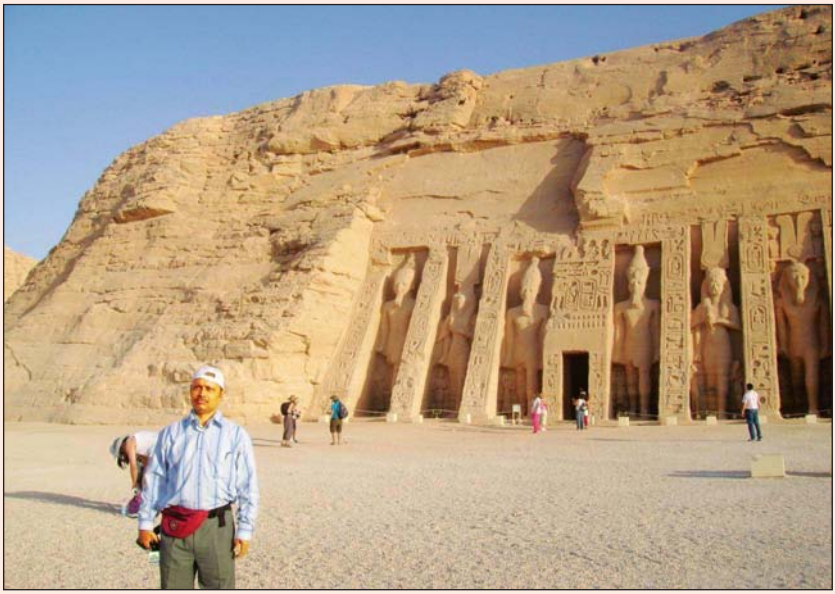

নেফারতারি টেম্পলের সামনে লেখক

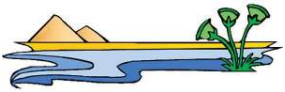

আবু সিম্বেল টেম্পল
Abu Simbel Temple

রাতে ঘুম ভাঙল রিসেপশানিস্টের ফোন কলে আর মলয়দার দরজা ধাক্কায়। উঠে যথারীতি প্রস্তুতি আবু সিম্বেল দেখতে যাওয়ার। জেসমিন থেকে বেরিয়ে দেখি বাস দাঁড়িয়ে আছে। রাত তিনটেয় একটু ঠান্ডা ঠান্ডা। দিনের যে গরম এখন রাতে তার উল্টো। সকলের আসতে আসতে বেশ সময় লেগে গেল। আজ সুনীলদা আর বৌদিই বেশি দেরি করল । কিছুক্ষনের মধ্যেই আমাদের বাস ছাড়ল।

গাইড বলল যে আমরা নাকি দেরি করেই ফেলেছি। সবার গাড়ি আমাদের আগেই ছেড়ে দিয়েছে। ছুটল আমাদের গাড়ি কনভয় ধরার জন্য রাত তিনটেয় সকলের উত্তেজনা আর আশঙ্কা নিয়ে। মরুভুমির মাঝ দিয়ে। বাসের হেডলাইটে যা দেখা যায়। দূরে অন্ধকার—কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তবে মসৃণ রাস্তা চলেছে মরুভূমির বুক চিরে। টানা সোজা রাস্তা। আঁকা বাঁকা খুব একটা নেই। তিন ঘন্টা চলবে। ভোর বেলা পৌঁছোবে। একটুও ঝিমুনি নেই তাই বলে। রাতে কারোই বিশেষ ঘুম হয়নি। তিনটেয় রওনা হতে গেলে রাত দুটোয় উঠতেই হয়েছে। গাইড সেই যে ভয় দেখিয়ে রেখেছে রাতে কনভয়ে হামলা হতে পারে। সবাই যেন জেগে জেগে পাহারা দিচ্ছি নিজেদের। নিজেরা একটু আধটু ফিসফাস শব্দে কথা বলা মাঝে মাঝে।

আমাদের ড্রাইভার গভীর মনোযোগে গাড়ি চালিয়ে চলেছে একটানা। ওদিকে আমাদের গাইড দেখলাম ঘন ঘন সে ঘড়ি দেখছে। ওরও চোখে মুখে যে একটু উৎকণ্ঠা নেই তা নয়।

সে তো প্রায়ই যাচ্ছে কোন না কোন দল নিয়ে। এক'টা দিন আমাদের সাথে থেকে বেশ আন্তরিকতা হয়ে গিয়েছে। আবার হয়ত একটা নতুন দল আসবে আবার তাদের নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখাবে, আবার তাদের সাথে ভাব তৈরি হবে আমাদের মতো।

ওরই বা জীবনটা কেমন ! ওর চাকরির ধরণটাই এই। এভাবে নতুন নতুন মানুষের সাথে ওর পরিচয় হয়। কেউ কেউ ভুলেও যাবে ওকে। নতুন কোন দেশের- এশিয়া আফ্রিকা ইউরোপ আমেরিকা বা অন্য কোন মহাদেশ থেকে আগত পর্যটকদের গাইড। ওরও সংসার আছে। আর এদিকে আমাদের আনন্দ দেওয়ার জন্য দিনরাত কি পরিশ্রম করে চলেছে। কোন ত্রুটি রাখা চলবে না। তা হলে হয়ত মালিকের কাছে বকুনি খাবে বা শাস্তি হতে পারে।

তবে এই কথাটি সকলের স্বীকার করতেই হবে যে মিশরের এই ট্যুর গাইড সত্যিই সেরা—অমায়িক ব্যবহার। মুখে হাসি লেগেই আছে। বিরক্তির লেশমাত্র নেই। অনেক জায়গায় ঘুরেছি তবে এমন ভালো গাইড আমি পাইনি। ইংরেজিতে বলে যাচ্ছে অনর্গল। কখনও রসিকতা করছে, কখনও গম্ভীর ভাবে বর্ণনা করছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পড়াশোনাও বেশ করে বোঝা যায়। যেন মিশরের ইতিহাস মুখস্থ। আর আমরা যাই জিজ্ঞাসা করছি হাসি মুখে উত্তর দিচ্ছে।

যেটা জানেনা বিনয়ের সঙ্গে বলছে, 'আমি দুঃখিত। আমি এটা জানিনা। তবে জেনে আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব অবশ্যই।'

ওর কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে ভোর হয়ে গেছে। পূবের আকাশ ফর্সা হয়ে এসেছে। মরুভূমির প্রান্তর দিগন্তে মিশেছে দেখা যাচ্ছে। শুধু বালি আর বালি। সাহারা মরুভূমির দক্ষিণে নুবিয়ান মরুভূমি। নুবিয়ান মরুভূমির মাঝ দিয়ে চলেছি আবু সিম্বেল টেম্পলের দিকে। যে দিকে চোখ যায় এমন সুন্দর দৃশ্য। শুকনো মরুভূমিতে সূর্যোদয়ের সময় যে এমন মোহময়ী রূপ দেখা যেতে পারে ভাবিনি কোনও কালেও। পূর্ব দিগন্তে সূর্যোদয়ের রঙের খেলা, পশ্চিম দিগন্তে আঁধারির এক অদ্ভুত চাতুর্য যেন। ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলাচ্ছে প্রকৃতির।

ওই তো সূর্য দেখা দিয়েছে। সকলেই একযোগে কি উল্লাস। একি দৃশ্য! যেন মরুভূমির মাটি ফুঁড়ে একটা গোল লাল হলুদ সূর্য বেরিয়ে আসছে। আমরা সমুদ্রে সূর্যোদয় দেখেছি। তার কত রূপ কবিরা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মরুভূমিতে সূর্যোদয় কবির বর্ণনায় পড়িনি কোনদিন। এ কি দেখলাম। মনে হল যেন আমার মানব জনম সার্থক হল। সূর্যের সাগর সংগম দৃশ্যের বর্ণনা শুনেছি। আজ দেখলাম মরুভূমিতে বালির সমুদ্র চিরে সূর্যের উদয়—

দিগন্তে রঙের খেলা। প্রথমে গভীর লাল রঙে সারা পূব আকাশ। তারপর আস্তে আস্তে হলুদ।

মরুভূমি আর সূর্যের এ মিলন দৃশ্য অভাবনীয়। যে দেখেনি তাকে ভাষায় বোঝানো যাবে না এ অবর্ণনীয় অবিস্মরণীয় দৃশ্য।

এর মধ্যে দেখি বাসেই ব্রেকফাস্টের তোড়জোড়। গাইড ও তার সহযোগী সকলের হাতে হাতে একটা করে ব্রেকফাস্টের প্যাকেট আর একটা জলের বোতল পৌঁছে দিচ্ছে। তার সাথে সতর্কবাণী, 'বাসের মধ্যেই ব্রেক ফাস্ট সেরে নেবেন। কেউই খাবার বাইরে নিয়ে যাবেন না। আর বাইরে খাবার প্যাকেট কোথাও ফেললে বেশ বড় রকমের জরিমানা করবে পুলিশ। পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্যই এ সতর্কতা।' সত্যিই নেমে দেখেছিলাম এত বিশাল এলাকা কিন্তু কি পরিচ্ছন্ন। একটি কাগজ বা কোন নোংরা নেই কোথাও।

এসে গেলাম নুবিয়ান মরুভূমির সুদান সীমান্তে- আবু সিম্বেল টেম্পল ওই দেখা যায়। দুটি বিশাল পাহাড়ের মতো উঁচু - পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। সবচেয়ে বড়ো টেম্পলটি ফারাও রামেসেস-২ এর আর অপেক্ষাকৃত ছোটোটি নেফারতিরির।

ফারাওদের নতুন যুগের সূচনা হয় ঊনবিংশতম রাজবংশের পত্তন থেকে। রামেসেস-২ মোট ছয়টি টেম্পল নির্মাণ করেন। রামেসেস টেম্পল তার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। রামেসেসের এতগুলি টেম্পল নির্মাণের উদ্দেশ্য ছিল মিশরের দক্ষিণ অঞ্চলে তার আধিপত্য ও ধর্ম প্রতিষ্ঠা। এছাড়াও নিজের দেবত্বকে স্থায়িত্ব দেওয়াও ছিল একটা উদ্দেশ্য।

১২৬৪ খ্রিস্টপূর্বে রামেসেস-২ (Ramesses-2) টেম্পল তৈরির কাজ শুরু করেন এবং প্রায় কুড়ি বছর লাগে এটি সমাপ্ত হতে। ১২৪৫ খ্রিস্টপূর্বে এটি সম্পূর্ণ হয়। রামেসেস-২ টেম্পলটি ৩৩ মিটার উঁচু, ৫৬ মিটার দীর্ঘ এবং ৩৮ মিটার চওড়া।

ফারাও সম্রাট রামেসেস-২ এই টেম্পল উৎসর্গ করেন তিন দেবতার উদ্দেশ্যে ঃ-

❑ দেবতা আমন-রা (Amun Ra)

❑ রা-হোরাকটি (Ra-Horakhty)

❑ টা (Ptah)

পাহাড় কেটেই পাহাড়ের গায়ে তৈরি হয় বিশাল চারটি মূর্তি। বিশাল বিশাল সিংহাসনে বসে আছেন। মাথায় দ্বিমাত্রিক মুকুট। প্রতিটি মূর্তি ২০ মিটার উঁটু এবং সবগুলি মিলিয়ে মোট ৩৫ মিটার চওড়া। একবার ভূমিকম্পের কারণে সবচেয়ে বাম দিকের মূর্তিটির উপরের অংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পায়ের অংশটি অক্ষত আছে। বাকি তিনটি মূর্তি ভালো অবস্থায় আছে। রামেসেসের মুর্তির পায়ের কাছে আছে তার পরিবারের প্রিয় সদস্যদের কিছু মূর্তি যেগুলি সবই তার হাঁটু পর্যন্ত উচ্চতার। এখানে অন্য সকলের মূর্তি হাঁটুর নিচ পর্যন্ত উচ্চতায় তৈরি করা হয়, এর দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা যে মাত্র তিনিই এক এবং অদ্বিতীয়। তিনিই দেবতা - তিনিই সম্রাট। আর কেউই তার সমকক্ষ নয়। রামেসেস-২ এই একই রকম চিন্তা থেকে এই মন্দিরেও তাই করেন।

যে সকল মুর্তি তৈরি হয় সেগুলো হল - রামেসেসের বহুপত্নীর মধ্যে

❑ প্রিয়তমা নেফারতারি (Nefertari-Ramesses's chief wife)

❑ রানিমাতা মুট-টুই (Queen Mother Mut-Tuy)

তার দুই বড় ছেলে ঃ

❑ আমনর- হার- খেপেশেফ (Amun-her-khepshef)

❑ রামেসেস ((Ramesses)

এবং তার প্রথম ছয় কন্যার মূর্তিও আছে ((His first six daughters) :-

❑ বিনটানাট (Bintanath)

❑ বাকেমুট (Baketmut)

❑ নেফিরটেরি (Nefertari)

❑ মেরিটামিন (Meritamen)

❑ নেবেত্তাই (Nebettawy) and

❑ ইসেটনোফ্রেত (Isetnofret)

রামেসেস-২ এর আটজন স্ত্রী ছিল। তার ৪৮ টি পুত্রসন্তান ও ৫৩টি কন্যা সন্তান ছিল। তার স্ত্রীরা হলেন (Wives of Remeses-2 were) :-

❑ নেফারতিরি (Nefertari)

❑ ইসিটনেফেরেট (Isitenefert)

❑ হেনুটমিরে (Henutmire)

❑ মেরিটামেন (Meritamen)

❑ বেনটামেট (Bentamat)

❑ নেবেট টাউই (Nebet-taui)

❑ মাথোরফেরুরে (Mathoreferure)

❑ হাইতিতি রাজকুমারী (Another Hitite princess-name unknown)

আবু সিম্বেল টেম্পলে তার প্রথমা স্ত্রী নেফারতিরির মূর্তি স্থাপন করেছিলেন রামেসেস-২।

রামেসেস-২ এবং রাজা হাট্টুসিলি-৩ এর কন্যার সাথে বিয়ের মূর্তি তার পাশে দেখানো হয়েছে। মিশরের আর কোন ফারাও এভাবে নিজের ও তার পরিবারের সকলের মূর্তি তৈরি করেননি। জানা যায় যে রামেসেস- ২ ছিলেন সকল ফারাওদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ও প্রভাবশালী। তিনি নিজেই নিজেকে দেবতা বলে ঘোষণা করেছিলেন। মিশরের সবচেয়ে বেশি এলাকা তার দখলে ছিল। তিনি খুফু ও খাফরের পিরামিডের গায়ে লাগানো লাইমস্টোনের পাথর খুলে নিয়ে ভ্যালি অফ দি কিংসে সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে লাগান। এজন্য দুটি পিরামিডের অনেক সৌন্দর্যহানি হয় ও ক্ষতিও হয়।

এই টেম্পলটির ভিতরে মিশরের অন্য প্রাচীন ঘরগুলির মতোই ত্রিকোণাকৃতি। সামনের দিকটা চওড়া আর পিছনের দিক ক্রমশ সরু। এই ভিতরের ঘরটি ১৮মিটার লম্বা ও ১৬ মিটার চওড়া। এই ঘরে আছে ৮টি বিশালাকৃতির স্তম্ভ যার নাম ওসিরিস স্তম্ভ। এই ওসিরিস স্তম্ভের দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে রামেসেস-২ দেবতা ওসিরিসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন।

রামেসেস টেম্পলএর ভিতরের বাম দিকের দেয়াল বিশালাকৃতির মুর্তির যে সাদা মুকুট তা দ্বারা মিশরের উর্দ্ধ অংশ (আপার ইজিপ্ট) বোঝায়। বিপরীত দিকের দেয়ালে দুটি মুকুট পরিহিত মুর্তির দ্বারা মিশরের নিচের অংশ (লোয়ার ইজিপ্ট) বোঝায়। অনেকগুলো খোদাই করা চিত্রে অরনেটেশ নদীর তীরে কাডেশ যুদ্ধের বর্ণনা দেয়। হিট্রিটেস এর বিরুদ্ধে মিশরের রাজবংশ যুদ্ধ করে ও জয়লাভ করে। বর্তমানে লিবিয়া ও নুবিয়াকেই কাডেশ যুদ্ধের ক্ষেত্র বোঝায়। ওই যুদ্ধে রামেসেস-২ এর হাতে বহু শত্রু সৈন্য বন্দি হয়।

রামেসেস টেম্পলের বড় ঘরটি থেকে দ্বিতীয় ঘরটিতে ঢুকলে দেখা যাবে চারটি বড় স্তম্ভ। দ্বিতীয় ঘরটিতে সুন্দর সুন্দর চিত্র অঙ্কিত আছে দেয়ালে।

এই ঘরের মাঝ দিয়েই নৌকা করে স্বর্গে পৌঁছে যাবেন রামেসেস-২। এই বড় ঘরে কালো দেয়ালটিতে পাথর খোদাই করে চারটি বিশাল মুর্তি আছে সিংহাসনে বসা অবস্থায়। এরা হলেন ঃ

❑ দেবতা আমন-রা (Amun-Ra)

❑ রা-হোরাখটি (Ra-Horakhty)

❑ টা (Ptah)

❑ রামেসেস-২ নিজে (Rameses-3 himselft)

এই সময় রা-হোরাখটি, আমনর-রা ও টাএর মূল ধর্মানুষ্ঠানের কেন্দ্র ছিল যথাক্রমে মিশরের তিনটি স্থানে ঃ-

❑ হেলিওপোলিস (Heliopolis)

❑ থিবিস (Thebes)

❑ মেমফিস (Memfis)

এই টেম্পল নির্মানের সময় জ্যামিতি ও জ্যোতির্বিদ্যার দিকেও বিশেষ খেয়াল রাখা হয়। তৎকালিন মিশরীয় স্থপতিরা এমনভাবে মন্দির নির্মাণ করেছিলেন যে বছরের দুটো দিন ২২শে অক্টোবর ও ২২শে ফেব্রুয়ারী সূর্যরশ্মি মন্দিরের প্রবেশপথ দিয়ে মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করে। এই সূর্য রশ্মি শুধু মাত্র রা-হোরাখটি, আমনর-রা ও রামেসেস এর মূর্তির গায়ে পড়ে। কিন্তু টা-এর মূর্তির উপর সূর্য রশ্মি পড়ে না। সকলের বিশ্বাস যে টা হচ্ছে অন্ধকারের দেবতা তাই তার গায়ে সূর্যের আলো পড়তে পারে না।

দেশ বিদেশ থেকে হাজার হাজার পর্যটকের ভিড় হয় প্রতিবছর ২২শে অক্টোবর ও ২২শে ফেব্রুয়ারী এই সূর্যরশ্মির এই আশ্চর্য দৃশ্য দেখার জন্য।

রামেসেস-২ এর মন্দিরের পাশেই আছে অপেক্ষাকৃত একটি ছোট মন্দির। এই মন্দিরটি হাথোর ও নেফারতারির (Nefertari) মন্দির নামেই পরিচিত। ফারাও রামেসেস-২ এর মন্দিরের ১০০ মিটার উত্তর-পূর্বে এটির অবস্থান। রামেসেস-২ এর প্রিয়তমা পত্নী ছিলেন নেফারতারি (Nefertari)। রাজবংশের ইতিহাসে এই দ্বিতীয় কোনও ফারাও তার স্ত্রীর উদ্দেশ্যে মন্দির উৎসর্গ করেন। এর আগে আখেনাটেন তার রানি নেফারতিতির উদ্দেশ্যে মন্দির উৎসর্গ করেছিলেন। এই ছোটো মন্দিরের মূল ফটকের দুই পাশে পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা ১০ মিটার উঁচু ২ জোড়া রাজা ও রানির মূর্তি। তাদেরও মাথায় সাদা মুকুট (দক্ষিণে) উর্দ্ধ মিশরের (আপার ইজিপ্ট) প্রতীক এবং দ্বি-মুকুট (উত্তরে) নিম্ন মিশরের (লোয়ার ইজিপ্ট) প্রতীক।

ফারাও-এর পাশেই রানির মূর্তি থাকে। কিন্তু কখনোই মিশরের কোন মন্দিরে রাজা ও রানির মূর্তি সমান উচ্চতার হয় না। রানির মূর্তি রাজার মূর্তির হাঁটু পর্যন্ত থাকে। কিন্তু এই

মন্দিরে সকলেরই উচ্চতা সমান। ফারাও রামেসেস-২ তার শাসনামলের ২৪ বর্ষপূর্তিতে তার স্ত্রী নেফারতারিকে সঙ্গে নিয়ে আবু সিম্বেল যান। রামেসেস-২ এই নেফারতারি মন্দির এমন ভাবে নির্মাণ করেন যেন সকলেই এমন কি রাজপুত্র ও রাজকন্যাদের আকৃতি ও উচ্চতা একই থাকে।

বড়ো মন্দিরটির মত ছোটো মন্দিরটির মূল ফটকের দক্ষিণ দিকে একই ভাবে বাম থেকে ডাইনে রাজপুত্র মেরিয়াটাম ও মেরিরি এবং রাজকন্যা মেরিটামেন এবং হেনুত্তায়ে তার পর রাজপুত্র রাহিরেনমেফ এবং আমনরা-হার-খেপেশেপেসেফ-এর মূর্তি পরপর সাজানো আছে। ঠিক উত্তর দিকে এই রাজপুত্র ও রাজকন্যাদের মূর্তি যে ভাবে আছে তার বিপরীত ভাবে আছে। রামেসেস-২ মন্দিরের অনুরূপ চেহারার ছোট সংস্করণ এই ছোট মন্দির।

এই নেফারতারি মন্দিরের ভিতরের ঘরে ছয়টি স্তম্ভ আছে। তবে সেগুলি রামেসেস-২ এর মতো ওসিরিস স্তম্ভ নয়, যে সকল দেবতাদের উদ্দেশ্যে এই ছয়টি স্তম্ভ নির্মিত হয়েছিল সেই সকল দেবতারা হচ্ছেন (The six Pillers of the Nefartiri Temple Were dedicated to) :-

- ❑ হাথোর (Goddess Hathor)
- ❑ হোরাস (God Horus)
- ❑ খনুম (God Khnum)
- ❑ খনসু (God Khonsu)
- ❑ টথ (God Thoth)
- ❑ আইসিস (Goddess Isis)
- ❑ মাট (Goddess Maat)
- ❑ মুট আসির (Goddess Mut of Asher)
- ❑ সাটিস (Goddess Satis)
- ❑ টায়েরিট (Goddess Taweret)

এই ছয়টি স্তম্ভে রানি নেফারতারি এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছেন এমনভাবে চিত্রিত আছে। এই বাদ্যযন্ত্রের নাম সিসট্রাম যা দেবতাদের উদ্দেশ্যে বাজানো হয়।

এই স্তম্ভের মুল জায়গায় দেবী হাথোরের মুখ বসানো। এই ধরনের স্তম্ভকে সেজন্য বলা হয় হাথোরিক স্তম্ভ। এই স্তম্ভে বিভিন্ন রকম চিত্র খোদাই করা আছে। একটি স্তম্ভে রামেসেস-২ শত্রু নিধন করছেন। অন্য একটি স্তম্ভের চিত্রে দেখা যাচ্ছে রামেসেস-২ রানি নেফারতারির সঙ্গে আছেন। অন্য চিত্রে নেফারতারি দেবী হাথোর ও মুটের কাছে নিবেদন করছেন।

বড় ঘরটি থেকে পরের পবিত্র ঘরে যাওয়ার জন্য ৩টি সুবিশাল দরজা আছে। এই ঘরের উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ২টি অতি চমৎকার চিত্র খোদিত আছে যেটাতে রামেসেস-২ এর হাতে একটি প্যাপিরাস বৃক্ষ—হাথোর একটি নৌকায় একটি গরুর সঙ্গে রয়েছেন। পশ্চিম

দেয়ালের চিত্রে রামেসেস-২ ও নেফারতারি দু'জনে দেবতা হোরাস, সাটিস, আনুবিস ও খনুম এর উদ্দেশ্যে নিবেদন করছেন।

সকল ফারাওকে গণিত, স্থাপত্য, বিজ্ঞান, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা, শিল্পকলা প্রভৃতি বিষয়ে প্রচুর দক্ষ থাকতে হত। কথিত আছে যে ফারাওদের জন্য সমগ্র মিশরের প্রত্যেকে মন্দিরে ধর্মীয় অনুষ্ঠান করা হত। এর জন্য সকল মন্দিরে বিশেষ পুরোহিত থাকত। ফারাওদের দেবতা হিসাবে সকল মন্দিরে সেই মত আচারের ব্যবস্থা হত।

মিশরের মন্দিরের পুরোহিতরাও ছিলেন প্রচণ্ড ক্ষমতাবান। তারাও অনেক সময় রাজাকেও প্রভাবিত করতেন। ওরা ঈশ্বরের ব্যাখ্যা দিতেন নিজেদের মতো করে। তাদের মতে ঈশ্বর জন্ম নিতে পারেন। নিজের ইচ্ছায় ঈশ্বর জন্মও নেন। ঈশ্বরের আদেশেই সূর্য আলো দেয়। জীবনের মূল পিতা ও মাতা। দেবতাদের পিতা ও মাতা এবং পিতাদের পিতা, মাতাদের মাতা সকলেই ঈশ্বর থেকে এসেছে। মিশরের পুরোহিতদের মধ্যে একেশ্বরবাদের মতবাদ বেশ জোরাল ছিল।

মিশরীয়রা বিশ্বাস করত যে সূর্য এত শক্তিশালী কারণ সূর্যও দেবতা- সূর্যও ঈশ্বরের সৃষ্টি। ঈশ্বরের খুশিমত আলো দেয়। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই সূর্য ৩টি গুণ ধারণ করেছে।

তা হচ্ছে ঃ-

❑ তাপ

❑ আলো ও

❑ আকার।

প্রথমে সূর্যকে ঈশ্বরের প্রধান প্রতীক বলে মনে করা হত। মনে করা হত সূর্যেরও আত্মা আছে এবং সে আত্মা ঈশ্বর দিয়েছেন। অন্য দেবতারা সূর্যের আত্মা থেকে তৈরি। সূর্যের আত্মা বা আমনর-রা লুকিয়ে থাকে, ধরা দেয় না। তাই সূর্যের আত্মাকে আমনর-রা বলেন পুরোহিতরা।

আমরা ঘুরে ঘুরে আবু সিম্বেল মন্দির দেখছি। কেউবা ভিডিও করছি। কেউ আবু সিম্বেলের মন্দিরের সামনে রামেসেসের মূর্তিকে পিছনে রেখে ছবি তুলছি। আর গাইডের বর্ণনা অবাক হয়ে শুনে যাচ্ছি। সব ঘুরে দেখতে বেশ সময় লেগে গেল। এখানেও সেই একই অবস্থা। কোনটা ছেড়ে কোনটা দেখব। সবই তো চোখ ধাঁধাঁনো পাগল করা। ইতিহাস শুনলে তো আর কথাই নেই।

রামেসেসের বড় মন্দির দেখা হয়ে গেলে নেফারতারি মন্দিরে ঢুকলাম। এই নেফারতারি মন্দির সকলের নিকট প্রেমের প্রতীক। আর আবু সিম্বেল উত্তর ও দক্ষিণ মিশরের মিলনের প্রতীক। যেন উত্তর ও দক্ষিণ মিলেছে আবু সিম্বেলে। রামেসেস-২ তার রানি নেফারতারিকে যে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন তার প্রমাণ এই নেফারতারি মন্দির। প্রতিটি পরতে পরতে রানিকে তুলে ধরেছেন সমান মর্যাদায়। তিনি তার সন্তানাদিদেরও যে খুব ভালোবাসতেন তারও

সাক্ষ্য দেয় এই নেফারতারি মন্দির। তাদেরও মূর্তি স্থাপিত হয়েছে এই মন্দিরে। মন্দিরের ভিতরের দেয়ালে যে চিত্র আছে তা দেখেও বোঝা যায় রামেসেস-২ কতটা শিল্প অনুরাগী ছিলেন।

এই যে মন্দির আমরা দেখছি সেটা যে পুরো তুলে এনে পুনরায় এখানে স্থাপন করা হয়েছে তা ভেবে অবাক হতে হয়।

আসোয়ান বাঁধ নির্মাণের সময় কেউই ভাবেনি যে বাঁধের ফলে জলস্তর এত উঁচুতে উঠবে এবং আস্ত আবু সিম্বেল টেম্পলটাই জলের নিচে চলে যাবে এবং প্রায় ধ্বংসের মুখোমুখি হবে।

১৯৫৯ সালে নুবিয়ার এই বিশাল প্রাচীন মন্দির আসোয়ান বাঁধের কারণে সৃষ্ট জলের নিচে অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক ভাবে আবেদন জানানো হয়। সকলের নিকট আর্থিক অনুদানের জন্য বিশেষ সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। উইলিয়াম ম্যাক কুইটি একটি প্রস্তাব করেন মন্দিরের চারপাশে উঁচু বাঁধ তৈরি করে নীলনদের পূর্বের স্তরে জল আটকে রাখার, তাহলে মন্দিরটি রক্ষা পাবে। ১৯৬২ সালে দুইজন স্থপতি জেন ড্রিয়ু ও ম্যাক্সওয়েল ফ্রাই এবং প্রকৌশলি ওভে আরুপ এই ধারণাটিকে প্রস্তাব আকারে তুলে ধরেন। তারা এও মনে করেন এর ফলে মরুভূমির বালুঝড় থেকেও মন্দিরটি রক্ষা পাবে। অনেক বিশেষজ্ঞ এই প্রস্তাবকে সমর্থন করেন।

অন্যদিকে এই প্রস্তাবের প্রয়োগ ও প্রযুক্তির সমস্যার কথা ভেবে মিশর কর্তৃপক্ষ এই প্রস্তাব বাতিল করেন। ইউনেস্কো এগিয়ে আসে এই সুপ্রাচীন ঐতিহ্য রক্ষায়। ইউনেস্কোর তত্ত্বাবধানে ১৯৬৪ সালে স্থপতি ও প্রকৌশলীদের একটি বহুজাতিক সংস্থা ভারি ও আধুনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে আবু সিম্বেল মন্দিরের উদ্ধারের কাজ শুরু করে। তখন আনুমানিক খরচ ধরা হয় চল্লিশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আবু সিম্বেল টেম্পল রক্ষায় এক বিরাট কর্মযজ্ঞ শুরু হয়। পরিকল্পনা হয় সমগ্র মন্দিরটিকে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে দূরে উঁচু কোন জায়গায়।

নুবিয়ার মুল জায়গা থেকে ৬৫ মিটার উঁচুতে ও নীলনদ থেকে ২০০ মিটার দূরে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যবস্থা করা হয়।

চ্যালেঞ্জ (Challenge) :

স্থান নির্বাচন এমনভাবে করা হয় যেন স্থানটিতে পর্যকটরা সহজে আসোয়ান হয়ে যাতায়াত করতে পারবে। ভবিষ্যতে জলাশয়ের জল বা কোন প্রাকৃতিক ধূলিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। মন্দিরটি পাহাড়ের গায়ে খোদিত রামেসেস-২ ও তার পরিবারের সকলের মূর্তি ও অভ্যন্তরে বিশাল বিশাল ঘর অসাধারণ স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত। ভিতরে নানাবিধ শিল্পকর্ম ও কারুকার্য রয়েছে। সব কিছু অক্ষত রেখে পুরো স্থাপত্যকে স্থানান্তর করাই আসল চ্যালেঞ্জ। প্রথমে সমস্ত মন্দিরটিকে বিরাট বিরাট খণ্ডে কাটা হল, ব্লক বানানো হল।

এক একটি ব্লক বা খণ্ড ১২ কিউবিক মিটারের মাপে কাটা হয়। প্রতিটি ব্লক ২০ থেকে ৩০ টন ওজনের। এভাবে আলাদা আলাদা করে টুকরো টুকরো করা হল মন্দিরটিকে। এমনকি লেক নাসেরের নিচ থেকেও অনেক স্থাপত্য খুঁড়ে বের করা হল। এই সকল ব্লক বর্তমান জায়গায় নিয়ে আসা হল ভারি গাড়িতে করে। হাজার হাজার শ্রমিক ও প্রকৌশলি দিনরাত কাজ করতে লাগল আধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে।

The Abu Simbel temples are two massive rock temples at Abu Simbel, a village in Nubia, southern Egypt, near the border with Sudan. They are situated on the western bank of Lake Nassaer, about 230 km southwest of Aswan (about 300km by road). The complex is part of the UNESCO World Heritage Site known as the "Nubian Monuments", which run from Abu Simbel Downriver to Philae (near Aswan). The twin temples were originally carved out of the mountainside in the 13th century BC, during the 19th Dynasty reign of the Pharaoh Ramesses II.

They serve as lasting monument to the King and his Queen Nefertari, and commemorate his victory at the Battle of Kadesh. Their huge external rock relief figures have become iconic.

The complex was relocated in its entirety in 1968 on an artificial hill made from a domed structure, high above the Aswan high Dam reservoir. The relocation of the temples was necessay or they would have been submerged during the creation of Lake Nasser the massive artifical water reserveir formed after the building of the Aswan High Dam on the Nile River.Construction of the temple complex started in approximately 1264 BC and lasted for about 20 years until 1244 BC known as the "Temple of Ramesses, beloved by Amun" it was one six rock temples erected in Nubia during the long reign of Ramesses II. Their purpose was to impress Egypt's southern neighbours and also to reinforce the status of Egyptian religion in the region.

With the passage of time the temples fell into disuse and eventually became covered by sand. By the 5th century BC, the sand already covered the statues of the main temple up to their knees. The temple was forgotten untill 1813, when Swiss orientalist Jean-Louis Burckhardt found the top frieze of the main temple. Burckhardt talked about his discovery with Italian explorer Giovanni Belzoni, who travelled to the site, but was unable to dig out an entry to the temple. Belzoni returned in 1817, this time succeeding in his attempt to enter the complex. A detailed early description

of the temples together with contemporaneous line drawings (1825-1828) can be found in Edward William Lane's description of Egypt.

The statue of Ramesses the Great at the Great Temple of Abu Simbel is reassembled after having been moved in 1967 to save it from flooding.

The salvage of the Abu Simbel temples began in 1964 by a multinational team of archeologists, engineers and skilled heavy equipment operators working together under the UNESCO Banner. It cost some USD $40 million at the time. Between 1964 and 1968, the entire site was carefully cut into large blocks (up to 30 tons, averaging 20 tons) dismantled, lifted and reassembled in a new location– 65 meters higher and 200 meters back from the river, in one of the greatest challenges of archaeological engineering in history. Some structures were even saved from under the waters of Lake Nasser. Today, a few hundred tourists visit the temples daily Guarded convoys of buses and cars depart twice a day from Aswan the nearest city. Many visitors also arrive by plane at an airfield that was specially constructed for the temple complex.

The complex consists of two temples. The larger one is dedicated to Ra Horakhty, Ptah and Amun, Egypt's three state deities of the time and features four large statues of Ramesses II in the facade The smaller temple is dedicated to the goddess Hathor, personified by Nefertari, Ramesses's most beloved of his many wives. The temple is now open to the public.

Great Temple :

The Great Temple at Abu Simbel, which took about twenty years to build, was completed around year 24 of the reign of Ramesses the Great (which corresponds to 1265 BC) it was dedicated to the gods Amun, Ra-Horakhty, and Ptah, as well as to the deified Ramesses himself it is generally considered the grandest and most beautiful of the temples commissioned during the reign of Rameses II, and one of the most beautiful in Egypt.

Four colossal 20 meter statues of the pharaoh with the double atef crown of Upper and Lower Egypt decorate the facade of the temple which is 35 meters wide and is topped by a frieze with 22 baboons, worshippers of the sun and flank the entrance. The colossal statues were sculptured directly from the rock in which the temple was located before it was moved. All statues represent Ramesses II seated on a throne and

wearing the double crown of Upper and Lower Egypt. The statue to the left of the entrance was damaged in an earthquake, leaving only the lower part of the statue still intact. The head and torso can still be seen at the statue's feet.

Next to the legs of the colossi, there are other statues no higher than the knees of the pharaoh. These depict Nefertari, Ramesses's chief wife, and queen mother Mut-Tuy, his first two sons Amun-her-khepeshef. Ramesses, and his first six daughters Bintanath, Baketmut, Nefertari, Meritamen, Nebettawy and Isetnofret.

The entrance itself is crowned by a bas-relief representing two images of the king worshipping the falcon-headed Ra Horakhti, whose statue stands in a large niche. This god is holding the hieroglyph user and a feather in his right hand, with Ma'at (the goddess of truthe and justice) in his left, this nothing less than a gigantic cryptogram for Ramesses-II's throne name, User-Maat-Re. The facade is topped by a row of 22 baboons, their arms raised in the air, supposedly worshipping the rising sun. Another notable feature of the facade is a stele which records the marriage of Ramesses with a daughter of king Hattusili III, whic sealed the peace between Egypt and the Hittites.

The inner part of the temple has the same triangular layout that most ancient Egyptian temples follow, with rooms decreasing in size from the entrance to the sanctuary. The temple is complex in strucure and quite unusual because of its many side chambers. The hypostyle hall (sometimes also called a pronaos) is 18 meters long and 16.7 meters wide and is supported by eight huge Osirid pillars depicting the deified Ramses linked to the god Osiris, the god of the Underworld, to indicate the everlasting nature of the pharaoh. The colossal statues along the left-hand wall bear the white crown of Upper Egypt, while those on the opposite side are wearing the double crown of Upper and Lower Egypt.The bas-reliefs on the walls of the pronaos depict battle scenes in the military campaigns the ruler waged. Much of the sculpture is given to the Battle of Kadesh, on the Orontes river in present-day Syria, in which the Egyptian king fought against the Hittites. The most famous relief shows the king on his chariot shooting arrows against his fleeing enemies, who are being taken prisoner. Other scenes show Egyptian victories in Libya and Nubia.

From the hypostyle hall, one enters the second pillared hall, which has four pillars decorated with beautiful scenes of offerings to the Gods, There are depictions of Ramesses and Nefertari with the sacred boats of Amun and Ra-Horakhti. This hall gives access to a transverse vestibule in the middle of which is the entrance to the sanctuary. Here, on a black wall, are rock cut sculptures of four seated figuress Ra-Horakhti, the defied king Ramesses and the gods Amun Ra and Ptah. Ra-Horakhti, Amun Ra and Ptah were the main divinities in that period and their cult centers were at Heliopolis. Thebes and Memphis respectively.

Solar aligment :

It is believed that the axis of the temple was positioned by the ancient Egyptian artchitects in such a way that on October 22 and February 22 the rays of the sun would penerate the sanctuary and illuminate the sculptures on the back wall, except for the statue of Ptah, a god connected with the Underworld, who always remained in the dark. People gathered at Abu Simbel to witness the remarkable sight on October 22 and February 22.

The Temple of Hathor and Nefertari :

The Temple of Hathor and Nefertari, also known as the Small Temple, was built about one hundred meters northeast of the temple of Pharaoh Ramesses II and was dedeicated to the goddess Hathor and Ramesses II's chief consort, Nefertari. This was in fact the second time in ancient Egyptian history theat a temple was dedicated to a Queen. The first time, Ahkenaten dedicated a temple to his great royal wife. Nefertiti The rocke-cut facade is decorated with two groups of colossi that are separated by the large gateway. The statues, slightly more than ten meters high, are of the king and his queen. On either side of the portal are two statues of the king, wearing the white crown of Upper Egypt (south colossus) and the double crown (north colossus), these are flanked by statues of the queen.

Remarkably, this is one of very few instances in Egyptian art where the statues of the king and his consort have equal size. Traditionally the statues of the queens stood next to those of the Pharaoh, but were never toller than his knnes. Ramesses went to Abu Simbel with his wife in the 24th year of his reign. As the Great Temple of the king, there are samll statues of princes and princesses next to their parents. In this case they

are positioned symmetrically. On the south side at left as one faces the gateway are from left to right–prince Meryre, princesses Meritamen and Henuttawy, and prines Rahirwenemef and Amun-her-Khepeshef, while on the north side the same figures are in reverse order. The plan of the Small Temple is a simplified version of theat of the Great Temple.

As the larger temple dedicated to the king, the hypostyle hall or pronaos is supported by six pillars; in this case, however, they are not Osiris pillars depicting the king, but are decorated with scenes whith the queen playing the sistrum, an instrument sacred to the goddess Hathor, Isis, Maat, Mut of Asher, Satis and Taweret, In one scene Ramesses is presenting flowers or burning incense. The capitals of the pillars bear the face of the Goddess Hathor, this type of column is known as Hathoric. The base-reliefs in the pillared hall illustrate the dificiation of the king. The destruction of his enemies in the north and south in this scenes the king is accompanied by his wife, and the queen making offerings to the goddess Hathor and Mut. The hypostyle hall is fallowed by a vestibule, access to which is given by three large doors. On the south and the north walls of this chamber there are two graceful and poetic bas-reliefs of the king and his consort presenting papyrus plants to Hathor, who is depicted as a cow on a boat sailing in a thicket of papyri. On the west wall, Ramesses II and Nefertari are depicted mamking offerings to god Horus and the divinities of the Cataracts- Satis, Anubis and Khnum.

The rock cut sanctuary and the two side chambers are connected to the transverse vestibule and are aligned with the axis of the temple. The bas-reliefs on the side walls of the small sanctuary represent scenes of offerings to various gods made either by the pharaoh or the queen. On the back wall, which lies to the west along the axis of the temple, there is a niche in which Hathor, as divine cow, seems to be coming out of the mountain. The goddess is depicted as the Mistress of the temple dedicated to her and to queen Nefertari, who is intimately linked to the goddess.

Each temple had its own priest that represents the king in daily religious ceremonies. In theory, the Pharaoh would have been the onley celebrant in daily religious ceremonies performed in different temples throughout Egypt. In reality, the high priest also played that role. To reach that position an extensive education in art and science was necessary, like one Pharaoh had. Reading, writing, engineering, arthmetic, geometry, astronomy, space

measurement, time calculations, were all part of this learning. The priests of Heliopolis, for example, became guardians of sacred knowledge and earned the reputation of wise ment.

বর্তমান যে মন্দির দুটি আমরা দেখছি এগুলো এভাবেই ১৯৬৮ সালের মধ্যে পুনরায় প্রতিস্থাপিত হয় এবং পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হয়। প্রতিদিন অসংখ্য পর্যটক এখানে আসছে পৃথিবীর নানা দেশ থেকে। আমরা সুদুর ভারত থেকে এসেছি জেনে ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা থেকে আসা অনেক বিদেশি পর্যটক হাত মেলাচ্ছে, আমাদের সাথে ছবি তুলছে। যখন জানল যে, অমিতাভ বচ্চনের দেশ থেকে এসেছি তখন অনেকেই আমাদের প্রতি আলাদা আগ্রহ দেখাতে লাগল। অদ্ভুত লাগল আর ভালোও লাগল যে সেব মানুষের কাছে অমিতাভ বচ্চনের নামে ভারত প্রসিদ্ধ। ওদের মুখে শুনলাম ওদের দেশেও ওরা অমিতাভ বচ্চনের সিনেমা দেখে। মনটা ভরে উঠল আবেগে আর আনন্দে।

আবু সিম্বেলে যেন মানুষের ঢল। হাজার হাজার মানুষ এই মরুভূমিতে। পর্যটনের নেশায় মানুষ পাগল। এখানে আসলে বোঝা যায়, একটিই তো জীবন। তাই যতটা দেখে নেওয়া যায় এই পৃথিবীটাকে। সকল বয়সের মানুষের সমাগম সকল পর্যটন কেন্দ্রে। এখানেও তার ব্যতিক্রম দেখি না। আর পৃথিবীর সকল পর্যটকদের মধ্যে একটা মিল খুঁজে পাই। বেড়াতে আসলে সকলে সকলের জন্য কতটা সহানুভূতিশীল তা একমাত্র পর্যটকরাই জানে। নিজের জায়গা ছেড়ে দেয় অন্যের জন্য। এরা যেন কতকালের চেনা মানুষ। সকলের মুখে থাকে একটা প্রসন্ন পরিতৃপ্তির ছাপ। কেউ কারও দিকে তাকালে হাসি বিনিময়, গুড মর্নিং-সেলাম, নমস্তে। যুবা বৃদ্ধ তরুণ তরুণী হাত বাড়ালে কুশল বিনিময়-হ্যান্ড শেক। কোন দেশ থেকে এসেছি জানতে চাওয়া। মুহুর্তের মধ্যেই একটা সখ্যতা সৃষ্টি হয়।

পর্যটকদের মধ্যে সাদা কালো বিভেদ নেই, জাতিগত পার্থক্য নেই। একটা অদ্ভুত অনুভূতি কাজ করে সকলের মধ্যে। যেন এই বিশাল পৃথিবীতে এসেছি কদিনের জন্য। যত পারি আস্বাদন করি এই পৃথিবীর রূপ রস রহস্য। আবার তো ফিরে যাব দেশে যার যার পরিবারে। যেন পৃথিবীটা এক যাযাবর ক্ষেত্র। দুদিনের জন্য আসা যাওয়া। তাই পর্যটনে যারা যায় ক্ষুদ্র স্বার্থ-ক্ষুদ্র চিন্তা তাদের মধ্যে কাজ করে না। ভাবনা চিন্তাই পাল্টে যায় তাদের। এই পৃথিবীর বিশালত্ব অনুভব করা যায়। আমরা যে অতি ক্ষুদ্র। শুধু শুধুই মানুষে মানুষে বিবাদ ঝগড়া মারামারি আর হিংসা। মহাকালের কাছে আমাদের আয়ু নগণ্য। আমার আমিত্ব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। তবে কিসের এত অহংকার? কিসের এত বড়াই? কিসের জন্য এত স্বার্থপরতা?

পর্যটন শিক্ষা দেয়—আমরা ফিরে যাব আবার যার যার অস্তিত্বে, যার যার গন্তব্যে। স্মরণ করিয়ে দেয় আমরা সকল দেনা পাওনা ফেলে খালি হাতে সেই মহাগন্তব্যে এগিয়ে চলেছি। এগিয়েই যেতে হবে, পিছনে ফেরা যাবে না। জীবন একটা - ওয়ান ওয়ে রোড।

আবু সিম্বেলের মন্দির দেখে বেরিয়ে এসে গেটের বাইরে আবার মাথা গুনতি। আঠারো জন আছি তো। কাউকে ছেড়ে গেলে তার দেশে ফেরা নিয়ে কষ্ট আছে। তিনশো কিলোমিটার দূরে আসোয়ানে আমাদের ফ্লোটেল জেসমিন নীলনদে ভেড়ানো আছে। এখানে না আছে কোন ট্যাক্সি না আছে কোন পাবলিক বাস। বাদ পড়লে রক্ষে নেই বিরাট ঝামেলা থেকে।

রোদ চড়ছে গরম বাড়ছে। এতক্ষণ আবু সিম্বেলের মন্দির দেখতে দেখতে গরমের খেয়াল ছিল না। বাইরে বেরিয়ে টের পাচ্ছি। গাইড সকলকে ৩০ মিনিটের জন্য আবু সিম্বেলের সাথেই একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকিয়ে দিল যদি কেউ কিছু খেতে চান তাহলে খেয়ে নিতে পারেন।

সকলেই তো ক্লান্ত ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্তও বটে। সকলেরই জল পিপাসা আর চায়ের নেশা। দীপালী কিনল জল আর আমি নিলাম চা।

কাউন্টারে দাম চুকিয়ে চায়ের কাপ নিয়ে একটা খালি টেবিল দেখে বসলাম দুজনে। পা টাও ধরে এসেছে হেঁটে হেঁটে। প্রায় তিন চার ঘন্টা পায়ের উপর। কোথাও বসার ব্যবস্থা নেই ভিতরে। থাকলেও বসার জো নেই। মন্দির দেখব না বসে থাকব। কোনোটাই তো মিস করতে চাই না।

দীপালীকে বললাম, 'একটু চা খেয়ে দেখ। অসাধারণ চা।'

ও বলল, 'তুমি খাও চা। আমি অন্য কিছু দেখি, কিসের স্বাদ নেওয়া যায়। এখানে সব কিছুর দাম বেশি। আসোয়ান থেকে প্রায় তিন গুণ বেশি।'

দীপালী একটা ফ্রুট কেক আর এক বোতল জল কিনে আমার সামনের টেবিলে বসে পড়ল।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেকের কত দাম নিল?'

ও বলল, 'দাম শুনে কি হবে? তুমি খাবে? খাবে তো এনে দিচ্ছি এক খানা। খুব ভালো টেস্ট। দারুন।'

আমি ওর থেকে এক টুকরো ভেঙে নিলাম। টেস্ট করার জন্য। খুব ভাল ফ্রুটকেক। দামও তেমনি পঞ্চাশ ইজিপশিয়ান পাউন্ড। মানে আমাদের এখানকার সাড়ে চারশো টাকা। লোভ সামলাতে পারলাম না।

দীপালীকে বললাম, 'আর একখানা নিয়ে এস। আমি আর উঠতে পারব না, পা দুটোকে একটু রেস্ট দিই।'

দীপালী আমার জন্য আর একটা অন্য রকম কেক আনল। সে তার অর্ধেকটা ভেঙে খেতে খেতে বলল, 'এটা খাও। দেখ অন্য রকম টেস্ট। এটাও দারুণ স্বাদের।'

সে স্বাদ এখনও জিভে লেগে আছে। মনেও লেগে আছে। মনে লেগে আছে আবু সিম্বেলের স্মৃতিও ওই ফ্রুটকেকের সাথে। চা কেক জল খেয়ে আমি আবার চাঙা। দীপালী বোতলের বাকি জলটুকু আর কেকটা খেতে খেতে বলল, 'চল ওদিকে যাই। কিসের যেন জটলা।'

বাইরে অনেক খেজুর গাছ। খেজুরও ধরেছে। ওখানে বাইরে ছায়ায় অনেক দেশি বিদেশি পুরুষ মহিলা বসে আছে। কেউ কোল্ড ড্রিঙ্কস, কেউ জলের বোতল নিয়ে। আমরাও ভিড়লাম ওদের সাথে। আর ফটাফট ছবি তোলা চলছে। ফিলিপাইন্স থেকে এসেছে একদল তরুণ তরুণী। সকলেই খোলা মেলা পোশাক পরিচ্ছদে উদার। যেন ফ্যাশান শোতে এসেছে ওরা। আমাদের সকলেরই বিদেশি পর্যটকদের সাথে ছবি তোলার দিকে ঝোঁক। আমিও ওদের দলে ভিড়ে গেলাম। ওরাও ছবিতে পোজ দিতে কার্পণ্য করছে না। গলাগলি, জড়াজড়ি, প্রকাশ্য চুম্বন, সব চলছে। যেমন খুশি যত বেশি ছবি তুলে রাখা যায় তুলে নিলাম। পরে স্মৃতি রোমন্থনে কাটবে ভাল তাই।

কোথা থেকে দীপালী এসে ফিলিপাইনি মেয়েটির হাত থেকে আমাকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'চলো, অনেক ফটো তুলেছ বিদেশিনীদের সাথে। অনেক হয়েছে, এবার চলো। গাড়ির কনভয়ে সবাই যাচ্ছে।'

গাইড সকলকে ডাকছে। গাড়ির কনভয়ে এগুচ্ছে। আবার বাস ধরে এগোতে হবে আসোয়ানের দিকে। জেসমিন অপেক্ষা করছে নীলনদে আমাদের জন্য। উঠে পড়লাম বাসে।

ছুটে চলেছি বাসে করে তপ্ত মরুভূমির মাঝ দিয়ে জেসমিনের দিকে। বাইরে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী সেলসিয়াস। ভিতরে অবশ্য টের পাচ্ছি না। এসি খুব ভাল কাজ করছে বোঝা গেল। কারণ সবাই বাসে উঠে ঝিমোচ্ছে চোখ বন্ধ করে। সবাই আবু সিম্বেল ঘুরে এতই ক্লান্ত যে এ সুযোগ ছাড়ছে না। তাই ঝিমিয়ে নেওয়া। বড়ো ধরণের বেশিদিনের ভ্রমণ হলেই যখনই সুযোগ পাওয়া যাবে ঘুমিয়ে নিতে হয়। এটাই নিয়ম এটাই পদ্ধতি। কারণ বেশির ভাগ সময় প্রচুর শারীরিক পরিশ্রম করতে হয়। তাই জল খাও আর পারলে ঝিমাও বা পারলে ঘুমাও।

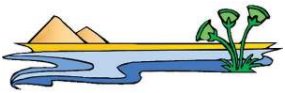

কম-ওমবো
The Temple of Kom Ombo

সকলেই একে একে জেসমিনে উঠলাম। কিন্তু ঢোকার মুখেই গাইড বলে দিল, 'আমি জানি আপনারা টায়ার্ড। ঘরে ঢুকে ফ্রেশ হয়ে নেবেন কিন্তু কেউ দয়া করে ঘুমিয়ে পড়বেন না। কারণ বেরতে হবে কম-ওমবো দেখতে।'

চন্দনদা চোখে মুখে একটু বিরক্তির সাথেই বলে উঠল, 'বেড়ানো মানে তো আনন্দ ফুর্তি করা নয়। শুধু কষ্ট করা। আবার কোথায় কম-ওমবো, সেখানে যাও। কি এমন আছে কম-ওমবোতে? ওখানে কি না গেলেই নয়?'

আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলাম, 'চন্দনদা, তাহলে থেকে যাও। আমরা ঘুরে আসি। তুমি ঘুমাও। আর রাতে ফিরে তোমাকে গল্প শোনাব কম-ওমবোর।'

সঙ্গে সঙ্গে চন্দনদা ফোঁস করে উঠল, 'হ্যাঁ তোমরা আমাকে একা ফেলে যাও। আর তোমরা মজা কর ওদিকে। আমি কি এত বোকা যে তোমাদের কথায় কম-ওমবো যাব না?'

পরে কম-ওমবো যাওয়ার সময় দেখি চন্দনদা সবার আগেই জেসমিনের রিসেপশানে বসে আছে। আমাদের দেখে বলে উঠল, 'আমি কিন্তু ঘুমোইনি। আমাকে তোমরা ফেলে যাবে? সে হবে না। শেষে তোমরাই একথা বলবে, কম-ওমবো না দেখলে জীবনটাই বৃথা।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, চল'—বললাম আমি।

গাইড সকলকে নিয়ে বাসে উঠল। আর কম-ওমবো বিষয়ে বলতে শুরু করল।

গাইড বলল, 'কম-ওমবো একটি অতি প্রাচীন শহর। আপনারা দেখবেন এখানে কুমির দেবতাকে। কুমিরের মমি আছে এখানে দেখতে পাবেন। প্রাচীনকালে কুমিরকে দেবতা হিসেবে পুজো করা হত। কুমির খুব অত্যাচার করত তাই সকলে কুমিরের পুজো করা শুরু করে। যখন যে অত্যাচারী বা খুব শক্তিশালী তখন তাকে পুজো করা ছিল প্রাচীনকালে সকলের রীতি।'

আমি মনে মনে বললাম, 'এখনও অত্যাচারীকে সবাই পুজো করে সব জায়গায়। পাঁচ হাজার বছর আগের রীতি আর আজকের রীতির মধ্যে কিই বা পার্থক্য। তখন হত কুমিরের পুজো এখন হয় অত্যাচারী মানুষের পুজো।'

কম ওমবো

কম-ওমবো শহরের প্রাচীরের গায়ে এসে থামল আমাদের বাস। কম-ওমবো শহরে ঢুকে মন্দিরের গেটে পৌঁছোতে পায়ে হেঁটে ১০০ মিটার পর্যন্ত গেলাম। দুই পাশের পাঁচিল চলে গিয়েছে নীলনদ পর্যন্ত। ভিতরে ঢুকে দেখলাম দুই পাশে দুটি প্রাচীন মন্দির।

কম ওমবো মন্দির খ্রিস্টপূর্ব ১৮০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৪৭ পর্যন্ত টলেমি রাজবংশের সময়ে নির্মিত হয়। মন্দিরের দক্ষিণ অংশ নিবেদিত হয়েছে তিন দেবতাদের উদ্দেশ্যে (The Southern half of the temple was dedicated to):-

❑ কুমির দেবতা সেবেক (The crocodile God Sobek- the God of Fertility)

❑ হাথোর (God Hathor)

❑ খনসু (God Khonsu-Both are the creator of the World.)

উত্তর অংশ নিবেদিত হয়েছে - এই তিন দেবতার উদ্দেশ্যে (The Northern part of the temple was dedicated to):-

❑ হারয়েরিস (God Haroeris/Horus the Elder)

❑ টাসেনেটনোফ্রেট (God Tasenetnofret- the Good Sister, a special form of Hathor or Tefnet/Tefnut)

❑ পানেবটাই (Panebtawy- Lord of the Two Lands).

সেবেক কুমির দেবতা হচ্ছে শস্য ও উর্বরতার প্রতীক। হাথোর ও খনসু দেবতা হচ্ছে পৃথিবীর স্রষ্টা। সেবেক তখনকার সময়ে সবচেয়ে বেশি পুজিত দেবতা ছিলেন। মনে করা হত সেবেক পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন নিজের হাতে। শস্য তৈরিতে তার আশীর্বাদ বেশি প্রয়োজন। তিনি ছিলেন উর্বরতার প্রতীক। তার শরীর মানুষের কিন্তু মাথা কুমিরের।

গাইড দেখাল দুটি মন্দিরেই দুটি চিকিৎসার ঘর। এর দ্বারা বোঝা যায় তখন রাজারা কত বিজ্ঞানমনস্ক ছিল। নিজেদের চিকিৎসার জন্য চিকিৎসালয়েরও ব্যবস্থা করেছিলেন মন্দিরের সঙ্গে। একটি ঘরে দেখলাম কাঁচের একটি বড় বাক্সে কুমিরের মমি করে রাখা আছে। গাইড বলল ওই সময়ে মৃত কুমিরকে পুজো করা হত। মৃত কুমিরের কানে সোনার দুল ও গয়না পরানো হত। তখন এই অঞ্চলে কুমির শিকার নিষিদ্ধ ছিল। অবশ্য মিশরের অন্য অঞ্চলে কুমির শিকার প্রচলন ছিল এবং তারা কুমিরের মাংসও খেত। এসব তথ্য শোনাল গাইড। আমি বেশ কিছু ফাইভ স্টার হোটেলে মেনু কার্ডে কুমিরের মাংসের আইটেম দেখেছি। অর্থাৎ টাকা ফেললে সব পাওয়া যায়। রুচি থাকলে সব খাওয়া যায়।

গাইড শোনাল, 'মিশরের নানা দেবতার নানা রকমের মুখের আকৃতি। পশু বা পাখির আকৃতির মুখ অনেক দেবতারই। ধারণা করা হয় মানুষের মুখের আকৃতির ঈশ্বর বা দেবতা মানার চেয়ে পশু পাখির আকৃতির দেবতার পুজো করতেই বেশি আগ্রহ ছিল এদের। তাই সে সব দেবতাদের আকৃতিতে চলে আসত পশু, পাখি বা কুমিরের মুখ। বিভিন্ন পশু পাখিদের

সমাধিও পাওয়া যায় মিশরের বিভিন্ন স্থানে। বিভিন্ন পিরামিডের পাশে মাছ পশু পাখিদের মমি পাওয়া গিয়েছে।'

দেবী বাস্টেটের নামে একটি মন্দির আছে। বাস্টেটের মন্দিরে বিড়ালের অনেক প্রতিকৃতি পাওয়া যায়। বিড়াল উৎসর্গ করা হত বাস্টেটের নামে। দেবী বাস্টেটের মুখ বিড়ালের মতো। গাইড শোনাল, বিড়ালকে দেবতার নামে এতই শ্রদ্ধা করা হত যে তখন কেউ বিড়াল মারলে দেবী বস্টেট তাকে মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত দিতেন।

ফারাও খুনম দেবতার মুখ হচ্ছে ভেড়ার মুখের আকার। সে ভেড়ার আবার মাথায় শিং থাকতে হবে। সেটাই দেবতার মুখ হিসাবে খুনম দেবতার প্রকৃত আদল।

যেখানে ফারাও জোসার সমাধি আছে সেখানে যে ছোট একটা পিরামিড আছে সেই পিরামিডে সারস জাতীয় পাখির সমাধি ও চিত্র দেখা যায়। ধারণা করা হয় লম্বা ঠোঁট জাতীয় পাখি অর্থাৎ সারসকে দেবতা হিসাবে পুজো দেওয়া হত। ফারাও জোসার মুখ ছিল সারস পাখির মতো।

বাজপাখি ও শকুনকে তো দেবতা হিসাবে মান্যতা দেওয়ার রীতি অনেক শক্তিশালী ফারাওদেরও আছে। অনেক ফারাওদের শরীরের উপর অংশে শকুনের মুখ বা বাজ পাখির মুখ দেখা যায়।

বাজ ও শকুনের মুখ সম্বলিত দেবতাদের চিত্র ও মুর্তি অনেক মন্দিরের দেয়ালেচিত্রে অংকিত বা খোদিত দেখা যায়। ধারণা করা হয় সে সময় বাজপাখিকে পোষ মানানো হত। বাজপাখি শক্তির প্রতীক তাই বাজপাখির এত সমাদার। সোজা দেবতার সম্মান। শকুনও তদ্রূপ। যেহেতু আকাশের বহু উপর দিয়ে এরা উড়ে বেড়াতে পারে আবার ক্ষিপ্রতার সাথে নিচে নেমে আসতে পারে তাই এরাও শক্তির প্রতীক। শকুনকেও দেবতার মর্যাদা দেওয়া হত সে কারণে।

মেমফিশে ষাঁড়দের দেবতা রূপে পুজো দেওয়ার রীতিরও অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে। মেমফিশের মন্দির গাত্রে ও স্তম্ভে বিশাল বিশাল ষাঁড়ের প্রতিকৃতি এবং চিত্রাঙ্কন দেখা যায়। ষাঁড়ের সমাধিও পাওয়া গেছে এখানে অনেক। কথিত আছে ষাঁড় নাকি ভবিষ্যৎ বাণী করতে পারত। সে কারণে এই এলাকায় ভবিষ্যৎবানীর সভায় খুব ঘটা করে ষাঁড়ের পুজো করা হত। একমাত্র পুরোহিত সেই ভবিষ্যৎ বাণী শুনতে পেতেন। তিনি সেই ভবিষ্যৎবানী শুনিয়ে দিতেন সকলকে চিৎকার করে। পরে সেই ভবিষৎবানী সকলে মুখে মুখে ছড়িয়ে যেত সমগ্র এলাকায়।

Temple of Kom Ombo is an unusual double temple in the town of Kom Ombo in Aswan Upper Egypt. it was constructed during the Ptolemaic Dynasty, 180-47 BC. Some additions to it were later made during the Roman period. The building is unique because its double design

meant that there were courts, halls, sanctuaries and rooms duplicated for two sets of gods.

The southern half of the temple was dedicated to the crocodile God Sobek, God of fertility and creator of the world with Hathor and Khonsu.

The northern part of the temple was dedicated to the falcon God Haroeris-Horus the Elder, along with Tasenetnofret-the Good Sister, a speacial from of Hathor or Tefnet/Tefnut and Panebtawy-Lord of the Two Lands. the temple os atypical because everything is perfectly symmetrical along the main axis.

The texts and reliefs in the temple refer to cultic liturgies which were similar to those from that period. The temple itself had a specific theology. The characters invoked the gods of Kom Ombo and their legend. Two themes were present in this temple: the universalist theme and the local theme. The two combine to form the theology of this temple. A temple was already built in the New Kingdom to honor these Gods. However, this site gained it's importance during the Ptolemaic Kingdom. Little remains of the New kingdom temple. The existing temple was begun by Ptolemy VI Philometor (180 BC-145 BC) at the beginning of his reign and added to by other Ptolemies, most notable Ptolemy XIII Theos Philopator (51-47 BCE), who built the inner and outer hypostyles.

Much of the temple has been destroyed by the Nile, earthquakes, and later builders who used its stones for other projects. Some of the reliefs inside were defaced by Copts who once used the temple as a church.

A few of the three hundred crocodile mummies discovered in the vicinity are displayed in The crocodile Museum.

কম-ওমবো দেখে ঘুরে আবার বাসে করে ফ্লোটেল জেসমিনে ফেরা। বিকেল হয়ে গেল। বাসে আসতে আসতে ইচ্ছে করেই চন্দনদাকে একটু খোঁচা দিলাম, ‘কি চন্দনদা, আসতে চাচ্ছিলে না। এরকম কুমিরের মমি এ জীবনে আর দেখতে পেতে? দুই হাজার বছরের পুরোনো কুমির। এখনও কেমন অবিকল কুমির রয়েছে।’

চন্দনদা একগাল হেসে বলল, ‘সারাদিন অনেক কষ্ট হয়েছে ঠিক, কিন্তু কম-ওমবো দেখে সব কষ্ট যেন কোথায় উবে গেছে। না আসলে খুব মিস করতাম। কুমির দেবতা বলে কথা। তার আশীর্বাদ তো নিয়ে এসেছি। ভবিষ্যতে কুমির দেবতার আশীর্বাদ কাজেও লাগতে পারে।’

চন্দনদার কথা শুনে সারা বাসের সকলে হো হো করে সে কি হাসির রোল।

বেলি ড্যান্স

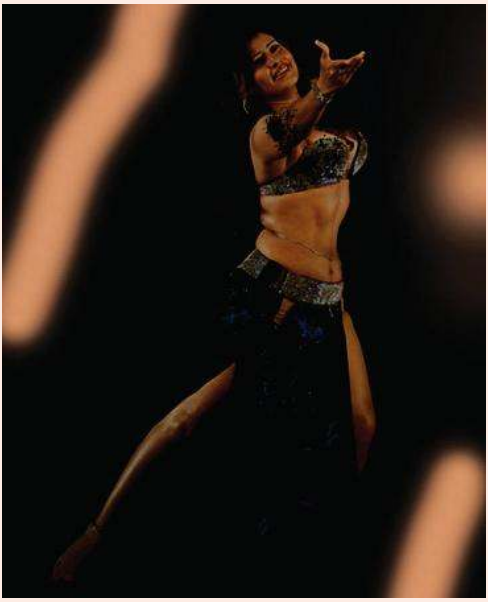

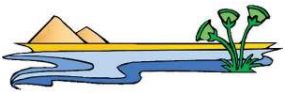

বেলি ড্যান্স
Belly Dance

সকলে নেমে যার যার ঘরে ঢুকতে যাচ্ছি। আমাদের থামিয়ে দিয়ে গাইড বলে দিল, 'আটটায় ডিনার, কেউ দেরি করবেন না। দেরি করলে অনেক কিছু মিস করবেন।'

জিজ্ঞাসা করলেও আর বেশি কিছু বলল না। শুধু একটু মুচকি হাসি দিল। পরে বুঝেছিলাম মুচকি হাসির পুরো অর্থ। গাইড বলল 'আধ ঘন্টা পর উপর তলার ড্যান্স ফ্লোরে আসবেন। নাচগান হবে।'

ঘরে ঢুকে ভাবলাম কেবিনে বিছানায় একটু গড়িয়ে নেই, ক্লান্ত শরীর। শুয়েও পড়লাম। এদিকে দেখি দীপালী চেঞ্জ করছে। সারাদিন যে পোশাকে ছিল। সেটা পাল্টে নিল। বাক্স থেকে একেবারে নতুন পোশাক বের করল।

আমি বললাম, 'তুমি একটু রেষ্ট নিতে পারতে কিছুক্ষণ। সারাদিন যা ধকল গেছে শরীরের উপর দিয়ে। সকালে আবু সিম্বেল, বিকেলে কম-ওমবো।'

দীপালী বলে উঠল, 'এখানে তুমি কি রেষ্ট নিতে এসেছ? বাড়ি ফিরে যত পার রেষ্ট নিও। মিশরে বেড়াতে এসেছি, মিশরে ঘুমোতে আসিনি, বুঝলে?'

আমি একটু মজা করে বললাম, 'আজ তোমার এক্সট্রা এনার্জি দেখছি। ব্যাপার কি বলত? সাজগোজ করেছ বেশ চটকদার। নাচ ঘরে তুমিও নাচবে নাকি?'

দীপালী বলে উঠল দ্বিগুণ জোরে, 'দেখে নিও আজ কি হবে। তোমাকেও নাচতে হবে আজ। আমাদের দলের সকলেই জানে যে তুমি ভাল নাচতে জানো। আজ তোমাকে কেউ ছাড়বে না, দেখে নিও। নাচতে তোমাকে হবেই। মিশরের মিস ইজিপ্ট আসছে আমাদের জেসমিনে। নাম তার তাহমিনা জেসমিন(Tahmina Jasmine)। মিশরের সেরা সুন্দরী। আজ রাতে তার বেলি ড্যান্স আমাদের ফ্লোটেলে। আমি খবর নিয়ে এসেছি। তুমি শুয়ে থাক। যেতে হবে না তোমাকে।'

শুনে আমি তো হুড়মুড়িয়ে উঠে বসলাম, 'বেলি ড্যান্স? সে কথা তো আগে বলবে। এ তো এক নতুন অভিজ্ঞতা হবে। জানো, মিশরের বেলি ড্যান্স বিশ্ব সেরা? কত গল্প শুনেছি। এ কি মিস করা যায়? চল চল।'

দীপালী বলে উঠল, 'বেলি ড্যান্স শুনে লাফিয়ে উঠলে যে! নতুন অভিজ্ঞতা হবে, বল? উঠে পড়। ঝটপট রেডি হও। আজ দেখব তোমার কত এনার্জি। মিস ইজিপ্টের সঙ্গে তোমাকে নাচিয়ে ছাড়ব।'

আমি বললাম, 'আমার সাথে চ্যালেঞ্জ করো না। তোমার মিস ইজিপ্টের সঙ্গে সত্যি সত্যি যদি নাচ শুরু করি তখন তো তুমি মুখ গোমড়া করে থাকবে।'

'কে বলল, আমি মুখ গোমড়া করে থাকব? নাচো না যত পার। যাও আজ রাতে তোমার জন্য আমি সব ছাড় দিলাম। দেখে নেব তোমার বীরত্ব। চল চল ওঠ। শুয়ে শুয়ে আর ঝগড়া করতে হবে না।'

দীপালী এসে আমার হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান দিল।

আমি বললাম, 'দাঁড়াও আমি ড্রেস চেঞ্জ করব না? সেই সকালে পরেছি। রোদে রোদে ঘুরছি। একই সার্ট প্যান্ট পরেই যাব?'

রে রে করে উঠল দীপালী, 'কি আবার চেঞ্জ করবে? পুরুষ মানুষের অত বার বার পোশাক পাল্টাতে হয় না। কে দেখবে তোমার দিকে তাকিয়ে, কি পরলে আর কি না পরলে? যা পরে আছ খুব ভাল দেখাচ্ছে, চল। এটাতেই চলে যাবে।'

তাহমিনার বেলি ড্যান্স দেখতে যাব বলে কথা। এখন আমি কি আর দীপালীর কথা শুনি। এক সেট নতুন শার্ট প্যান্ট বাক্স থেকে বের করে পরা শুরু করলাম আর দীপালীকে বলতে লাগলাম, 'শোনো, এখানে দেখবে সকলেই ভালো পোশাক পরে যাবে। আর আমি এই নোংরা পোশাক পরে গেলে তোমারই তখন খারাপ লাগবে।'

দীপালীর দিকে আপাদমস্তক তাকিয়ে বললাম, 'যাই বল দীপালী, এই ধবধবে কাজ করা সাদা শাড়িতে আজ তোমায় দারুন লাগছে। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে আজ রাতে তোমারই কোনও শো আছে।' — 'চলো অনেকে হয়েছে। এত প্রশংসা করতে হবে না।'

ওকে নিয়ে চললাম ওপর তলার ড্যান্স ফ্লোরের দিকে-মিস ইজিপ্ট তাহমিনা জেসমিনের সন্ধানে।

কেবিন থেকে বেরিয়েই দেখি ডাঃ চন্দন ঘোষাল সুন্দর বাহারি একটা পাঞ্জাবি পরে বেরিয়েছে। বললাম, 'কি হে চন্দনদা, একেবারে জামাই সাজে যে। ব্যাপার কি? তার উপর আবার কিনা সেন্ট গায়ে মেখে? কি, মিস ইজিপ্টের সাথে দেখা করার জন্য যাচ্ছ নাকি এত সুন্দর পাঞ্জাবি পরে?'

-'না না তপন, পাঞ্জাবিটা নতুন কিনেছি মিশরে এসে পরব বলে। পাঞ্জাবি পরে তো ডাক্তারি করতে পারব না। তাই পাঞ্জাবির শখ মিটিয়ে নিই।'

সকলে গিয়ে ঢুকলাম ডাইনিং হলে। ডিনারটা সারি তাড়াতাড়ি।

ডিনার করে সকলে ড্যান্স ফ্লোরে উঠে গেলাম। আগেও বলেছি একটা প্রমোদ তরীতে যা থাকার কথা সব আছে এই জেসমিনে। একটা তলা জুড়ে ড্যান্স ফ্লোর। নানা রকমের রঙ

বেরঙের আলো জলছে নিভছে। মৃদু মন্দ মিউজিক বাজছে - মিশরীয় মিউজিক। মিউজিকের মধ্যে ছন্দ আছে অ্যারাবিয়ান ছন্দ। মাদকতা আছে। ডি জে টাইপের। তবে আমাদের মতো নয়। ওদের ধরণ- ওদের মতোই। ড্রিঙ্কস - ফ্রুট জুস সার্ভ করেছে বয়গুলো। সব স্মার্ট ড্রেস। সাদা সার্ট। কালো প্যান্ট। মাঝে মাঝে টুং টাং শব্দ - গ্লাস আর বরফের। তবে যে যাই খাবে পয়সা দিয়ে কিনে খেতে হবে। দামও একটু বেশি। চারিদিকে একটা স্বপ্নিল পরিবেশ। আমরা চারপাশে রাখা সোফায় গিয়ে বসলাম। দীপালী, ভারতী, সুচেতা বৌদি, শ্যামলী বৌদিরা সব একদিকের সোফাগুলো দখল করে বসেছে। অন্যদিন তো ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে। আজ কেন মহিলারা দল বেঁধে একত্রিত হল ঠিক বোধগম্য হল না। ওরা সকলেই ফলের রসের গ্লাস হাতে।

এর মধ্যে ঘোষণা করলেন ফ্লোর ম্যানেজার, 'আপনাদের মধ্যে এখনই মনোরঞ্জনের জন্য আসছেন মিস ইজিপ্ট— তাহমিনা।'

আমরা সচকিত। কোনদিক দিয়ে কেমন ভাবে কোন পোশাকে প্রবেশ করছে তাহমিনা। হলের সব আলো নিভে গেল। মিউজিক থেমে গেল। ক্ষণিকের নীরবতা। আবার মুহূর্তে জ্বলে উঠল আলো। দেখি মাঝখানে স্পটলাইট পড়েছে তার মাঝে দাঁড়িয়ে তাহমিনা। কিন্তু একি? কালো বোরখায় নিজেকে সম্পূর্ণ ঢেকে দাঁড়িয়ে। আপাদমস্তক ঢাকা বোরখায়। হতাশ হলাম সকলে, অবাক হলাম সকলে। তাহলে কি এই বোরখা পরেই ডেলি ড্যান্স! তা কি করে সম্ভব!

আমাদের সম্বিত ফিরে পেতে দেরি হল না। এটাও একটা স্টান্স হয়ত। খুব জোরে মিউজিক বেজে উঠল। অতি দ্রুততায় তাহমিনা তার বোরখা খুলে ফেলল—তার পুরুষ সঙ্গীটির হাতে বোরখাটি দিয়ে দিল। নিচে একটা ঘাগরি ও উপরে এক টুকর কাপড়ে স্বল্পবসনা তাহমিনা—প্রায় অনাবৃত শরীর। উদর নৃত্যে যেমন পোশাক হওয়া উচিত ঠিক তেমনই, ঠিক ততটাই।

উদর নৃত্য শুরু করল সঙ্গে সঙ্গে। একথা বলতেই হবে যে, যা ধারণা করেছিলাম—দেখে মনে হচ্ছে তার চেয়েও যেন বেশি সুন্দরী তাহমিনা। যেমন লম্বা তেমনি স্লিম তেমন তার গায়ের রঙ। যেন স্বর্গের অপ্সরা নেমে এসেছে ধরণীতে—ফ্লোটেল জেসমিনে। তার শরীরের উপর নানা রঙের আলো আছড়ে পড়ছে। আলো ঘুরছে দর্শকদের মধ্যেও। উচ্চগ্রামের কড়া মিউজিকে বেলি ড্যান্সের কসরৎ দেখাচ্ছে নাচের ছন্দে। সত্যি অপরূপ।

ঘুরে ঘুরে নেচে চলেছে তাহমিনা। নাচতে নাচতে আমাদের পাশ দিয়ে ঘুরে যাচ্ছে। অবাকও হচ্ছি এই ভেবে যে এত পর্দানশীন দেশ মিশর। খুব কড়াকড়ি শুনেছি। দেখেছিও এ ক'দিন সর্বত্র—মিশরে কোথাও এমন সংক্ষিপ্ত পোশাক পরে বেলি ড্যান্স হতে পারে ভাবতেই পারিনি। একেই হয়ত বলে বৈপরিত্বের জয়ধ্বনি। ক্রমেই ওর নাচের মুদ্রা আর গতিতে

পরিবর্তন ঘটতে লাগল। রাত বাড়ছে তার সঙ্গে লাস্যময়ী তাহমিনার নাচের ভঙ্গিমা আর মাদকতা হয়ে উঠেছে ইঙ্গিতপূর্ণ। তাহমিনা হয়ে উঠেছে উত্তেজনায় বাঁধনছাড়া এক দুরন্ত দুর্দান্ত দুঃসাহসী ময়ুরী। শরীরের প্রতিটি বাঁকে আহ্বানের উত্তেজনা।

প্রায় এক ঘন্টা নাচের পর সে আমাদের দিকে ঈশারা করছে, আহ্বান জানাচ্ছে ওর সঙ্গে নাচার জন্য। ওর শরীরে উত্তাল ঢেউ - যেন কোনও এক সাইক্লোন। দীপালী দেখি আমার দিকে তাকাচ্ছে। আমি ওকে ঈশারায় বোঝালাম, আমি ভিডিও করছি। আমি ওর সঙ্গে নাচতে পারব না। আমি ব্যস্ত। অন্য কাউকে বল সঙ্গ দিতে। কেউ আর সাহস করেনি ওর সঙ্গে নাচতে। তবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত তালি দিয়ে সঙ্গ দিল চন্দন ঘোষাল, ভাস্করমণি, অমিতাভ ভট্টাচার্য। তাহমিনা চেয়েছিল কেউ এগিয়ে যাবে ওর দিকে, ওর সঙ্গে নাচবে। কেউই এগিয়ে গেল না। একটু যেন নিরাশ হল তাহমিনা। হতাশ হল তাহমিনা। ও চেয়েছিল কেউ আসুক আমাদের মাঝ থেকে ওর পাশে ওর সঙ্গে।

আমাদের দলের অনেকে আমাকেই এসে সাধল ওর সঙ্গে নাচতে। সবাই জানে তাহমিনার সঙ্গে নাচলে আমিই একমাত্র নাচতে পারব। ইচ্ছে থাকলেও সাহস হল না। ওর যা গতি আর নাচের যে ধরণ আমি পারব বলে মনে হল না। তাই এগোলাম না। বেশ একটু হতাশ হল তাহমিনা। তাহমিনা তো জানে না যে এটা ডাক্তারদের দল। এরা কেউ নাচতে জানে না। নাচতে জানলেও অনভ্যাসে ভুলে গেছে।

বেশ বুঝলাম এত সাহস নেই কারও যে তাহমিনার সঙ্গে নাচবে। আসলে ওর যা নাচের দক্ষতা বা ক্ষিপ্রতা ও ভঙ্গিমা সেখানে আমাদের কারও পক্ষেই এই দুঃসাহস দেখানোর অবস্থা ছিল না। যাই হোক প্রায় আরও এক ঘন্টা ধরে নাচার পর তাহমিনা শেষ করল। এরপর এল ওর পুরুষ সঙ্গী। সেও তার নাচ শুরু করল। সেও অদ্ভুত ধরনের এক রকম নাচ পরিবেশন করল। তার পরিধেয় পোশাক গোল হয়ে ফুলে উঠছে চারিদিকে আর নাচের সঙ্গে নানা আকার ধারণ করছে কড়া মিউজিকের সাথে। এরপর তার নাচ শেষ হল। সকলকে অভিবাদন জানিয়ে শেষ করল নৃত্যানুষ্ঠান। তারপর তাহমিনা আবার বোরখা পরে নিল। বাইরে রাখা গাড়িতে ওর সঙ্গীর সাথে মাঝরাতে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। যেমন অন্ধকার থেকে এসেছিল তেমন অন্ধকারে ফিরে গেল হয়তো।

তখনও সোফায় বসে বসে ভাবছি মিশরে একটি সুন্দর স্মরণীয় সন্ধ্যা কাটালাম, এমন সময় দীপালী এসে পিছন থেকে চিমটি কেটে বলে উঠল, 'কি তোমার ঘোর কাটেনি এখনও? ঘরে ফিরবে না এখানেই বসে আজ রাত কাটাবে?'

ওর চিমটিতে ঘোর কাটল সত্যি। আমি একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়েই ওর কথায় বললাম, 'ঘোর? ঘোর আবার কিসের? সব তো ঠিকই আছে। হ্যাঁ চল, ঘরেই তো যেতে হবে।'

দীপালীকে বললাম, ‘একথা স্বীকার করতেই হবে দীপালী, দৈহিক সুষমায় বল, আর নাচের ক্ষিপ্রতায় বল মিশরীয় মেয়েদের মত বেলি ড্যান্স আর কেউ পারবে বলে মনে হয় না। আর যাই বল মিশরীয় মেয়েদের মতো এত সুন্দরী আর পৃথিবীতে কোথাও নেই। ফিজিক্যাল ফিটনেসে পারবেই না কেউ। শরীরে এক ফোঁটা মেদ নেই, খেয়াল করেছ?’

দীপালী বলল, ‘হ্যাঁ, তুমি এখন মেয়েটির শরীরের অ্যানাটমি নিয়ে গবেষণা কর। কোথায় কোথায় কতটুকু মেদ আছে ভালো করে দেখ। তার মাপজোক নাও। রাত কটা বাজে সে খেয়াল আছে? কাল সকালে আবার উঠতে হবে— ছুটতে হবে। আমি চললাম।’

কথা না বলে দীপালীর দিকে একনজর তাকালাম আর সোফা ছেড়ে উঠে পড়লাম। আমরা ফ্লোটেল কেবিনে ফিরে গেলাম। কাল আবার ভোরে উঠতে হবে। এ রাতেও ডায়েরি লেখা হল না।

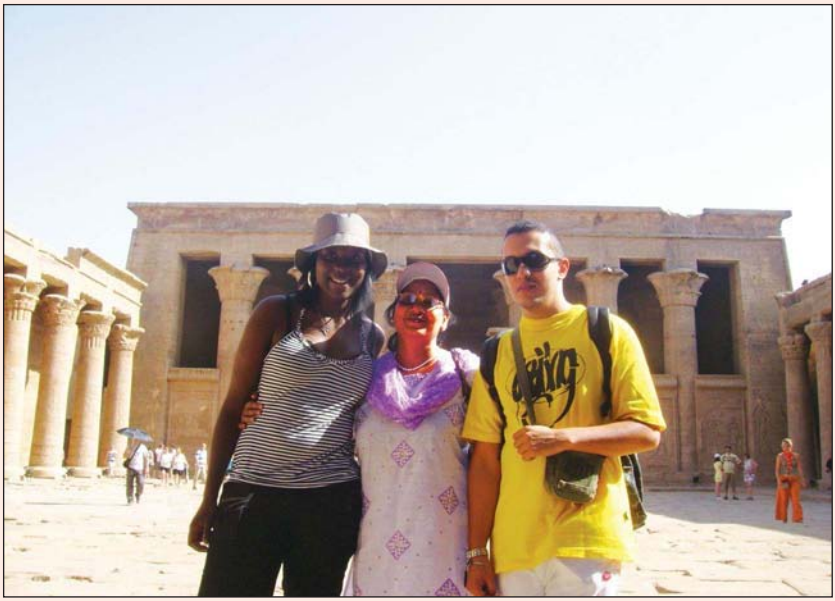

এডফূ টেম্পলের সামনে ডাঃ দীপালী বিশ্বাস

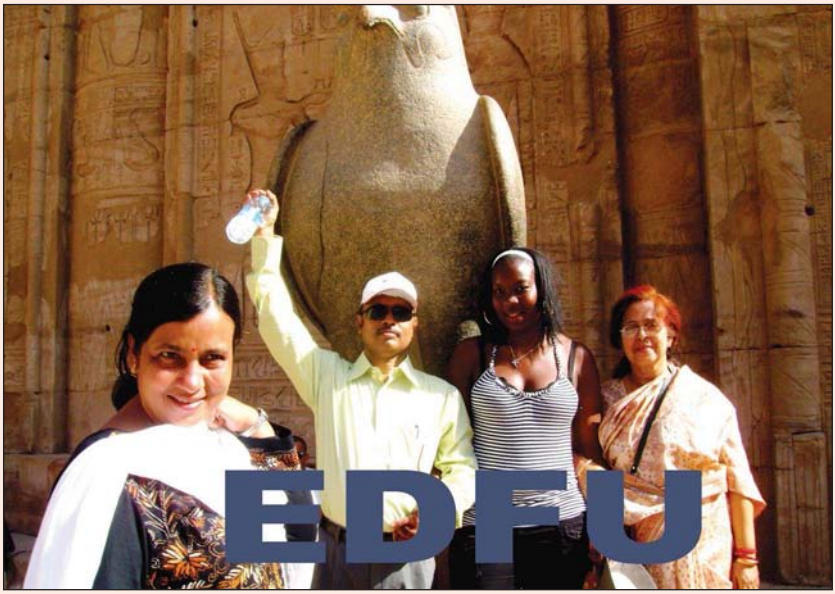

এডফূ টেম্পলের সামনে লেখক

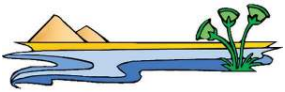

এডফু
Edfu

সকালে ব্রেকফাস্ট হতেই গাইড সকলকে জড়ো করল এক জায়গায়। একটা নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিল। কিন্তু যা বলল তাতে মনে হল এখন আমাদের এমন এক ভয়াল জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে সেখানে যেন পদে পদে বিপদ। সকলকে একত্রে থাকতে হবে জোটবদ্ধ ভাবে। কেউ যেন দলছুট হয়ে বিচরণ না করি। গন্তব্য এডফু। এডফুর মন্দিরে নিয়ে যাবে আমাদের। সেখানকার এই রোমহর্ষক বর্ণনা।

গাইড বলে চলল, 'ওখানে গুন্ডা বদমাইশরা পর্যটকদের থেকে চুরি ছিনতাই পকেটমারির চেষ্টা করে। একা পেলে ছুরি চাকু ভোজালি চালাতে দেরি করে না। অনেক পর্যটক বেশি পাকামো করতে গিয়ে খুন হয়েছে। তাই দল বেঁধে থাকা দরকার। ওখানে ওদের নজর আপনার মানিব্যাগ আর পাসপোর্টের দিকে। দরকারের বেশি টাকা নেবেন না। ফ্লোটেলে রেখে যান। ওখানে গিয়ে নানান সস্তা জিনিস কেনার প্রলোভন দেখাবে। লোভে পা দেওয়া চলবে না। সস্তা জিনিস দেখানোর নাম করে কোন গলিতে নিয়ে কোনও ঘরে আটকে দিলে হয়ে গেল। আন্ডারপ্যান্ট পরিয়ে রাস্তায় ছেড়ে দেবে। সব নিয়ে নেবে- সর্বস্বান্ত করে দেবে। এখানে পুলিশ বা এরকম কারও দেখা পাবেন না যে আপনাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে। একা একা কোন পুরুষ মানুষ পেলে দালালরা তাকে মিশরীয় মেয়েদের ফটো অ্যালবাম দেখাবে। নানা রকম প্রলুব্ধ করবে। বডি ম্যাসাজ থেকে কমপ্লিট রিলাক্সেশন সব রকম সার্ভিসের আশ্বাস দেবে। আর মিশরীয় মেয়েদের পরিষেবার লোভে এই সকল দালালদের খপ্পরে পড়লে তো হয়েই গেল। খালি হাতে জেসমিনে আসতে হবে। তারপর ধার দেনা করে বাড়িতে ফিরতে হবে।'

এসব শুনে অমিতাভ তো খ্যাক খ্যাক করে উঠল, 'এতই যখন বিপদ তা হলে ওখানে যাওয়ার কি দরকার আমাদের?'

ভারতী, শ্যামলীদিরও একই কথা, 'যাব না তা হলে ওখানে।'

দীপালী একটু ঔৎসুক্য নিয়ে বলল, 'আগে চলোই না, কি আছে ওখানে আর কি হয় ওখানে দেখি।'

গাইড বলল, 'আমাদের নিয়ম মেনে চলবেন। কোন সমস্যাই হবে না। সতর্ক করে দেওয়া আমার কর্তব্য।'

আমি সাহস দিয়ে বললাম, 'চল। ট্যুর প্রোগ্রামে আছে যখন যাবই। একটু সাবধানে থাকতেই এত কথা বলছে গাইড। সাবধানে থাকলেই হল। দেখি কে কি করে। কিচ্ছু হবে না। এত ভয় করলে চলে? আরে মরতে তো একদিন হবেই। চল, আমি বুঝে নেব।'

আমি আর দীপালী প্রথম টাঙ্গাতে উঠলাম। আমাদের দেখা দেখি সকলেই দু'জন দু'জন করে এক একটি টাঙ্গায় উঠল ভয় কাটিয়ে। আমি দেখেছি এসব জায়গায় যে কেউ একটু ভয় কাটিয়ে দিলেই সবাই ফাইটিং ফিট। মূলত অনেক মানুষের মধ্যেই সাহস নামক শক্তিটি লুক্কায়িত অবস্থায় থাকে। তখন তাকে ভীতু বলে অভিহিত করা হয়। সাহসটাকে জাগিয়ে দিতে হয়। সাহস জাগিয়ে দিলেই ওই আপাত ভীতু মানুষটি অনেক অসম্ভব কিছু ঘটিয়ে ফেলতে পারে। অনেক দুঃসাহসী কাজ করে ফেলতে পরে। পৃথিবীতে এমন নজির অনেক আছে। আর আমি ভয় কাকে বলে জানিনা। বুদ্ধি আর সাহসের সামনে যে কোনও ভয়ই নতজানু হতে বাধ্য। মোট দশটি টাঙ্গা। আমরা আঠারো জন নয়টা টাঙ্গায়। শেষের টাঙ্গায় গাইড। একটুও যে চিন্তা ছিল না তা নয়। তবু সতর্ক থাকলাম। চোখ কান খোলা রাখতে তো ক্ষতি নেই।

সকাল বেলায় টাঙ্গা চড়ে বেশ মজাই পাচ্ছিলাম। একটা তেজি ঘোড়া লাফাতে লাফাতে গলায় ঘন্টি বাজাতে বাজাতে নিয়ে চলল আমাদের দুজনকে। টাঙ্গাগুলোও বেশ সাজানো রঙচঙওয়ালা। রোদ না লাগে সে জন্য উপরে ছোট্ট একটা সুন্দর সাজানো ছাউনি। বেশ দুলকি চালে চলছিলাম ঘোড়ার খুরের আওয়াজে সকালের ঠান্ডা বাতাসে একটা হালকা আতঙ্কের শিহরণ নিয়ে। যেন কোন অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়েছি। তাও একেবারে সামনের টাঙ্গায় আমি আর দীপালী। আমাদের দুজনের হাতে দুটো খোলা তলোয়ার থাকলে বেশ মানাতো পরিবেশের সাথে। একটা যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব এসে যেত পুরো টাঙ্গার কনভয়ে। বিপদ যদি কিছু হয় তো হবে আগে আমাদের হবে। কুছ পরোয়া নেহি। চল।

কুড়ি ত্রিশ মিনিটে পৌঁছে গেলাম এডফু মন্দিরের মূল ফটকে। বিরাট গেট। ওখানেই টাঙ্গাওয়ালারা নামিয়ে দিল আমাদের দলকে। চারিদিকে একবার দেখে নিলাম।

মন্দিরে নেমে ভয় কোথায় পালাল! হোরাসের মন্দির দেখতেই ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। সকালে মন্দির গায়ে সূর্যের আলো পড়েছে। পিছনে মিশরের নীল আকাশ। দেখার মত দৃশ্য। ফারাও টুটমোস-৩-এর সময়ে এটা নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরটি হোরাসের মন্দির। হোরাস হল আকাশের দেবতা।

এডফু নীলনদের পশ্চিমতীরে এসনা ও আসোয়ানের মধ্যবর্তি স্থানে এর অবস্থান। আরবি ভাষায় উচ্চারণ এডফু, কপটিক ভাষায় বলা হয় ইডফু আর ফরাসি ভাষায় এডফোউ।

Edlfu: Egyptian, Arabic- pronounced as Edfu, In Coptic Language: vars (Sahidic/Bohairic) also spelt Idfu and in modern French as Edfou, situated on the West Bank of the Nile River between Esna and Aswan.

কয়েক শত বছর ধরে এডফু মন্দিরটি মরুভূমির ১২ মিটার (৩৯ ফুট) নিচে ও কিছু অংশ নীলনদের পলিমাটির নিচে চাপা পড়ে ছিল। স্থানীয় লোকজন ওই মন্দিরের উপরেই বাড়িঘর তৈরি করে বসবাস করতে শুরু করে। এডফু মন্দিরের তোরণের সামান্য কিছু অংশ কোথাও কোথাও দেখা যেত। ১৭৯৮ সালে কিছু ফরাসি বিশেষজ্ঞ এটির সন্ধানলাভ করেন। ১৮৬০ সালে অগাস্টে মারিয়েটের নেতৃত্বে একদল ফরাসি খননকারি পুরো এডফু মন্দিরটি মুক্ত করেন।

এডফুর পাঁচ কিলোমিটার দক্ষিণে নাগা এল গনেইমাতে প্রাচীন পিরামিড দেখতে পাওয়া যায়। এই পিরামিড লাল রঙের স্যান্ড স্টোনের তৈরি এবং উচ্চতা ৫.৫ মিটার। এ পিরামিড তৃতীয় রাজবংশের রাজা হুনির বলে ধারণা করা হয়। ২০১০ সালে চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ওরিয়েন্টাল ইন্সটিটিউট এর গবেষণায় জানা গেছে বিশদ তথ্য।

সমগ্র মিশর জুড়েই হোরাসকে দেখা যায়। বহু মন্দিরে তার মুর্তি বা অংকনচিত্র খোদাই করা। এক এক মন্দিরে হোরাসকে এক এক রূপে পাওয়া যায়। এখানে যেমন গ্রানাইটে তৈরি। হোরাসকে দেখা হয় সূর্যের পুত্র রূপে। হোরাস উন্নতি ও জীবনের দেবতা। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে হোরাসকে পুজো করত। কোন ফারাও অসুস্থ হয়ে পড়লে হোরাসের মুর্তি তার মন্দিরে স্থাপন করলে সুস্থ হয়ে যেত ও পুনরায় জীবন ফিরে পেত।

এই এডফু মন্দিরে মূল ফটকের দুই পাশে হোরাসের মুর্তি। দুটি বিশাল বেদির উপর বসানো। মাথায় সূর্যের প্রতিকৃতি দুটি চাকতির মত।

হোরাস নিয়ে নানা কাহিনি প্রচলিত আছে মিশরে। হোরাসকে নিয়ে যত গবেষণা হয়েছে ও হচ্ছে প্রাচীন মিশরের আর কাউকে নিয়ে এত গবেষণা হয়নি এবং এমন সব অজানা কাহিনি বের হচ্ছে - উত্তেজক রোমহর্ষক। হোরাসের জন্মসূত্র নিয়ে মিশরের নানা প্রান্তে নানা গল্প প্রচলিত রয়েছে। পৃথিবীর দেবতা যেব। যেব-এর ঔরসে আকাশের দেবী নাট-এর গর্ভে হোরাসের জন্ম। হোরাস যেবের পঞ্চম পুত্র। হোরাসের কাঠের এবং ব্রোঞ্জের মূর্তি কোন কোন মন্দিরে দেখতে পাওয়া যায় মিশরে। কোন কোন মিশর বিশেষজ্ঞ এমনও বলেন যে হোরাস আইসিস ও ওসিরিসের ভাই। আবার এটাও বলা হয় ওসিরিসের ঔরসে আইসিসের গর্ভে হোরাসের জন্ম। আসলে কালের গর্ভে অনেক তথ্য বিকৃতিও ঘটে।

ভিন্ন মতানুসারিরা বলেন হোরাস নাকি হাথোরেরর গর্ভজাত সন্তান। হাথোর হচ্ছে প্রেমের ও সুন্দরের দেবী। আবার কেউ কেউ এও বলেন হাথোর আসলে হোরাসের স্ত্রী। গাইড বলে যাচ্ছিল এসব কাহিনি। আর আমরা সব মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছিলাম। হোরাসকে নিয়ে অনেক রকমের কাহিনি প্রচলিত আছে মিশরে। মিশরের বিভিন্ন মন্দির গাত্রের লিপি থেকে নিরন্তর চেষ্টা চলছে এই বহুল আলোচিত দেবতা হোরাসের সঠিক পরিচয়ের রহস্য উদঘাটনের। বুঝলাম প্রাচীন মিশর নিয়ে মানুষের এ আগ্রহ নিরন্তর চলতেই থাকবে। যতক্ষণ এ সকল রহস্যের অবসান না হচ্ছে গবেষকদেরও দিনরাত মাথা ঘামিয়েই চলতে হচ্ছে। গবেষণা চলবে হোরাসকে নিয়ে।

এডফুতে একটি গল্প চালু আছে—মমিকে নিয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হত প্রকাশ্যে সকলের সামনে। যে সকল উত্তরাধিকারি থাকত তারা মমির মুখে, নাকে ও চোখে হাত দিয়ে তার জীবন ফিরিয়ে দিত - যেন সে মৃত্যুর পরও খেতে পারত, দেখতে পারত ও গন্ধ নিতে পারত।

মন্দির গাত্রে দেখলাম নানা রকম গাছপালা, জল, ফলমূল ও মানুষের চিত্র বিভিন্ন ভঙ্গিমায় আঁকা আছে। পন্ডিতেরা বলেন, ওরা যে চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করত তা এসব দেখে বোঝা যায়। ফারাওরা দীর্ঘজীবন লাভের জন্য ও মৃত্যুকে পরাজিত করার জন্য এসব চর্চা করত। বেঁচে থাকার জন্যই এই চিকিৎসা শাস্ত্র নিয়ে গবেষণা চলত।

Temple of Edfu is an Egyptian temple located on the west bank of the Nile in Edfu, Upper Egypt. Latin as Apollonopolis Magna, after the chief God Horus, who was identified as Apollo under the interpretatio graeca it is one of the best preserved shrines in Egypt. The termple was built in the Ptolemaic Kingdom between 237 BC and 57 BC. The inscriptions on its walls provide important information on language, myth and religion during the Hellenistic period in Egypt. In particular, the Temple's inscribed building texts provide details of its construction, and also preserve infromation about the mythical interpretation of this and all other temples as the island of Creation. There are also important scenes and inscriptions of he Sacred Drama which related the age-old conflict between Horus and Seth.

Edfu was one of several temples build during the Ptotemaic Kingdom, including the Dendera Temple complex. Esna the Temple of Kom Ombo, and Philae. Its size reflects the relative prosperity of the time. The present temple, which was begun on 23 August 237 BC. initially consisted of a pillared hall, two transverse halls and a barque sanctuary

surrounded by chaples. The building was started during the reign of Ptolemy III Euergetes and completed in 57 BC under Ptolemy XII Auletes. It was built on the site of an earlier, smaller temple also dedicated to Horus, although the previous sructure was oriented East-West rather than North-South as in the present site. A ruined pylon lies just to the east of the current temple. Inscriptional evidence has been found indicating a building program under the new Kingdom rulers Ramesses I, Seti I and Ramesses II.

Over the centuries, the temple became buried to a depth of 12 metres (39ft) beneath drifting desert sand and layers of river silt deposited by the Nile. Local inhabitants built homes directly over the former temple grounds. Only the upper reaches of the temple pylons were visible by 1798, when the temple was identified by a French expedition. In 1860 Auguste Mariette, a French Egyptologist, began the work of freeing Edfu temple form the sands.

গাইডের কথা অনুযায়ি দেখলাম এখানে কিছু লোক আমাদের চারপাশে ঘুরঘুর করছে। আমরা সকলে সতর্ক ছিলাম। তা ছাড়া যাদের সঙ্গে স্ত্রী আছে বা যাদের সঙ্গিনী বা বান্ধবী আছে ওরা তাদের কাছে ঘেঁসছে না। একলা পুরুষ দেখলেই তাদের কাছে এসে ফিসফিস করছে। আলখেল্লার ভিতরে লুকিয়ে রাখা অ্যালবাম বের করে মিশরীয় মেয়েদের ছবি দেখিয়ে দরদাম করছে-লোভ দেখাচ্ছে।

ডাঃ চন্দন ঘোষালকেও দেখলাম ওদের একজন দালালের সঙ্গে খুব ভাব জমিয়ে কথা বলছে। একবার ভাবছিলাম যে চন্দনদার কোনও মতলব নেই তো। আমরা সকলে এও জানি যে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান ডাঃ চন্দন ঘোষাল। সে কোন কিছুতে ফেঁসে যাবে এটা তো হতে পারে না।

পরে চন্দনদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এত কি কথা বললে ওদের সাথে?'

'আরে এসেছি যখন, জেনে নিতে ক্ষতি কি এদের হালচাল?' বলল চন্দনদা।

চন্দনদাও সেয়ানা খুব। ভীষণ বুদ্ধি রাখে। ওদের উল্টো বোকা বানিয়ে দেবে। ওরা তো জানে না বাঙালির বুদ্ধির কাছে আর সবাই বুদ্ধু।

এবার ফেরার পালা। ভালোই হল সকালের এই এডফুর মন্দির দর্শন, ভালোই লাগছিল সকলের। সকলে একই ভাবে গাইডের কথা মতো দল বেঁধে টাঙ্গার দিকে এগোচ্ছি। একদল হকার যাদের হাতে নানা রকম ছোটো ছোটো মিশরীয় জিনিস ছিল বিক্রির জন্য তারা এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু আমরা এমন ভাব করলাম আমরা কেউই যেন ওদের দেখিনি।

জানি না বুঝি না করে টাঙ্গায় উঠে পড়লাম। আবার সেই ঘোড়ার টুং টাং আওয়াজ করে নাচের তালে তালে টাঙ্গা ছুটে চলল নীলনদের দিকে, আমাদের জেসমিনের দিকে।

সকলেই নেমে জেসমিনের দিকে এগোচ্ছে।

দীপালী আমার পিছন থেকে হাতটা টেনে ধরে বলল, 'দাঁড়াও একটু।। সবাই যাক।'

বলে উঠলাম, 'কেন? সকলেই তো জেসমিনে উঠে পড়ছে।'

ও বলল, 'দেখ না কি করি। এমন সুন্দর সকালবেলা টাঙ্গা আর ঘোড়ার সাথে আমাদের একটা ফটো তুলে রাখব না? আর পাবে কোনদিন এমন স্মৃতি?'

দীপালী ওই টাঙ্গাওয়ালাকে আমাদের ক্যামেরাটি দিয়ে বলল আমাদের দুজনের দুই একটা ফটো তুলে দিতে। টাঙ্গাওয়ালা ক্যামেরা হাতে পেয়ে সে কি খুশি। ঝটপট আমাদের ছবি তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। খুব আগ্রহ করে টাঙ্গাতে বসিয়ে আমদের দুজনের ফটো তুলল। ওর ঘোড়ার পাশে দাঁড় করিয়ে আমাদের ছবি তুলে দিল। ঘোড়ার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বোঝাল ওর ঘোড়াটি ওর কত প্রিয়।

যাওয়ার মুখে হাত পাতল, 'স্যার বকশিশ।'

আমি একটি পাঁচ পাউন্ডের কয়েন ওর হাতে দিতে প্রচণ্ড খুশি। অন্ততঃ তিন চার বার সেলাম দিল। হ্যান্ড শেক করল। আমরাও ওর তৃপ্তির হাসিটা সঙ্গে নিয়ে জেসমিনে উঠলাম। এখনও ওর সেই হাসি মাখা মুখখানা মনে আছে। পর্যটকদের ভীষণ ভালোবাসে মিশরীয়রা।

জেসমিনের রিসেপশানে ঢুকতেই অভ্যর্থনাটা ভালোই লাগল। ঠাণ্ডা ফলের রস আর একটা ছোট তোয়ালে এগিয়ে দিল হোটেল ম্যানেজমেন্টের ছেলেরা। এই গরম থেকে ফিরলে ফলের রসের প্রিপারেশনটাও আলাদা লাগল আর স্বাদে গন্ধে স্পেসাল।

ইতিমধ্যে ফ্লোটেল জেসমিনে প্যারিস থেকে আসা অন্য গ্রুপের লোকদের সাথে আমাদের একটা আলাদা ভাব জমে উঠেছে। বেশ কদিন ধরেই তো আছি ওদের সাথে। আগে মুখোমুখি হলে ছিল শুধু হাসি বিনিময়। এখন যতই দিন যাচ্ছে ততোই ওরা হয়ে উঠছে কত যে চেনা। তাই এখন এক টেবিলে খেতে বসে কত কথা আর অভিজ্ঞতা বিনিময়।

ভাবতেই পারি না এখানে কি আনন্দ আর কি সুখের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে আমাদের সময়টা। বাড়িতে থাকলে প্রতি দিনের চেম্বারেরর রোগী দেখা আর সংসারের একঘেঁয়েমি। সকালে উঠে একসাথে মা, দীপালী আর দুই ছেলে রাজেশ ও মুকেশকে নিয়ে ব্রেকফাস্ট করি। তারপর যে যার মতো চলে যাচ্ছে। ছেলেরা ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। দীপালী ওর চেম্বার করে নার্সিংহোমে যাবে। সেও বাড়ি ফেরে রাত নয়টায়। আমি চেম্বার করে চলে যাব ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন এর নৈমিত্তিক কাজে। সন্ধ্যায় আবার চেম্বার করে ঘরে ফিরতে ফিরতে সেই রাত দশটা। তখন দিনশেষে আবার একবার দেখা হয় মা, দীপালী, দুই ছেলে রাজেশ ও মুকেশের সঙ্গে ডিনার টেবিলে। সারাদিন কারও সঙ্গে কারও দেখা নেই। তবু

বাড়িতে আমি নিয়ম করেছি যে, সকলে অন্তত সকালে ও রাতে একসাথে খাব। তাহলে তো দিনে দুইবার আমাদের দেখা হবে।

মিশর ভ্রমণে দীপালীর সাথে দিনে রাতে চব্বিশ ঘণ্টা এক সঙ্গে আছি এটাই আমার একটা বড়ো পাওনা মনে হচ্ছে। দীপালীর সাথে যেমন করে মিশরে একসঙ্গে এতদিন কাটালাম তা আর কোনদিন হয়ে ওঠেনি নিজের বাড়িতেও। নাইল ক্রুজ বুঝিয়ে দিল জীবনের এক আলাদা স্বাদ, আলাদা পাওয়া। আমার তো মনে হয় যারা মিশর বেড়াতে আসে তাদের এই নীলনদের উপর জাহাজে বেড়ানোটা আলাদা এক সুখ স্মৃতি। ব্যস্ত স্বামী-স্ত্রীদের জন্য আমার বক্তব্য, যদি জীবনের অন্য স্বাদ পেতে চান তবে বাইরে বেরিয়ে পড়ুন দুজন, সংসারের বাইরে কিছুদিনের জন্য। আর যদি সম্ভব হয় তবে রিভার ক্রুজে কয়েকটা দিন, নদীর জলে দুজন ভাসুন। আমার অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি।

নীলনদ

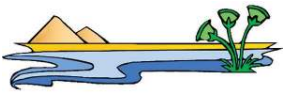

নীলনদ
The River Nile

এই যে নীলনদের উপর ভাসছি এই কটাদিন– প্রাচীন মিশরীয় ভাষায় এই নীলনদকে বলা হত হাপি। কপটিক ভাষায় এই নদীকে বলা হত পিয়ারো বা ফিয়ারা (বোহারিক)। ল্যাটিন ভাষায় বলা হত নাইলাস। পৃথিবীর দীর্ঘতম আন্তর্জাতিক নদী নীলনদ। আরবিতে বলে বাহর-আল-নীল বা নাহর-আল-নীল।

The Nile River - the name comes from
Egyptian Arabic En-Nil
Standard Arabic : An-Nil
Coptic : Phiaro
Ancient Egyptian : Hpi and Jtrw
Biblical Hebrew : Ha-Yeor or Ha-Shihor

নীলনদকে বলা হয় মিশরের প্রাণ। নীলনদের উপকুলেই সৃষ্টি মিশরের মানব সভ্যতা। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৫,০০০ বছর আগে থেকে আদিম মানবগোষ্ঠির বসবাস এই নীলনদের পাশে এবং আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৫,০০০ বছর আগে থেকে মিশর সভ্যতার উন্মেষ এই নীলদের চারিধারেই।

স্বপ্নের মত কাটাচ্ছি দিনগুলো নীলনদের সাথে। সুন্দর এই বিশাল নীলনদ। পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী। ভাবতেই রোমাঞ্চকর লাগছে যে আমরা বিশ্বের দীর্ঘতম নদীর উপর দিয়ে চলেছি। এটির বিশেষত্ব এই যে এই নদী দক্ষিণ থেকে উত্তরে বয়ে চলে তার পর ভূমধ্যসাগরে মিলিত হয়। আমাদের দেশের সকল নদীই যেমন বয়ে চলে উত্তর থেকে দক্ষিণে। এখানে তার বিপরীত– দক্ষিণ থেকে উত্তরে।

নীলনদের বর্ণনা ঃ-
দৈর্ঘ্য ঃ ৬,৮৫৩ কিলোমিটার
চওড়া ঃ সর্বাধিক ২.৮ কিলোমিটার ও
গভীরতা ঃ গড়ে ৮ থেকে ১১ মিটার

এই নীলনদ অনেক ছোট নদী, হ্রদ ও বৃষ্টির জলধারা থেকে উৎপত্তি। এই আন্তর্জাতিক নদীর উৎস স্থলে তিনটি স্রোতের মিলনে সৃষ্টি ঃ

❑ হোয়াইট নীল (আরবি নামে আন-নীল আল আবায়েদ–White Nile)

❑ ব্লু নীল (আরবি নামে আন-নীল আল আয়রাক– Blue Nile)

❑ আটবারা (নাহর আটবারা) (Atbara)

নীলনদের সৃষ্টির সময়কাল ঃ

ধারণা করা হয় প্যালিওজেনি ও নিওজেনি সময়কালে অর্থাৎ ছয় কোটি ষাট লক্ষ বছর থেকে পঁচিশ লক্ষ অষ্টাশি বছর পূর্বে বিভিন্ন ভূতলের ফাটল থেকে নীলনদের উৎপত্তি। এগুলো হল ঃ

❑ সুদান ফাটল (Sudanese Rift System)

❑ মিল্লাত ফাটল (Mellut Fift)

❑ হোয়াইট নীল ফাটল (White Nile Rift)

❑ ব্লু নীল ফাটল (Blue Nile Rift)

❑ আটবারা ফাটল (Atbara Rift)

❑ ছাগ এল নাম ফাটল (Sag Ei Naam Rift)

পরীক্ষা নিরীক্ষায় জানা যায় যে মিল্লাত ফাটলটি প্রায় বারো কিলোমিটার গভীর। হোয়াইট নীল ফাটল প্রায় নয় কিলোমিটার গভীর। ব্লু নীল প্রায় পাঁচ থেকে নয় কিলোমিটার গভীর।

তলানিতে অধঃক্ষেপ জমা হয়ে সেগুলির জলের সংযোজন ঘটে। এর মধ্যে মিশরীয় নীলনদ ও সুদানি নীলনদ মিলিত হয়। ইথিওপিয়া ও বিষুবীয় জলরাশি সংযুক্ত হয়। আটবারা জলস্রোত একলক্ষ কুড়ি বছর থেকে একলক্ষ বছর পূর্বে প্রবাহিত হয়ে নীলনদের সৃষ্টিতে যুক্ত হয়। ব্লু নীলের সংগে মূল নীলনদের সংযোগ নীল ও হোয়াইট নীল বাহর এল আরবে মূল নীলের সংগে মিলিত হয়।

During the Paleogene and Neogene Period (66 million to 2,588 milion years ago) a series of separate closed continental basins each occupied the major parts.

The Mellut Rift basin is bearly 12 kilometers deep at its central part. The White Nile Rift System is about 9 kilometers deep. Blue Nile Rift System is 5-9 kilometers deep.

After sediment deposition was enough all were connected between them. The Egyptian Nile connected to the Sudanese Nile, which captures the Ethiopian and Equatorial waters. The Atbara River overflowed its

closed basin occurred about 100,000 to 120,000 years ago. The Blue Nile connected to the main Nile during the 70,000-80,000 years. The White Nile in Bahr EI Arab and White Nile Rifts remained a closed lake until the connection of the Victoria Nile to the main system about 12,500 years ago.

হোয়াইট নীল হচ্ছে প্রধান উৎস। এটি রুয়ান্ডা বা বুরুন্ডির গ্রেট লেক থেকে সৃষ্ট জলধারা। সমগ্র পূর্ব আফ্রিকায় হোয়াইট নীলের জলের প্রভাব। এটি ভুগর্ভস্থ জলের উৎস। পরে তানজানিয়ার লেক ভিক্টোরিয়া দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলে যায় উগান্ডা ও দক্ষিণ সুদান বরাবর। বাহার-আল গাজাল এবং সোবাট নদী এই দুটি হোয়াইট নীলের মূল উপনদী।

১৯৫১ সালে আমেরিকান জন গাড্ডারড তার দুইজন ফরাসী সঙ্গীকে নিয়ে বুরন্ডির কাজেরা নদী থেকে শুরু করে হোয়াইট নীল হয়ে ৬,৮০০ কিলোমিটার নীলনদে পাড়ি দেন এবং ভূমধ্যসাগরে পৌঁছোন। জন গাড্ডারড-এর এই ৯ মাসের সফরকে ঐতিহাসিক সফর বলা হয়ে থাকে।

২০০৬ সালে ব্রিটেন ও নিউজিল্যান্ডের দুইজন ভূমধ্যসাগরের কোসেট্রা থেকে এর উৎস রাউন্ডার নিউঙ্গি জঙ্গলে পৌঁছোন। এরপর মাত্র ৭০ দিনে ক্যাম ম্যাকলে, নিল ম্যাক গ্রিগার ও গার্থ ম্যাকিনটয়ার এর দল রুয়ান্ডার উৎসে পৌঁছোন।

ব্লু নীল শুরু হয় ইথিওপিয়ার বাহির-ডারের লেক টানাতে এবং ব্লু নীল সুদানের মাঝ দিয়ে প্রবাহিত হয়। ওখানকার মানুষ ব্লু নীলকে আন-নীল আল আযরাক বলে। ব্লু নীল সমগ্র ইথিওপিয়ার নব্বই শতাংশ জল বহন করে। আর নিরানব্বই শতাংশ পলি বহন করে আনে। লেক টানা ছাড়াও ব্লু নীল টেকেযি, আটবারাহ, সোবাট ও অসংখ্য ছোট নদের জলে পুষ্ট হয়। শুষ্ক ও খরার সময় ব্লু নীল পুরো শুকিয়ে যায়। আবার বর্ষায় ব্লু নীল জলে টলমল হয়ে ওঠে। মানুষ ব্লু নীলের জলরাশিকে পবিত্র জল বলে আখ্যায়িত করে।

বিশিষ্ট ভূতত্ত্ববিদ পাসকুলি স্কাটুরো এবং তার সঙ্গী কায়কার ও প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক গরডন ব্রাউন কে সঙ্গে নিয়ে পুরো ব্লু নীলের লেক টানা থেকে ভূমধ্যসাগরের আলেকজান্দ্রিয়ার সমুদ্র তীরে পৌছোন। তারা ৫,২৩০ কিলোমিটার পথ ১১৪ দিনে অতিক্রম করেন।

হোয়াটি নীল ও ব্লু নীল এই দুই জলধারা সুদানের রাজধানী খার্তুমের উত্তরে মিলিত হয়ে নীলনদ নামে উত্তরে এগিয়ে গেছে। ব্লু নীল প্রায় ১,৪০০ কিলোমিটার খার্তূমের উত্তরে মিলিত হয়ে নীলনদ নামে উত্তরে এগিয়ে গেছে। ব্লু নীল প্রায় ১,৪০০ কিলোমিটার খার্তূমের দিকে প্রবাহের পর হোয়াইট নীলের সঙ্গে মিলিত হয়। সুদান মরুভূমি দিয়ে অতিক্রম করার পর মিশরের দক্ষিণ দিকে প্রবেশ করে। সমগ্র মিশরের মাঝ দিয়ে অতিক্রম করে ভূমধ্যসাগরে গিয়ে মেশে।

এই নীলনদের ইংরেজিতে নাম নাইল রিভার। নীলনদের জল কিন্তু নীল রঙের নয়। স্বাভাবিক জলের মত স্বচ্ছ। জলের কোন রঙ নেই।

এই নীলনদ অনেকগুলি দেশের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে। এরা হচ্ছে ঃ

(The Nile River is 6,853 Km long, is an international river as its drainage basin covers the following countries) :-

১. তানজানিয়া (Tanzania)
২. উগান্ডা (Uganda)
৩. রুয়ান্ডা (Rwanda)
৪. বুরুন্ডি (Burundi)
৫. কঙ্গো (The Democratic Republic of the Congo)
৬. কেনিয়া (Kenya)
৭. ইথিওপিয়া (Ethiopia)
৮. ইরিত্রিয়া (Eritrea)
৯. সুদান (South Sudan Republic of the Sudan)
১০. মিশর (Egypt)

পৃথিবীর আর কোনও নদী এতগুলো দেশের মাঝ দিয়ে যায়নি। খার্তুমের উত্তরে হোয়াইট নীল ও ব্লু নীল এর মিলনের পর নীলনদ নামে সুদানে ছয়টি বিশাল জলপ্রপাতের মাঝ দিয়ে অগ্রসর হয়। ষষ্ঠ জলপ্রপাত সাবালোকা। নুবিয়ান মরুভূমির উচ্চতার কারণে নীলনদ খার্তুমের উত্তরে আবু হামেদ থেকে ৩০০ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে মধ্য আফ্রিকার শিয়ার অঞ্চলে বাইউডা মরুভূমির দিকে মোড় নেয়।

নীলনদ আল-দব্বাহতের উত্তরে ঘুরে আসোয়ান জলাশয়ের দিকে প্রবাহিত হয়। এরপর লেক নাসেরে মিশরে প্রবেশ করে। আসোয়ান বাঁধের নিম্ন অঞ্চলে লেক নাসেরের উত্তর প্রান্তে নীলনদ এক লক্ষণীয় প্রবাহে মোড় নেয়। কায়রোর উত্তরে নীলনদ দুই ধারায় বিভক্ত হয়ে যায় ঃ-

❑ রোসেট্রা শাখা (Rosetta)
❑ দামিয়েট্টা শাখা (Damietta)

রোসেট্রা শাখা ও দামিয়েট্টা শাখা যেটা পূর্ব দিকে যায় এবং নীল ডেল্টা তৈরি করে। এ দুটিই ভূমধ্যসাগরে পতিত হয়।

নীলনদের অববাহিকা তিনটি ভাগে বিভক্ত হয় ঃ

❑ উচ্চ নীল অববাহিকা - বুরুন্ডি থেকে সুদানের খার্তুম অঞ্চল
❑ মধ্য নীল অববাহিকা - সুদানের রাজদানী খার্তুম অঞ্চল
❑ নিম্ন নীল অববাহিকা - আসোয়ান থেকে কায়রো হয়ে ভূমধ্যসাগর

The northern section of the river flows north almost entirely through the Sudanese desert to Egypt, then ends in a large Delta and flows into the Mediterranean Sea.

কায়রো থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল-নীলনদের নিম্ন নীল অববাহিকায় জল ও পলির কারণে মাটি হয়ে উঠেছে উর্বর। এই অঞ্চলে প্রচুর শস্য উৎপাদিত হয় সে জন্য অধিকাংশ মিশরীয়দের বাস নিম্ন নীল অববাহিকায়। মিশর নীলনদের উপর পাঁচ হাজার বছর আগে থেকেই নির্ভরশীল। আজও ঠিক তেমনই। আশেপাশের জমিতে পুরোনো পদ্ধতিতেই জল সেচ চলছে। শারীরিক পরিশ্রম করেই জল সেচ দিতে হয়।

নীলনদে প্রমোদ তরী জেসমিন

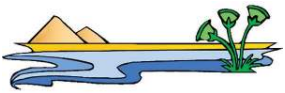

নীলনদে ভ্রমণ
Nile Cruise

আমাদের ফ্লোটেল এগোচ্ছে লাকসারের দিকে। জেসমিনে বসে আমরা লাঞ্চ করতে করতে দেখতে লাগলাম দুপাশের দৃশ্য। দুপাশে ঝকঝক রোদ। বাইরে নিশ্চয়ই খুব গরম। এসি হলঘরে লাঞ্চ করে বাইরের সে গরম আঁচ করতে পারছি না। বরং উপভোগে ব্যস্ত চারিধার। মিশরের গ্রাম আর নীল আকাশ মিশেছে। গ্রামের দৃশ্য আমাদের মত কোথাও কোথাও। নীলনদের ধারে মরুভূমির দেখা পাওয়া যাবে না। গাছপালা ঝোপঝাড়। পশু চারণভুমি। দু চারটি ছাড়া ছাড়া বাড়ি। কোথাও ঘনবসতি দেখলাম না। লোকজনেরও তেমন দেখা মিলল না। মাঝে একটা বাজার পড়ল চোখে। দু'একটি পাকা বাড়ি। কিছু জনমানুষ। দু'চারটি গাধা বা উটের টানা গাড়ি। মালপত্র বোঝাই করা। আলখাল্লা পরা দুই একজন ওই পশু টানা গাড়ির মালপত্রের মাথায় বসে আছে। মিশর মানেই অসংখ্য খেজুর গাছ। মাঝে মাঝে অনেক আখ খেত চোখে পড়ছে।

নীলনদ বেয়ে দক্ষিণ থেকে উত্তরে বয়ে চলেছি আর প্রতি দিন এক একটা নিত্যনতুন জায়গা দেখছি। নদী বক্ষে পাঁচদিনের এত লম্বা ভ্রমণ আর কখনও আমার হয়ে ওঠেনি। আগে শুনেই এসেছিলাম যে পৃথিবী বিখ্যাত রিভার ক্রুজের মধ্যে নাইল ক্রুজ অন্যতম সেরা। কোথা দিয়ে যে কিভাবে দিনগুলো পেরিয়ে গেল টের পেলাম না। এখনও এই যে দুপুরের লাঞ্চ করছি জেসমিনের ডাইনিং হলে বসে আর দেখে চলেছি দুপাশের দৃশ্য আর আমাদের জেসমিন এগিয়ে চলেছে।

পাঁচ দিন আমরা এই নীলনদের উপর ফ্লোটেল জেসমিনে ঘুরছি। পাঁচতলা জাহাজটি। নদীবিহারে সকল ভ্রমণকারীর সমস্ত আমোদ প্রমোদের দিকেই এর খেয়াল রেখেছে। কি নেই এই জাহাজে। একটা আস্ত শপিং মল আছে। যে কেউ যা খুশি কিনতে পারবে। গয়না, পোশাক, স্যুভেনির, খেলনা, খাবার সব মিলবে। বার কাম রেস্টুরেন্ট আছে একটা তলায়। টাকা ফেললে সব পাওয়া যাবে। যে কোন পানীয় থেকে সব ধরনের খাবার। এই জাহাজে সমস্ত রকম আনন্দ আর সময় কাটনোর সব ব্যবস্থা আছে। একটা ম্যাসাজ পার্লার আছে

উপরের তলায়। ম্যাসাজ পার্লারের মেয়েটি এসে বারে বারে আমাদের সকলকে তাদের টারিফ কার্ড আর সার্ভিস সব বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। বলে গেল সব আয়োজন আছে বডি ম্যাসাজ, ফুট ম্যাসাজ, থাই ম্যাসাজ, ডিপ টুস্যু ম্যাসাজ, রিলাক্সেশন ইত্যাদি ইত্যাদি। একটি ফাইভ স্টার জাহাজের ম্যাসাজ পার্লারে যা থাকার কথা তা—সব আছে, সব।

দুপুরটা ফাঁকা পেলাম। একেবারে উপরের তলায় গেলাম সুইমিং পুলে। আমি আর দীপালী। গিয়ে দেখি আগেই মলয়দা পৌঁছে গেছে। ইউরোপ থেকে আসা দুটি বিদেশিনী মেয়ের সাথে রীতিমতো স্নানে মত্ত।

বললাম, 'মলয়দা, আমাদের ডাকলে না কেন? তুমি একা একা চুপি চুপি এসে গেছো?'

মলয়দা চওড়া একটা হাসি দিয়ে বলল, 'এখানে যে তুমি দীপালীকে নিয়ে চলে আসবে ভাবতেই পারনি। এত সুন্দর একটা সুইমিং পুল আছে। তোমরা দু'জন ঠিক হাজির এখানে?'

দীপালী তোয়ালে নিয়ে নেমে পড়ল। আর সাঁতার কাটতে শুরু করল। দেখে আমি লোভ সামলাতে পারলাম না। নেমে পড়লাম আমিও। বিদেশিনী চার পাঁচজন তরুণ তরুণী তারাও আমাদের সাথে যোগ দিল। অনেকক্ষণ আমরা স্নান করলাম। এক ঘণ্টা পর কেবিনে ঢুকেছিলাম।

একটা পুরো ফ্লোর ধরেই আছে ডাইনিং হল। একসঙ্গে অনেক লোক খেতে পারে এখানে তেমন ব্যবস্থা। পুরো জাহাজটাই এয়ারকন্ডিশন্ড।

একটা খোলা জায়গা রেখেছে ওরা বাইরের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখার জন্য। সেখানে আমরা অনেক দিন নীলনদের দু'পাশের দৃশ্য দেখেছি, কখনও দল বেঁধে কখনও আমরা দু'জন। সমগ্র মিশর দেখেছি যেন এই জেসমিনে বসে। কেবিন ঘরের কাঁচের জানলা দিয়েও দেখা যায় বাইরে। নীলনদের দুপাশে শুধু সবুজ আর শ্যামল। গাছ আর বন। কিছু কিছু মানুষ চোখে পড়েছে জমিতে কাজ করতে, উটের গাড়ি নিয়ে যেতে। নদীতে আমাদের জাহাজের পাশ দিয়ে আমাদের মতোই আরও অনেক জাহাজ আসছে যাচ্ছে। বেশির ভাগই প্রমোদ বিহারের জন্য। এখানে আসলে পর্যটকরা নাইল ক্রুজে যাবেই। এত আনন্দ আর কিছুতে আছে বলে মনে হয় না। এক জাহাজেই সব আছে।

কিভাবে যে সময় পেরিয়ে গেছে আমরা বুঝতেই পারিনি। বুঝেছিলাম যেদিন দেখেছিলাম দীপালীর মন খারাপ, সেদিন আমরা জেসমিন ছেড়ে বেরিয়ে গেছিলাম।

একদিনের কথা—দীপালীর হাতে বাইনোকুলার। বাইনোকুলার হাতে নিয়ে কি যেন দেখছে দূরে। ও এর মধ্যেই খাওয়া শেষ করে কখন যে মিশরের প্রকৃতির সাথে যোগ দিয়েছে বুঝতেই পারিনি। বাইনোকুলার দিয়ে ওর ওই মিশর দেখার দৃশ্যটি আমি আমার ভিডিও ক্যামেরায় বন্দি করে নিলাম।

ওর কাছে গিয়ে বললাম 'কোথায় পেলে এ বাইনোকুলার? কাকে খুঁজছ বাইনোকুলারে এত গভীর মনোনিবেশে?'

আমার হাতে বাইনোকুলারটি এগিয়ে দিল। সত্যি তো অপরূপ দৃশ্য। একপাল মেষ চরাচ্ছে দুটি কিশোর বালক। আমার দেখাদেখি ডাঃ অমিয় হাটি, ডাঃ চন্দন ঘোষাল, ডাঃ মলয় সাহা, ভারতী ভট্টাচার্য এরা এসে ভিড় জমাল। ওরাও বাইনোকুলারে দেখবে। কি দেখছি আমরা, নিশ্চয় মজাদার কিছু। দীপালী ওদেরও একে একে দেখাল মেষপাল আর দুই কিশোর বালককে ওর বাইনোকুলারে।

এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে মিশরের ভেড়ার লোম ও ভেড়ার মাংস দুটোই প্রসিদ্ধ। এখানকার ভেড়ার লোমের বেশি অংশ রফতানি করা হয় আমেরিকায়।

মিশরে সাধারণত তিন প্রকার ভেড়া (Sheep of Egypt) পাওয়া যায়।–

❑ রাহমানি (Rahmani)

❑ ওসেমি (Ossimi)

❑ বারকি (Barki)

রাহমানি প্রজাতির ভেড়া খুব বড়ো হয়। এদের লোম লাল ও বেশ লম্বা। ওসেমি প্রজাতির ভেড়া ছোট। এদের লোম আবার সাদা। সাদা ধবধবে লোম খুব বেশি দামে বিক্রি হয়। বারকিও ছোট। এদের গায়ে দুই রকমের লোম পাওয়া যায় সাদা ও বাদামি রঙের। এখানকার বেদুইনদের কাছে বারকি প্রজাতির ভেড়া খুব প্রিয়। এগুলোর প্রজনন খুব বেশি ও যে কোন পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। এখন মিশরে গ্রীষ্মকাল। এ সময়ে বারকির প্রজনন মাস।

আগেই বলেছি মিশরে মাত্র দুটি ঋতু। এপ্রিল মাস থেকে অক্টোবর মাস এই সাত মাস গ্রীষ্মকাল। আর নভেম্বর মাস থেকে মার্চ মাস এই পাঁচ মাস শীতকাল। কেমন শীতকাল জানতে চাইলাম গাইডের কাছে। সে বলল তখন অনেক সময় রাতের তাপমাত্রা পনেরো ডিগ্রী হয় আর দিনে কখনও ত্রিশ ডিগ্রীতে নামে। সে বলল গ্রীষ্মকালে মরুভূমিতে খামসিন নামে এক প্রচণ্ড বালুঝড় হয়। তাপমাত্রা বেড়ে অনেক সময় পঞ্চাশ ডিগ্রীর কাছে পৌঁছে যায়। শুনে তো শিউরে উঠলাম। গাইডও বলল ওই সময় কেউ মরুভূমিতে থাকলে তার খুব বিপদ হতে পারে। মৃত্যুও ঘটতে পারে। মরুভূমির ধুলিঝড়ে পুরো বালুর গভীরে আটকে থেকে চিরতরে হারিয়েও যেতে পারে। এই ধুলিঝড়ে উট অনেক সময় তার প্রভুকে রক্ষা করে তাকে তার পেটের নিচে আশ্রয় দিয়ে।

এর মধ্যে আমরা এসে পড়েছি এসনার লক গেটের কাছে। অনেকগুলো স্লুইস গেট আছে এখানে। জলস্তরের ওঠা নামাও আছে এই এসনার লক গেটে। অনেক সময় জলস্তর হেরফের হলে জাহাজ নিয়ে অপেক্ষা করতে হয় কখন জলস্তর নামবে। আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন তাই অপেক্ষা করতে হয়নি এসনার লক গেটে।

রাতে ডিনারে গেলাম একটু আগে আগেই। আজ ডিনারের মেনুও একটু অন্য ধরনের ছিল। জেসমিনের স্টাফরাও আজ বেশি আন্তরিক মনে হল।

ডিনার শেষে কেবিনে ফিরলাম। ফিরে দেখি দীপালীর মুখটা ভার।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'দীপালী, তোমার কি হয়েছে? মন খারাপ কেন?'

'না কিছু না।' দীপালী বলল।

আমি বললাম, 'আমি তোমার মুখ দেখে বুঝতে পারছি তোমার মন খারাপ। নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে। বল, এ কদিন তুমি তো খুব আনন্দে ছিলে। ফুর্তিতে ছিলে। আজ কি এমন হল?'

'জানো না আজই জেসমিনে শেষ রাত? কাল সকালে আমাদের জেসমিন ছেড়ে চলে যেতে হবে। এই কয়টা দিনে কি আনন্দে কাটালাম আমরা। তাই মনটা কেমন করছে। জেসমিন যেন নিজের বাড়িঘর হয়ে গেছিল এ কটা দিন।'

'সত্যি। মন খারাপ একটু হবেই। যেতে তো হবে তোমার জেসমিন ছেড়ে। ঘুমিয়ে পড়। আমাদের এরপর আলেকজান্দ্রিয়া ট্যুর রয়েছে। তার আগে ভ্যালি অফ কিংস এবং ভ্যালি অফ কুইনস দেখাবে। আরও কত কি।'

সত্যিই জেসমিনের প্রেমে পড়ে গেছিলাম আমরা।

দীপালী ভেজা গলায় বলে চলল, 'যে আতিথেয়তা পেয়েছি এদের! স্টাফদের কি অমায়িক ব্যবহার! হাসি খুসি প্রাণ চঞ্চল এরা। খুব মিস করব এদের অনেক দিন। খুব মিস করব জেসমিনকে।'

কথা বলতে বলতে আমরা ঘুমিয়ে পড়েছি। এ রাতেও আর আমার ডায়েরি লেখা হয়নি মন খারাপের কারণে।

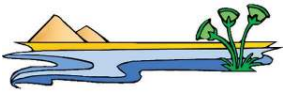

ভ্যালি অফ দি কিংস
The Valley of The Kings

সারারাত চলার পর সকালে আমাদের জেসমিন এসে ভিড়ল লাকসারে। আমাদের নাইল ক্রুজের এখানেই সমাপ্তি। সকালে ব্রেকফাস্ট এর সময় বলে দেওয়া হল যার যার লাগেজ বের করে নিয়ে আনতে হবে এবং ওদের ঘর ছেড়ে দিতে হবে। আমরাও যথারীতি লাগেজ নিয়ে রিসেপশানে হাজির হলাম।

গাইড এসে বলল, 'আপনাদের লাগেজ জেসমিনে রেখেই চলুন ভ্যালি অফ দি কিংস দেখে আসি। ততক্ষণ জেসমিন এখানেই অপেক্ষা করবে। ফিরে এসে লাগেজ নিয়ে যাবেন।'

জাহাজ কর্তৃপক্ষের ছেলেরা এসে আমাদের লাগেজগুলো ওদের একটা ঘরে নিয়ে রাখল। আমরা গিয়ে বাসে উঠলাম। আমাদের বাস ছুটল ঐতিহাসিক ভ্যালি অফ দি কিংস এর দিকে।

ভ্যালি অফ কিংসের অদূরে আমাদের বাস এসে থামল। সেখান থেকে অন্য ছোটো ছোটো গাড়িতে করে সাত আট জনের এক একটি দলে নিয়ে পৌঁছে দিল ভ্যালি অফ দি কিংসের দোর গোড়ায়। ভয়ানক গরম এখানে। পর্যটাকের ভিড়ে থিক থিক করছে জায়গাটা। আজ পর্যটকের যত ভিড় দেখছি এর আগে কোন জায়গায় এত ভিড় দেখিনি। মানুষ যেন উপচে পড়ছে। চারিদিকে যতদূর দুচোখ যায় শুধু বালি আর বালি, মরুভূমি শুধু আর যেখানে দাঁড়িয়ে আছি–ভ্যালি অফ কিংসের তপ্ত থিবস পাহাড়। কোনও গাছপালার চিহ্ন নেই কোথাও, উপরে সূর্য থেকে আগুন ঝরে পড়ছে।

রুক্ষ পাহাড় প্রচণ্ড গরমে রুক্ষতাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। মনে হচ্ছে গরমে চোখ মুখ ঝলসে যাবে। এ কয়েকটা দিন এমন গরম পাইনি কোথাও।

নীলনদের পশ্চিম তীরে থিবস পাহাড়ে এই ভ্যালি অফ দি কিংস। আঞ্চলিক ভাষায় বলে ওয়াড়ি -আল-মুলুক। অষ্টাদশ রাজবংশ থেকে একবিংশতিতম রাজবংশের ফারাওদের সমাধি তৈরি হয় এখানে।

The Valley of the kings:

In Arabic : Wadi al Muluk/ Wadi Abwab al Muluk

In Copti : dzeme, also known as the Valley of the Gates of the Kings.

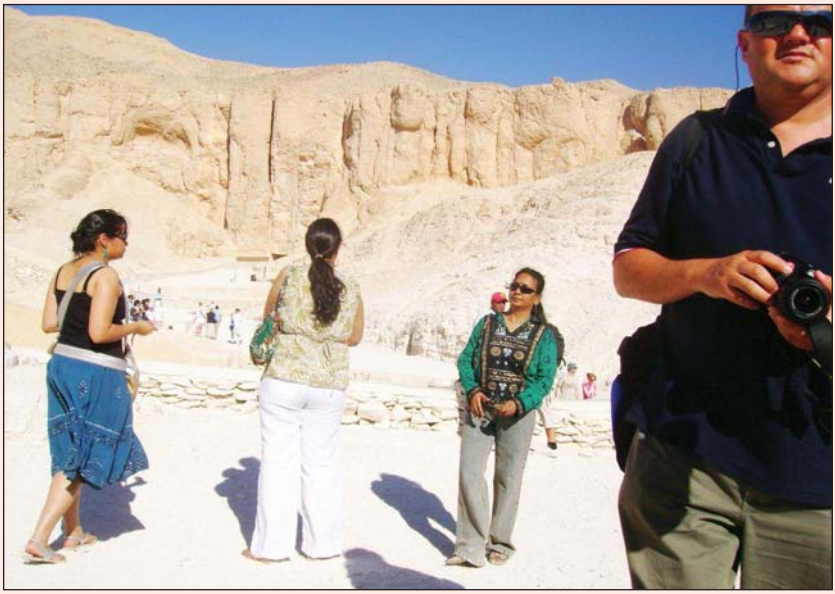

ভ্যালি অফ দি কিংসের সামনে ডাঃ দীপালী বিশ্বাস

খ্রিস্টপূর্ব ষোড়শ শতাব্দী থেকে খ্রিস্টপূর্ব একাদশ শতাব্দী (১৫৩৯ খ্রিস্টপূর্ব থেকে ১০৭৫ খ্রিস্টপূর্ব) পর্যন্ত সময় প্রায় ৫০০ বছরে এগুলির নির্মাণকার্য চলে বিভিন্ন ফারাওদের আমলে। থিবস পাহাড়ের যে দুই উপত্যকা জুড়ে পাহাড়ের গভীরে এই বিশাল সমাধি ক্ষেত্র ঃ-

❑ ইস্ট ভ্যালি (East Valley)

❑ ওয়েস্ট ভ্যালি (West Valley)

এ যাবৎ কাল এখানে খনন করে সর্বমোট ৬৩ জনের সমাধি এবং ১২০টি প্রকোষ্ঠ পাওয়া গিয়েছে।

The wadi consists of two valleys : East Valley and West Valley - where the majority of the royal tombs are situated.

The valley is known to contain 63 tombs and 120 chambers.

যতই ফারাওরা ছিল মহা প্রতাপশালী, যতই ফারাওরা দাবি করত তারা সকলে দেবতা - ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ, মৃত্যুর পর তারা ঈশ্বরের কাছে চলে যাবেন ও ঈশ্বরে বিলীন হবেন, কিন্তু তারাই সমস্যায় পড়লেন তাদের সমাধি নিয়ে। অনেক যত্ন করে ফারাওরা নিজেদের জীবিত কালেই নিজেদের সমাধি তৈরি করেছেন। মৃত্যুর পর তাদের সন্তানেরাও সেগুলো তৈরি করত ও রক্ষণাবেক্ষণ করত। বিপদ বাঁধাল চোরেরা। ফারাওদের প্রচুর সোনা দানা অলংকার ও মূল্যবান দ্রব্যাদি থাকত। চোরেরা সেগুলো চুরি করতে লাগল। যেখানেই সমাধি দেখত সেখানেই এই চোরেরা হানা দিত। আর মূল্যবান মমিগুলো থেকে সোনা দানা চুরি করতে গিয়ে মমিগুলো ছিন্ন ভিন্ন করে দিত।

সেই খ্রিস্টপূর্ব অষ্টদশ শতাব্দীতেও চোরের কি প্রাদুর্ভাব ছিল ভাবলে অবাক হতে হয়। বার বার সমাধির স্থান বদল করতে হত তবু নিস্তার ছিল না চোরদের হাত থেকে। মূল্যবান সামগ্রী বিশেষ করে সোনা চুরি হতে লাগল। মমির ক্ষতি হতে লাগল। এগুলো বাঁচানোর জন্য থিবস এর পাহাড়ের দুর্গম এলাকা বেছে নেওয়া হয়। তবুও কি রক্ষা পেয়েছিল চোরদের হাত থেকে?

এই ভ্যালি অফ কিংসে প্রথম নিজেদের সমাধি নির্মাণ করেন টুটমোস-১ ও আমেনহোটেপ-১ এই দুই ফারাও। টুটমোস-১ থেকে রামেসেস-১১ পর্যন্ত সকল ফারাও এই স্থানে তাদের সমাধি তৈরি করে গেছেন।

অনেক সময় ফারাওদের পরিবার ছাড়াও তাদের বিশেষ অনুসারি, কিছু পুরোহিত ও রাজবংশের সঙ্গে জড়িত প্রভাবশালীদের সমাধিও তৈরি করা হয়েছে। অবশ্য সেগুলি তৈরি হত অপেক্ষাকৃত ছোটো প্রকোষ্ঠে। আমেনহোটেপ-৩ তার সমাধি ওয়েষ্ট ভ্যালিতে নির্মাণ করেন আরও সুরক্ষিতভাবে। পরবর্তিতে তার ছেলে আখেনাটেন তার বাবার সমাধি সরিয়ে অন্যত্র নিয়ে যান।

পাহাড়ের গর্ত খুঁড়ে অনেক গভীরে এই সমাধিগুলো তৈরি করা শুরু হয় অষ্টাদশ রাজবংশের সময়। হাটসেপসুটের সমাধি প্রবেশ মুখের থেকে ২০০ মিটার গভীরে নির্মিত হয়। টুটমোস-৩ ও টুটমোস-৪ এদের সমাধি নির্মিত হয় সমতল থেকে ৯৩ মিটার গভীরে। এত কষ্টসাধ্য খনন করে তার নিজেদের সমাধি তৈরি করত শুধু চোরদের হাত থেকে বাঁচতে।

অষ্টাদশ রাজবংশের শেষে তুতেনখামুন, অয়ি ও হোরেমহেব এদের সমাধিও এখানে তৈরি হয়। এদের সমাধির আবিষ্কার ও উদ্ধার কাজ ছিল কঠিন ও রহস্যময়। বিশেষ করে ১৯২২ সালে তুতেনখামুনের সম্পূর্ণ অক্ষত সমাধি ও মমি উদ্ধারের সংবাদ সারা বিশ্বে আলোড়ন ফেলে দেয়।

এরপর উনবিংশ রাজবংশের রামেসেস-১, রামেসেস-২ মেরেনটাহ এর সমাধি এখানে তৈরি হয়। বিংশতিতম রাজবংশের সেটনাখটে, রামেসেস-৩ থেকে রামেসেস-৯ এর সমাধি, একবিংশতম রাজবংশের পিনেডজেম, হাটসেপসুট, আমেনহোটেপ-২ এদের সকলেরই সমাধি ভ্যালি অফ কিংসে আছে।

Royal Necropolis

The official name for the site in ancient times was The Great and Majestic Necropolis of the Pharaohs in the West of Thebes or Ta-sekhet-maat.

In the Eighteenth Dynasty, only kings were buried within the valley in large tombs. Non-royal persons were buried in a small rock cut chamber close to the tomb of their Pharaohs.

Tomb of Amenhotep III was constructed in the Western Valley and his son Akhenaten moved his tomb's construction to Amarna. At the end of the Eighteenth Dynasty Tutankhamun, Ay, and Horemheb returned to the royal necropolis.

The Nineteenth and twentieth Dynasties number of burials increased with Ramesses II and Ramesses III constructing a massive tomb that was used for the burial of their sons. Thutmose II was buried in Dra Abu el-Naga later his mummy was found in the Deir el-Bahri tomb.

Amun-Re, Mut, and Khunsu left the temple at Karnak to visit the funerary temples of deceased kings on the West Bank and their shrines in the Valley of the kings.

The tombs were constructed by the workers of the village of Deir el-Medina a small wadi between Valley of the Kings and the Valley of the Queens, facing Thebes.

Many of the tombs had been ransacked started from the late Twentieth Dynasty. The tombs of Ramesses VI and Ramesses IX and many more were robbed.

During the civil war which started during the reign of Ramesses XI the tombs were opened, valuables were taken away. The mummies were collected into large caches. One in the tomb of Amenhotep II, contained sixteen, and others were hidden within tomb of Amenhotep I. A few years later most of them were moved to the Deir el-bahri cache containing forty royal mummies. Many of the tombs were robbed soon after their completion.

পাহাড় কেটে সমতলের অনেক গভীরে ৬৩টি সমাধির জন্য সমগ্র মিশরের মধ্যে ভ্যালি অফ দি কিংস এক অন্যতম আকর্ষণ। মূলত ঐতিহাসিক গুরুত্বের দিক দিয়ে মিশরের অন্যতম প্রত্নতাত্ত্বিক আকর্ষণ এই ভ্যালি অফ দি কিংস। বিশেষ করে তুতেনখামুনের সমাধিও সকলকে টেনে আনে এখানে। প্রতিদিন ভিড় উপচে পড়ে পর্যটকদের। দুর্গম ভ্যালি অফ দি কিংসের উদ্‌ঘাটন-অনুসন্ধান এখনও শেষ হয়নি। অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে এখানে সন্ধান চলছে আরও কিছুর। গবেষকরা খেটে চলেছেন দিনরাত। তারা এখানে পড়ে থাকেন দিনের পর দিন আরও নতুন কিছু জানার আগ্রহে।

ভ্যালি অফ দি কিংসের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে নিচে নেমে যে কত গভীরে চলে গেছিলাম তা উপরে ওঠার সময় টের পেলাম। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে গিয়ে বুঝলাম এবার মিশর ভ্রমণের মজাটা হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যাবে। সমাধি ক্ষেত্র দেখতে গিয়ে ভুলেই গেছিলাম কতটা নিচে নামলাম। শুধু দেখব সব নয়ন ভরে- এই ছিল লক্ষ্য। পিছন ফিরিনি একবারও। সমাধিগুলো দেখেছি আর ফিরে গেছি তার পাঁচ হাজার বছর আগের সেই রাজাদের কাছে। কতকগুলো সিঁড়ি ভেঙে নিচে গেছি গুনে দেখিনি। কিন্তু এখন ভাবছি এতগুলো সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠব কি করে! মিশরের প্রাচীন ফারাওদের সাথেই কি এবার থেকে যেতে হবে ভ্যালি অফ দি কিংসে!

তুতেনখামুন মাস্ক

তুতেনখামুনের মূর্তি

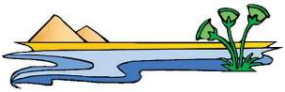

তুতেনখামুন
Tutankhamun

ভ্যালি অফ দি কিংসের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ তুতেনখামুনের সমাধি। বহু মানুষ ভ্যালি অফ দি কিংসে যায় তুতেনখামুনের সমাধির টানে।

তুতেনখামুনের অন্য নাম ছিল আমেন-টুট-আংক, রাজা টুট বলেও তিনি পরিচিত। আসল নাম ছিল তুতানখাটেন অর্থাৎ আটেন দেবতার প্রতিরূপ। আমন দেবতার পুজো চালু করার পর তিনি নাম ধারণ করেন তুতেনখামুন। তুতেনখামুন খ্রিস্টপূর্ব ১৩৪১ এ জন্ম গ্রহণ করেন। ১৩২৩ খ্রিস্টপূর্বে আঠারো বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়। তার রাজত্বকাল বহুল আলোচিত ও বর্ণময়। ১৩৩২ খ্রিস্টপূর্ব থেকে ১৩২৩ খ্রিস্টপূর্ব পর্যন্ত তার রাজত্বকাল ছিল। তার এই রাজত্বকালে তার উপদেষ্টা ছিল হোমেরহেব। হোরেমহেব সব সময় তাকে ছায়ার মত আগলে রাখতেন ও বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনায় সহায়তা করতেন।

Tutankhamun is also spelled with Tutenkh Amen-Amon was an Egyptian Pharaoh of the Eighteenth Dynasty (1332 BC-1323 BC) during the New Kingdom. His original name, Tutankhaten, means living image of Aten, where Tutankhamun means Living Image of Amun. The name Tutankhamun was typically written as Amen-tut-ankh in Hieroglyphic. In Amarna language he is known as Nibhurrereya and is likely the Eighteenth Dynasty King Rathotis who had reigned for nine years.

জানা যায় আমানহাটেপ-৩ রাজা হওয়ার পর একেশ্বরবাদতত্ব চালু করেন। তিনি আটেন দেবতা বা সূর্য দেবতার পুজো শুরু করেন। এতে পুরোহিতদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়তে থাকে।

তুতেনখামুন তার শাসনামলে আমূল পরিবর্তন আনেন। তার বাবা আখেন আটেন আমন দেবতার পুজো বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং আটেন দেবতার পুজো চালু করেন। তিনি তার বাবার সময়ের প্রচলিত আটেন দেবতার পুজো বন্ধ করে দেন, কারণ অনেক পুরোহিত এটা একেবারেই অপছন্দ করতেন এবং পুরোহিতরা ক্রমেই বিক্ষুদ্ধ হয়ে পড়ছিলেন। হোরেমহেবের

উপদেশে তুতেনখামুন এসব পরিবর্তন আনেন। কথিত আছে তুতেনখামুন যখন খুব ক্রোধান্বিত হয়ে পড়তেন তখন নাকি তার উপদেষ্টা হোরেমহেব একমাত্র তাকে শান্ত করতে পারতেন। তিনি আটেন দেবতার পরিবর্তে আমন দেবতার পুজো পদ্ধতির প্রচলন করে জনপ্রিয়তা লাভ করেন ও প্রসিদ্ধিলাভ করেন। সকলের খুব প্রিয় রাজা হয়ে পড়েন তুতেনখামুন।

তিনি থিবসের কারণাকে আমন দেবতার উদ্দেশ্যে একটি মন্দির নির্মাণ করেন এবং অনেকগুলো স্তম্ভও নির্মাণ করেন। কারণাকে আজও হাজার হাজার পর্যটক ভিড় করে। তার বাবার সময়ে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব খারাপ ছিল, পার্শ্ববর্তি দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্কও ভাল ছিল না। তুতেনখামুন দায়িত্বে এসে সার্বিক পরিবর্তন আনেন, পার্শ্ববর্তী দেশের সঙ্গে বিশেষ করে মিতান্নির সঙ্গে সুসম্পর্ক পুনপ্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তার বাবার আমলের রাজধানী আখেনাটেন বা আমারনা থেকে রাজধানী থিবস-এ স্থানান্তর করেন। আখেন আটেনের মৃত্যুর পর নেফারতিতির কথা মত তুতেনখামুনন তার রাজধানী থিবসে স্থানান্তর করেন। এও ধারণা করা হচ্ছে তার সময়ে দুটি যুদ্ধ হয় এবং সেই যুদ্ধও তিনি পরিচালনা করেন।

আমনরহোটেপ-৩ বিয়ে করেন টাডুখিপার সঙ্গে। তার আরও স্ত্রী ছিল। আমনরহোটেপ-৩ এর মৃত্যুর পর তার ছেলে আখেনটেন রাজা হন। আখেনআটেন নিজের বোন নেফারতিতিকে বিয়ে করেন। টায়ির সঙ্গেও তার বিয়ে হয়। আখেনআটেনেরও বহু স্ত্রী ছিল। আখেন আটেনের ছেলে তুতেনখামুন। তুতেনখামুনের মা পশ্চিমাদের কাছে ইয়াংগার লেডি নামে পরিচিত। মাত্র বারো বছর বয়সেই রাজা হওয়ার সাথে সাথে তার আখেসেনামুনের সঙ্গে বিয়ে হয়। আখেসেনামুন ছিলেন তুতেনখামুনের সৎবোন।

জানা যায় আখেসেনামুন দুটি জমজ সন্তান গর্ভে ধারণ করেন। কিন্তু গর্ভধারণের ছয় মাসে ও নয় মাসে প্রসবের কারণে দুটি সন্তানই মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়। তুতেনখামুন তার দুই মৃত সন্তানের মমি তৈরি করেন ও সংরক্ষণ করেন। এই দুটি সন্তানের মমি থেকে গবেষণা করে ও ডি এন এ পরীক্ষা করে পন্ডিতরা এই তথ্য জানতে পারেন।

তুতেনখামুনের মমিতে তার মাথায় একটি ক্ষত চিহ্ন পাওয়া গেছে। বিশেষজ্ঞদের মত তাকে খুন করা হয়েছিল। আবার তার ডি এন এ পরীক্ষা করে জানা গিয়েছে যে তিনি মশা বাহিত রোগ ম্যালেরিয়াতে ভুগতেন। ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে তিনি খুব দুর্বল হয়ে পড়েন। তিনি এতই দুর্বল ছিলেন যে তিনি লাঠি ছাড়া হাঁটতে পারতেন না। রক্তাল্পতার কারণে তার শরীরের হাড় দুর্বল হয়ে যায়। সে জন্য তার মস্তিষ্কের হাড় ভেঙে যায়। তার মৃত্যু নিয়ে তাই নানা রহস্য নানা গল্প।

The mummy of Tutankhamun remains in the Valley of the Kings. howard Carter discovered Tutankhamun's nearly intact tomb in 1992, funded by Lord Carnarvon received worldwide press coverage. It sparked

a public interest in ancient Egypt, for Tutankhamin's mask, now in the Egyptian Museum. He was the son of Akhenaten. His mother was his father's sister and wife, whose name is unknown but positively identified as The Younger Lady.

He was known as Tutankhaten as a prince. Taking the throne name Nebkheperure he ascended to the throne in 1332 BC at the age of nine. His teacher was most likly Sennedjem.

Tutankhamun married his half-sister Ankhesenpaten who later changed her name to Ankhesenamun when he became king. They had two daughters, both stillborn-one daughter was born prematurely at 6 mounths of pregnancy and the other at 9 monthes pregnancy.

Reign :

The king had very powerful adviser General Horemheb, Ay's possible son in law and successor and Ay succeeded Tutankhamun.

Horemheb records that the king appointed him "Lord of the Land" as hereditary prince to maintain law. He also noted his ability to calm the young king when his temper flared.

Tutankhamun reversed several changes made during his father's reign. He ended the worship of the God Aten and restored the God Amun. The ban on the cult of Amun was lifted. The captial was moved back to Thebes and the city of Akhetaten abandoned reinforcing the restoration of Amun he changed his name to Tutankhamun as "Living image of Amun".

The King initiated building projects, in particular at Karnak in Thebes, where he dedicated a temple to Amun. Many Monuments were erected. The traditional festivals were celebrated again, including those related to the Apis Bull, Horemkhet and Opet.

In the reign of Akhenaten the country was economically weak and in turmoil. Diplomatic relations with other kingdoms had been neglected and Tutankhamun sought to restore them, in particular with Mitanni.

Battles with Nubians and Asiatics were recorded in his mortuary temple at Thebes. His tomb contained armor and folding stools appropriate for military campaigns. However given his youth and physical disabilities, which seemed to require the use of a cane in order to walk. He died at the age of 18.

Health and appearance of Tutankhamun :

Tutankhamun was short of built, and was 180cm (5 ft 11 inch) in height. Tutankhamu's body had deformations in his left foot, caused by nerosis of bone tissue. Tutankhamun had to walk with the use of a cane, which was found in his tomb. In DNA tests of Tutankhamun's mummy, Scientists found DNA from the mosquito-borne parasites that cause Malaria. More than one strain of the Malarial Parasite was found, indicating that Tutankhamun contracted multiple malarial infections. Malaria sould have weakened Tutankhamun's immune system and interfered with the healing of his foot. These factors, combined with the fracture in his left thighbone may have ultimately been what killed the young King.

DNA research on Tutankhamun and the mummified remains of other member of his family were done. The results indicated that his father was Akhenaten, and that his mother was one of his father's five sisters. The young king's mother was found through the DNA testing of a mummy designated as 'The Younger Lady' which was found lying beside Queen Tiye. She was a child of Amenhotep III and Tiye-her DNA proved that, like his father Tutankhamun's parents were brother and sister.

Queen Tiye held much political influence at court and acted as an adviser to her son after the death of her husband.

Tutankhamun's wife, Ankhesenamun is known from history that she was the daughter of Akhenaten and Nefertiti, and thus she was her husband's half-sister.

পশ্চিম বিশেষজ্ঞ হাওয়ার্ড কাটার ১৯২২ সালে ৪ঠা নভেম্বর ভ্যালি অফ দি কিংসে তুতেনখামুনের সমাধির খোঁজ পান এবং তার নেতৃত্বে একটি খননকারি দল খনন ও সন্ধানকার্য চালিয়ে যান। লর্ড কারনারভানের পূর্ণ আর্থিক সহায়তায় সমগ্র খনন কাজটি করেন। দীর্ঘ দশ বছরের প্রচেষ্টায় ১৯৩২ সালে তুতেনখামুনের সমাধি ও মমি উদ্ধার করে সুরক্ষার ব্যবস্থা করেন হাওয়ার্ড কার্টার। এটাই প্রথম কোন কফিন ও মমি যা সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়। কারণ এটা চোরদের নজরে পড়েনি বা তারাও এটাকে খুঁজে পায়নি।

হাওয়ার্ড কার্টারের এই অবিষ্কার সারা পৃথিবীতে হৈ চৈ ফেলে দেয়। কারণ এর আগে যত মমি উদ্ধার করা হয় কোনটি অক্ষত অবিকৃত অবস্থায় উদ্ধার করা যায়নি। সবগুলোই চোরেদের খপ্পরে পড়ে ক্ষত বিক্ষত হয়ে যায়। সোনা ও মণিমুক্তো চুরি করতে গিয়ে কফিন ও মমির কি প্রচণ্ড ক্ষতি করেছে ওরা তা জানে না। অনেক মমি কার কোনটি তা পর্যন্ত সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

অত্যাধুনিক পরীক্ষায় জানা গেছে যে তুতেনখামুনের শরীরে অনেক রকম জিন ঘটিত অসুখ ছিল, যেমন মার ফান সিনড্রোম, ক্লিনফেল্টারস সিনড্রোম ও ফ্রলিক সিনড্রোম। বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে নিকট আত্মীয় ও রক্ত সম্পর্কের মধ্যে বিশেষ করে ভাই বোনের বিয়ের কারণে তাদের সন্তানের এসব মারাত্মক অসুখের সৃষ্টি হয়। যেহেতু তুতেনখামুন ও তার পূর্বপুরুষের মধ্যে এই ধরণের ভাইবোনের বিয়ে প্রচলিত ছিল তাই তুতেনখামুন সহ সকলের মধ্যে এই জিনঘটিত রোগের সৃষ্টি হয়েছিল।

তুতেনখামুনের স্ত্রীর গর্ভে দুটি সন্তান আসে কিন্তু তার অকালে প্রসব হয় ও মৃত সন্তান জন্ম নেয়। তুতেনখামুন সৎবোন আখেসেনামুনকে বিয়ে করেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতামত হচ্ছে সেই কারণেই আখেসেনামুন গর্ভে যে দুটি সন্তান ধারণ করেন তাদেরও জিনঘটিত রোগের কারণেই গর্ভপাত হয়ে যায়। দুটি সন্তানই মৃত অবস্থায় প্রসব করেন অথবা প্রসবের পরপরই মৃত্যু হয়।

এভাবেই মানুষের মধ্যে সমাজের নিয়ম নীতির সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষরা দেখেছিলেন যে নিকট আত্মীয়দের মধ্যে বিয়ের ফলে মারাত্মক রোগের সৃষ্টি হয়। অভিজ্ঞতায় লব্ধ জ্ঞানের মধ্য দিয়ে তারাই নিয়ম করে সমাজে নিকট আত্মীয়দের মধ্যে বিয়ে বন্ধ করেছেন।

Although there are some opinions that Tutankhamun was assassinated and some other opinion is that his death was accidental.

Scan taken in 2005 showed that he had suffered a compound left leg fracture before his death and that leg had become infected.

CT images discovered congenital flaws, which are more common among the children of incest. Siblings are more likely to pass on twin copies of deleterious alleles, that is why children of incest more commonly manifest genetic defects. It is suspected that he also had a partially cleft palate– another congenital defect.

Various other possible diseases may be as possible explanations to his early demise, included Marfan syndrom. Whilson-TurnerX-linked mental retardation syndrome. Frohlich syndrome, Klinefelter syndrome, androgen insensitivity syndrome, aromatase excess syndrome in conjunction with sagittal craniosynostosis syndrome. Antiey-Bixier syndrome or one of its variants, and temporal lobe epilepsy.

An accumulation of malformations in Tutankhamun's family was evident from research. Several pathologies including Kohler disease II were diagnosed in Tutankhamun, none alone would have caused death. Genertic testing for STEVOR. AMA1, or MSP1 genes specific for Plasmodium Falciparum revealed indications of malaria in Tutankhamun.

However, their exact contribution to the causality of his death still is highly debated.

As stated above the team discovered DNA from several strains of a parasite proving he was infected with the most servere strain of malaria several times in his short life. Malaria can trigger circulatory shock or cause a fatal immune response in the body, either of which can lead to death. If Tutankhamun did suffer from a bone disease which was crippling, it may not have been fatal. Perhaps he struggled against other congenital diseases until a severe bout of Malaria or a leg broken in an accident was added to him.

A further investigation revealed that it was unlikely he had been killed in chariot accident. Scans found that all but one of his bone fracture, including those to his skull, had been inflicted after his death. The scans also showed that he had a partially clubbed foot and would have been unable to stand unaided, thus making it unlikely he ever rode in a chariot this was supported by the presence of many walking sticks among the contents of his tomb. Instead, it is believed that genetic defects arising from his parents being sibling, complications from a broken leg and his suffering from malaria, together caused his death.

There has been a newly considered theory that some of the tomb images of Tutankhamun leading an army to war depicts that he died in battle in Syria.

তুতেনখামুনের মমি ২০০ কিলোগ্রাম সোনায় মোড়া। তিন স্তরের এই কফিনটি। বাইরের দুটি স্তর কাঠের তৈরি। ভিতরে সোনায় মোড়া। তার মধ্যে সাদা কাপড়ে পেঁচিয়ে মোড়া তুতেনখামুনের মমি। তামাটে গায়ের রঙের। দাঁতগুলো প্রায় কালো রঙ ধারণ করেছে। হাত দুটি বুকের উপর ভাঁজ করে রাখা-চিত হয়ে শোয়ানো। মমির সাথে আছে লাঠি। লাঠিও অবিকৃত অবস্থায় আছে।

তখন সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত একটি সংবাদে সারা বিশ্ব আলোড়িত হয়। এক অদ্ভুত সংবাদ সমগ্র পৃথিবীকে বিস্মিত করে। কেউ কেউ অবশ্য বলেন যে এটাও সংবাদমাধ্যমের এক ধরণের ব্যবসা বা আলোড়ন সৃষ্টির কৌশল। চারিদিকে একটি সংবাদ প্রচারিত হয় যে, হাওয়ার্ড কার্টারের সঙ্গে যে সকল লোকজন তুতেনখামুনের সমাধির খনন কাজে অংশ নিয়েছিল অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তাদের সকলের একসঙ্গে মৃত্যু হয়। তাদের একসঙ্গে মৃত্যু রহস্য আজও উদ্‌ঘাটিত হয়নি। হাওযার্ড কার্টারের মৃত্যু হয় ক্যানসারে। কুসংস্কারবাদীরা বলে যে তুতেনখামুনের অনন্ত ঘুম ভাঙ্গানোর অভিশাপে এদের সকলের এভাবে মৃত্যু হয়েছিল। এ

সকল কুসংস্কারের কথা উড়িয়ে দিয়ে অবশ্য চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলছেন তারা সকলই বিভিন্ন রোগেই মারা যান। প্রায় সমসাময়িক মৃত্যুটা কাকতালীয় অথবা সংবাদের ধুম্রজাল।

With the death of Tutankhamun and the two stillborn children buried with him, the Thutmoside family came to an end. The Amarna letters indicate that Tutankhamun's wife. recently widowed, wrote to the Hittite king Suppiluliuma I, asking if she could marry one of his sons. The letters do not say how Tutankhamun died.

Amkhesenamun became very much afraid, but did not marry her own people as husband. The son of Hittite king Suppilukuuma-1 was killed before reaching his new wife. Rather Ay married Tutankhamun's widow Ankhesenamun and became Pharaoh. A war was fought between the two countries and Egypt was being defeated. The fate of Ankhesenamun is not known, but she disappears from record and Ay's second wife Tey became Great Royal Wife. After Ay's death, Horemheb took over the throne and there initiated a campaign of (damnatio memoriae) condemnation of memory against him. Tutankhamun's father Akhenaten, stepmother Nefertiti his wife Ankhesenamun, half sisters and other family members were also included. Not even Tutankhamun was spared. his images and cartouches were also erased. Horemheb himself was left childless and willed the throne to Paramessu, who founded the Ramesside family line of Pharaohs.

Howard Carter was employed in 1915 by George Herbert 5th Earl of Carnarvon to search and for the Excavation of Tutankhamun's tomb in the Valley of the kings. After a systematic search. Carter discovered the actual tomb of Tutankhamun in November 1922.

King Tutankhamun's mummy is kept in his tomb in the Valley of the Kings. On 4 November 2007, 85 years to the day after Carter's discovery, the 18-year-old Pharaoh was opened to public in his underground tomb at the Valley of the King. The linen-wrapped mummy was removed from its golden sarcophagus to a glass box. The case was designed to prevent the heightened rate of decomposition caused by the humidity and warmth of the tourists.

Tutankhamun was buried in a tomb that was unusually small considering his status. His death may have occurred unexpectedly before the completion of a grander royal tomb, so that his mummy was buried in a tomb intended for someone else.

Towards the end of the 20th Dynasty the Valley of the Kings burial site became systematically dismantled. Tutankhamun's tomb was overlooked and his name might have been forgotten.

5,398 items were found in the tomb, including a solid gold coffin, face mask, thrones, archery bows, trumpets, a lotus chalice, food, wine, sandals, and fresh lines underwear. Howard Carter took 10 years to catalog the items.

Tutankhamun's curse : A rumour of a "Curse of the Pharaohs" persisted for many years emphasising the early death of some of those who had entered the tomb or involved in exploration. George Herbert, 5th Earl of Carnarvon who died on 5 April 1923, 5 months after the discovery of the first step leading down to the tomb on 4 November 1922.

The Lancet, a medical journal made an article that Carnarvon's death had nothing to do with Tutankhamun's tomb. The cause of Carnarvon's death was Pneumonia supervening on erysipelas due to Streptococcal infection of the skin. Pneumonia was thought to be only a complication, arising from the progessively invasive infection, that eventually resulted in multi organ failure. It might have been prone to severe lung infection. The Lancet stated that one acute attack of Bronchitis could have killed him, In such a debilitated state, the Earl's immune system failed by erysipelas.

A study showed that of the 58 people who were present when the tomb and sarcophagus were opened, only eight died within 12 years. All the others were still alive, influding Howard Carter, who died of Lymphoma in 1939 at the age of 64.

The last survivors included Lady Evelyn Herbert, Lord Carnarvon's daughter who was among the first people to enter the tomb after its discovery in November 1922, who lived for a further 57 years and died in 1980, and American archaeologist J. O. Kinnaman who died in 1961, 39 years after that.

তুতেনখামুনের মৃত্যুর পর মিশরের রাজা হন তার সময়ের প্রধান পুরোহিত ও তার অভিভাবক অয়। খ্রিস্টপূর্ব ১৩৫২ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১৩৫১ পর্যন্ত সময় মিশরের রাজা ছিল অয়। খ্রিস্টপূর্ব ১৩৫১ তেই চক্রান্ত করে বৃদ্ধ অয়কে সরিয়ে দেওয়া হয় ক্ষমতা থেকে। এরপর তুতেনখামুনের পরামর্শদাতা হোরেমহেব রানি নেফারতিতির বোনকে বিয়ে করেন মিশরের রাজা হওয়ার জন্য। হোরেমহেব খ্রিস্টপূর্ব ১৩৪৮-এ মিশরের ক্ষমতায় আসেন ও খ্রিস্টপূর্ব ১৩২৮ পযন্ত ক্ষমতায় ছিলেন। হোরেমহেব অষ্টাদশ রাজবংশের শেষ ফারাও।

তুতেনখামুনের কফিন সহ অন্যান্য ব্যবহার্য ও অলংকারাদি কায়রো মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। তার মমিটি অবশ্য ভ্যালি অফ দি কিংসেই আছে পর্যটকদের জন্য।

প্রদর্শনী ঃ-

তুতেনখামুনের ব্যবহার্য জিনিসপত্র নিয়ে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। এ ধরনের প্রাচীন দ্রব্যের প্রদর্শনী বিভিন্ন দেশে বিপুল সাড়া ফেলে দেয়। ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত চলে এ প্রদর্শনী। ১৯৭২ সালের ৩০শ মার্চ থেকে ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বৃটিশ মিউজিয়ামে এই আয়োজন চলে এবং ১৬,০০,০০০ জন দর্শক তা দেখতে আসেন। ১৭ই নভম্বর ১৯৭৬ থেকে ১৫ই এপ্রিল ১৯৭৯ পর্যন্ত আমেরিকার মেট্রোপলিটান মিউজিয়াম অফ আর্ট আয়েজিত এই প্রদর্শনীতে ৮০,০০,০০০ দর্শকের ভিড় হয়। বিভিন্ন সময়ে রাশিয়া, সুইজারল্যান্ড, জাপান, ফ্রান্স, কানাডা, পশ্চিম জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে একই রকম প্রদর্শনীয় আয়োজন করা হয়। এ ধরণের প্রদর্শনীর ইতিহাস সমগ্র পৃথিবীতে বিরল।

Exibition :

The most famous travel of artefacts in the world was tour of the relics from Tutankhamun's tomb. It was the best known world exhibiton tour in so many countries of the Treasures of Tutankhamun from 1972 to 1979. First exhibition shown was in London at the British Museum in 1972 from 30 March until 30 September. More than 16,00,000 visitors saw the exhibiton, some queuing for up to eight hours. It was the most popular exhibition in the Musseum's history of the world.

The Metropolitan Museum of Art organised the U. S. exhibition, which started from 17 November 1976 and continued upto April 1979. More than 80,00,000 visitors attended. The exhibtion moved on to many other contries, including Aurstalia, the United States, Soviet Union, Japan, France, Canada, Switzerland and West Germany.

ভ্যালি অফ দি কুইন্স

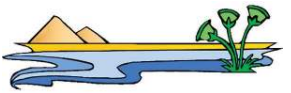

ভ্যালি অফ দি কুইনস
The Valley of the Queens

দীপালী এত পরিশ্রম করতে পারে সেও দেখি ক্লান্ত হয়ে গেছে। এত ক্লান্তি লাগছে, কষ্ট হচ্ছে কিন্তু কারও ঘাম নেই শরীরে, এটা শুধু বাতাসের কম আর্দ্রতার জন্যই। দীপালীর মনের জোর প্রচুর। আমাকে ধাক্কা দিয়ে মনে একটু জোর দিতে চাইল। বলল, 'কি হল? কষ্ট কিসের, বেরিয়ে আবার ভ্যালি অফ দি কুইনস দেখতে হবে।'

আমি কষ্ট আর বিরক্তি নিয়েই বললাম, 'এর পরেও আবার ভ্যালি অফ দি কুইনস? পারছি না আর।'

একগাল হেসে দীপালী বলল, 'তাহলে তুমি একা একা গাড়িতে বিশ্রাম নিও। আর আমি মলয়দা, অমিতাভদার সাথে ভ্যালি অফ দি কুইনস দেখে আসব। ঠিক আছে?'

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে আমি ঘাড় ফিরিয়ে দাপালীর দিকে চেয়ে বললাম, 'আমাকে কি বোকা ভেবেছ না পাগল ঠাওরেছ? আমি বাসে উঠে বাসের মধ্যে থাকি আর তুমি ওদের সাথে মজা করে ভ্যালি অফ দি কুইনস দেখবে? সে হবে না। যত কষ্ট হোক আমি যাব।'

উপরে উঠতে গিয়ে বুঝতে পারলাম অতীতে ফিরে যেতে গেলে কত কষ্ট করতে হয়। সূর্যের প্রখর আলো তীক্ষ্ণ বর্শার মত আছড়ে পড়ছে রুক্ষ পাহাড়ের গায়ে, আমাদের গায়েও লাগছে যেন আগুনের হলকা।

ভ্যালি অফ দি কুইনস গড়ে উঠেছে নীলনদের পূর্ব পাড়ে। ভ্যালি অফ দি কুইনসের প্রাচীন নাম ছিল টা-সেট-নেফেরু অর্থাৎ সৌন্দর্য্যের জগৎ। হয়তো রানিদের সৌন্দর্য্যের কথা ভেবেই এর নাম টা-সেট-নেফেরু। এখানে ফারাও রানিদের সমাধি পাওয়া গেছে প্রচুর। ফারওয়ের রানিদের সাথে তাদের সন্তান ও বেশ কিছু পুরোহিতের সমাধিও এখানে আছে। এখানে এক একজন রানির নামে এক একটি উপত্যকাও আছে। যেমন ঃ ভ্যালি অফ আহমোস ভ্যালি অফ রোপে, ভ্যালি অফ পিটস– এরকম মোট ৯১টি সমাধি আছে। এগুলোর পাশে অন্য উপত্যকায় আর ১৯টি সমাধি আছে। প্রায় সমস্ত সমাধিই চোরেদের লুঠপাটে ও অত্যাচারে ক্ষত বিক্ষত হয়েছে।

The Valley of the Queens in Arabic is called Wadi aL Malekat where wives of Pharaohs were buried in ancient times. At their time it was known as Ta-Set-Neferu means the place of beauty.

অষ্টাদশ রাজবংশের সময় এখানে অনেক সমাধি তৈরি হয়। কেন নীলনদের পূর্ব পাড়ে এই জায়গায় ভ্যালি অফ কুইনস গড়ে উঠল তা জানা যায়নি। তবে ধারণা করা হয় যেহেতু দাইর-এল-মদিনা নামক গ্রামে সহজেই শ্রমিক মিলত এবং নীলনদের অপর পাড়ে যেহেতু ভ্যালি অফ দি কিংস আছে সেই কারণেই ভ্যালি অফ কুইনস গড়ে ওঠে নীল নদের এ পাড়ে। আর একটি সূত্র বলছে যেহেতু এখানে প্রবেশ মুখেই হাথোর দেবতার গুহা আছে সেজন্যে মৃতদের সঙ্গে স্বর্গের সংযোগ রক্ষা হবে এই ধারণাতেই এখানে ভ্যালি অফ দি কুইনস গড়ে তুলেছিল ফারাওরা।

এখানে প্রথম সমাধি রাজকুমারী আহমোসের। তিনি ছিলেন রাজা সেকেনরি টা ও রানি সিটডজেহুটির কন্যা সন্তান। টুটমোস-১ এর রাজত্বে তৈরি সমাধিটি আজও সৌন্দর্য বহন করে চলেছে। এখানে একটি পাহাড় কেটে সেটি টা ও মেরেটসেগারের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়। আমেনহোটেপ-৩ এর সময় রাজকুমারী আহমোসের সমাধি তৈরি হয়।

এখানে সমাধির দেয়ালে চিত্রকলা ও হাইরোগ্লাইফিকে বহু তথ্য পাওয়া যায়। একটি দৃশ্যে একটি ষাঁড়কে বলি দেওয়া হচ্ছে ও তাকে জল সিঞ্চনে পবিত্র করা হচ্ছে। জীবজন্তু শিকারের অনেক দৃশ্য দেখা যায় এখানাকার চিত্রে। অনেক চিত্রে দেখা যায় কেউ মৃত সন্তানকে নিয়ে সরাসরি দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করছে। একটি চিত্রে স্বামী-স্ত্রী কোথাও নৌকাবিহারে যাচ্ছেন। একটি চিত্রে নৌকায় অনেক ফলমূল ও পশু পাখি নিয়ে কোথাও চলেছে। কোন কোন চিত্রে ভৃত্যরা সেবা করছে রাজা রানি ও রাজন্যদের। ভ্যালি অফ দি কুইন্সে যত বৈচিত্রের শিল্পকলা দেখা যায় মিশরের আর কোথাও এমন দেখা যায়নি।

রঙের কাজগুলো হাজার হাজার বছর পর এখনও অবিকৃত অবস্থায় আছে। অবাক হয়ে দেখতে হয় দেয়াল চিত্রে রঙের আশ্চর্য ব্যবহার। সে সময় দেয়ালে রঙ করতে ভূষোকালি, গিরিমাটি, তেল, রাসায়নিক ও নানা মিশ্রণ ব্যবহার করা হত।

ভ্যালি অফ দি কুইন্সে ফারাওদের কাহিনি দেয়ালে লেখা হয়েছে হাইরোগ্লাইফিকের সাহায্যে। নামি দামি রানিদের সমাধির দেয়াল পূর্ণ আছে বিভিন্ন চিত্রে ও লেখায়।

উনবিংশ রাজবংশের সময় অতি সুন্দর কিছু সমাধি তৈরী হয়। এক একজন ফারওয়ের বহু পত্নী বা রানি থাকত, এই সকল রানিদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ও প্রিয় যারা তাদের সমাধি তৈরি করেন রামেসেস-১, সেটি-১ এবং রামেসেস-২ প্রমুখ ফারওরা। এর মধ্যে পাহাড় কেটে বানানো রামেসেস-২ এর পত্নী নেফারটারির সমাধি এখনও অক্ষত আছে এবং নেফারটারির অত্যন্ত সুন্দর এই সমাধি দেখতে প্রচুর লোকের ভিড় হয়।

বিংশতিতম রাজবংশের সময় এই ভ্যালি অফ দি কুইনস এ রামেসেস-৩ এর অনেক পত্নীর সমাধি তৈরি হয়েছিল পাশাপাশি। এই ধারা অব্যাহত থাকে রামেসেস-৬ এর সময়কাল পর্যন্ত।

রামেসেস-৩ এর সময়ে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। তখন অর্থনৈতিক কারণে শ্রমিকরা ধর্মঘট করে বসে। ভ্যালি অফ কুইনসের সকল প্রকার কাজ বন্ধ করে দেয়। সমাধিগুলোতে সেই সময় ভয়াবহ লুঠতরাজ চলে। মন্দিরগুলোতে ডাকাতির ঘটনা ঘটে ও বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে ডাকাতির আক্রমণ। পরাক্রমশালী রাজাদের বিরুদ্ধে পাঁচ বছর আগেও যে শ্রমিকরা সংগঠিত হতে পারত ও তারা ধর্মঘট করতে পারত এটাও মিশরের ইতিহাস থেকে জানা যায়।

রোম রাজত্বের সময়ে ভ্যালি অফ দি কুইন্সের দেয়ালের লেখা ও চিত্র সব মুছে ফেলা হয়। দেয়াল নতুন করে প্লাস্টার করা হয়। সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত সময়ে খ্রিস্টান ধর্ম ও সংস্কৃতির লেখা ও চিত্র অংকন করা হয় ভ্যালি অফ দি কুইন্সের দেয়ালে।

The Valley of the Queens consists of the main wadi which contains most of the tombs and Valley of Prince Ahmose, the Valley of Rope, the Valeley of the three Pits and the Valley of the Dolmen.

The main Wadi contains 91 tombs and othe valleys contain 19 tombs. The burials in the other valleys all started from the Eighteenth Dynasty.

The reason for choosing the valley of the Queens as a burial site is not known. The location in close proximity to the worker's village in Deir el-Medina and the Valley of the Kings might be a reason. Another consideration may be the existence of a sacred grotto dedicaed to Hathor at the entrance of the Valley. This grotto may be associated with rejuvenation for the dead.

In the Eighteenth Dynasty the first tomb in the Valley of the Queens was the tomb of princess Ahomose daughter of Sequenere Tao and Queen Sitdjehuti. This tomb was built in the reign of Thutmose 1. This tomb includes several members of the nobility.

The tombs from the Valley of the Three Pits were at the period of Thutmos.

The Valley of the Dolmen path is a small rock-cut temple dedicated to Ptah and Meretseger.

A tomb of the Princesses was located in the Valley. This tomb was at the time of Amenhotep III. Canopic jar fragments mentioning Prince Menkheperre, a son of Tuthmosis III and Merytre Hatshepsut was found

here. A King's Great Wife Nebetnehat from the mid Eighteenth Dynasty is found here. Tomb of the King's Daughter Ti from the mid Eighteenth Dynasty was also found.

During the Nineteenth Dynasty the use of the Valley became more exclusive. The tombs from this period exclusively belonged to royal women. Man of the high-ranking wives of Ramesses I, Seti I and Ramsses II were buried in the Valley. Tomb of the Queen Nefertari is found here also. Other members of the royal family continue to be buried in the Valley of the Kings.

The tomb of Queen Satre is likely the first tomb prepared during this Nineteenth Dynasty. It was likely started during the reign of Ramesses I and finished during the reign of Seti I.

In the 20th Dynasty the Valley was used extensively. Tombs for the wives of Ramesses III and for royal sons were prepared. The creation of tomb continues at least until the time of Ramesses VI.

During the time of Ramesses III the workers went on a strike. And there were reports of extensive robberies in all tombs.

After the end of the Twentieth Dynasty the Valley was no longer for royal burial site. Many of the tombs were extensively reused. Several tombs were reconstructed to accommodate multiple burials.

During the Roman period it was renewed for extensive use of the Valley as a burial site. During the Coptic Period few Hermit Shelters were constructed. Tombs of Nebettawy and Henuttay of Coptic reign is found. Wall scenes were covered with plaster and decorated with Christian symbols. The Christian presence lasted until the 7th Century.

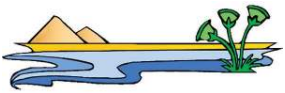

কারণাক টেম্পল
The Karnak Temple

এর মধ্যে দেখে নিলাম কারণাক টেম্পল। কারণাক টেম্পল মিশরের আর এক বিস্ময়। সারা বছর এখানে লেগে থাকে পর্যটকদের ভিড়। বিরাট বিরাট ক্ষয়ে যাওয়া প্রাসাদ, অট্টালিকা, বিশাল বিশাল স্তম্ভ, প্রার্থনার ঘর এবং বড়ো বড়ো তোরণ - এ সব দেখা গেল কারণাক টেম্পল এলাকায়। এ সব সেনুসরেট-১ মধ্য রাজবংশ যুগে নির্মাণ শুরু হয়েছিল এবং নির্মাণকাজ টলেমি রাজত্বের যুগেও চলেছিল। সে আমলে এই স্থানটিকে বলা হত ইপেট-ইসুট। অষ্টাদশ থিবস রাজবংশের সময় এখানে আমন দেবতার পুজো হত। কারণাক টেম্পল প্রাচীন থিবসের স্তম্ভের শহর। লাক্সার থেকে আড়াই কিলোমিটার উত্তরে এর অবস্থান।

The Karnak Temple : It is known as Karnak, from Arabic Khurnak meaning fortified village. comprises of decayed Temples, Chaples and Pylons in Luxor. The Karnak complex gives its name to the nearby surrounded modern village of El-Karnak, 2.5 Kilometer north of Luxor.

সম্ভবত গিজার পিরামিডের পর মিশরে সবচয়ে বেশি পর্যটক ভিড় করে এই কারণাকে। এখানে মোট চারটি ভাগ আছে চার দেবতার নামে ঃ-

- ❑ আমন রা (Amune Ra)
- ❑ মুট (Mut)
- ❑ মন্টু (Montu)
- ❑ আমেনহোটেপ-৪ (Amenhotep-4)

তার মধ্যে সবেচেয়ে বড় খোলা হলটি পর্যটকদের দর্শনের জন্য খুলে দেওয়া আছে। কারণাক বলতে সাধারণত বোঝায় আমন-রা দেবতার অংশকে। শুধু এই অংশটিই অধিকাংশ পর্যটক দেখার সুযোগ পান। অন্যান্য তিনটি অংশ মুট, মন্টু ও আমেনহোটেপ-৪ এর অংশ এগুলো বন্ধ করে রাখা আছে। কিছু কিছু ছোটো মন্দির আছে যেগুলোর সঙ্গে মুট, আমন-রা ও লাক্সার টেম্পলের সঙ্গে যুক্ত করা আছে। মুট-এর অংশটি খুবই প্রাচীন। এটি পৃথিবীর দেবতা ও সৃষ্টির

কারণাক টেম্পল

দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত মূল অংশটি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর হাটসেপসুট কিছুটা পুনর্গঠন করেন। ফারাও আমেনহোটেপ-৪ (আখেনাটেন) এর পাশেই একটি সুদৃশ্য মন্দির তৈরি করেন।

Construction at the complex started in the reign of Senusret I the Middle Kingdom and continued into the Ptolemaic reign . Most of the constructions started from the new Kingdom. The area around Karnak was the ancient Egyptian-Ipet-isut and the main place of worship of the eighteenth Dynasty Theban Triad with the god Amunar its head. It is part of the monumental city of Thebes.

কারণাক টেম্পলের মূল বিশেষত্ব আমন-রা এর অংশে বিশাল হলটি। প্রায় ৫০,০০০ বর্গ ফুট জায়গা জুড়ে ১৩৪ টি বিশালাকার স্তম্ভ। স্তম্ভগুলি ১৬টি সারিতে সাজানো। এর মধ্যে ১২২টি স্তম্ভ ১০ মিটার উঁচু। অন্য ১২টি স্তম্ভ ২১ মিটার উঁচু। এক একটি স্তম্ভের ব্যাস তিন মিটার। এক জায়গায় একসঙ্গে এমন বিশাল আকৃতির এতগুলি স্তম্ভ পৃথিবীর আর কোথাও তৈরি হয়নি আজও।

প্রতিটি স্তম্ভের গায়ে বিভিন্ন চিত্র অঙ্কিত আছে। লেখা আছে প্রাচীন মিশরীয় হাইরোগ্লাইফিকের ভাষায়। এই স্তম্ভগুলির চুড়ায় যে বিরাট মাস্তুল বা মাথাল আছে তার এক একটির ওজন ৭০ টন। অবাক করা বিষয় এই যে এত উঁচু স্তম্ভের উপর এত ভারি মাস্তুল কি করে তোলা হল। ধারণা করা হয় যে এই মাথালগুলো লিভারের সাহায্যে অত উপরে তোলা হয়েছিল। অর্থাৎ মানুষ তখন লিভারের ব্যবহার জানত। এটা করতে যেমন অনেক সময় লেগেছিল তেমনি এটা উপরে স্থাপন করতে নিখুঁত ভারসাম্য রক্ষার ব্যাপার ছিল। ভারসাম্য রক্ষা করতে জ্যামিতিক জ্ঞানও ব্যবহার করতে হয়েছিল। এগুলো কিভাবে তৈরি হয়েছিল আজও বিস্ময়। মাথা উঁচু করে দেখতে দেখতে সকলের ঘাড় ব্যথা হবার উপক্রম।

Karnak temple is an open air Museum. It consists of four main parts of which only the largest is currently open to the general public. The term Karnak often is understood as being the precinct of Amun-Ra only, because this is the only part most visitors see. The three other parts the precinct of Mut, the precinct of Montu, and the dismantled Temple of Amenhotep IV are closed to the public. There also are a few smaller temple and sanctuaries connecting the precinct of Mut, the precinct of Amun-Re, and the Luxor Temple.

The Precinct of Mut is very ancient, being dedicated to the Earth and creation deity, but not yet restored. The original temple was destroyed and partially restored by Hatshepsut, although another Pharaoh built

around it in order to change the focus or orientation of the sacred area. Many portions of it may have been carried away for use in other buildings.

The key difference between Karnak and most of the other temples and sites in Egypt is the length of time over which it was developed and used. Construction of temples started in the Middle Kingdom and continued into Ptolemaic times. Approximately thirty Pharaohs contributed to the buildings, enabling it to reach a size, complexity, and diversity.

The deities represented range from some of the earliest worhshiped to those worshiped much later in the history of the Ancient Egyptian culture. The size and number of feature are overhelming many parts of it was destroyed. It contained an early temple built by Amenhotep IV (Akhenaten).

Karnak has the Hypostyle Hall in the precinct of Amun-Re, in hall area of 5,000 square meter (50,000 sq ft) with 134 massive columns arranged in 16 rows. 122 of these columns are 10 meters tall, and the other 12 are 21 meters tall with a diameter of over three meters.

The architraves on top of these columns are estimated to weigh 70 tons. These architraves may have been lifted to these heights using levers. This would be an extremely time-consuming process and also would require great balance to get to such great heights. Alternative theory regarding how they were moved may be large ramps were constructed of sand, mud, brick or stone and that the stones were then towed up the ramps. If stone had been used for thr ramps, they would have been able to use much less material. The top of the ramps presumably would have employed either wooden tracks.

কারণাক টেম্পল দেখতেই সন্ধ্যা হয়ে গেল। তাও তো দেখা শেষ হল না। অনেক জায়গায় বুড়ি ছোঁয়া করে দেখা শেষ করলাম।

দীপালীকে বললাম, 'কারণাক টেম্পল এ এত দেখার, এত অল্প সময়ে দেখা হয় বল? মন ভরল না দেখে।'

'কারণাক টেম্পল ভালো করে দেখতে গেলে তোমাকে পাঁচ বছরের পরিকল্পনা নিয়ে আসতে হবে'—দীপালী বলল। 'এক কাজ কর, ঘর সংসার ত্যাগ করে তুমি এখানে চলে এসো। আর মন ভরে ভালো করে কারণাক টেম্পল দেখ।'

আমি এই গরমেও এক অট্টহাসি দিয়ে বললাম, 'ব্যবস্থা কর। আমি তো একা থাকতে পারব না। চল দু'জনেই সংসার ছেড়ে চলে আসি আর কারণাক টেম্পল দেখি।'

আমার এত জোরে হাসি দেখে আশেপাশের সকলে ঘুরে তাকাল আমার দিকে।

দীপালীর দিকে হাত বাড়িয়ে বললাম, 'চল।'

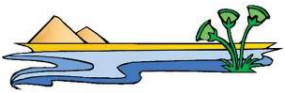

আলেকজান্দ্রিয়ার পথে
Way to Alexandria

ব্রেকফাস্ট সেরেই রওনা হব আলেকজান্দ্রিয়ার উদ্দেশ্যে। পুরো টিম ফুরফুরে মেজাজে। নতুন শহরে যাওয়া নিয়ে একটা আলাদা উৎসাহ থাকেই এর মধ্যে, যদি সে শহর হয় ক্লিওপেট্রার নামের সঙ্গে জড়িত। অ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রার বিখ্যাত প্রেম কাহিনির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা শহর সারা বিশ্বের সকলেরই মন টানে। শুধু কি প্রেম কাহিনি। রয়েছে ইতিহাসের টানাপোড়েন আর উত্থান পতনের রোমহর্ষক ঘটনা। সুদূর গ্রীস, রোম আর প্যারিস থেকে বিভিন্ন শাসকের আলেকজান্দ্রিয়ায় শাসন চালনা। যারা ভূগোল ঘাটতে ভালোবাসে তাদের জন্যও চর্চার বিষয়। নীলনদের অববাহিকায় ভূমধ্যসাগরের তীরে সারা পৃথিবীর তাবৎ মানুষের মনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে এই আলেকজান্দ্রিয়া।

সকাল থেকেই ডাঃ মলয় সাহা, ডাঃ চন্দন ঘোষাল, ডাঃ অমিতাভ ভট্টাচার্য উসখুস করছে আলেকজান্দ্রিয়ার টানে। দীপালী আমাকে তাড়া দিল, 'সকলের ব্রেকফাস্ট শেষ। আর তুমি এখনও বসে বসে ডিমের পুডিং খাচ্ছ? কখন চা খাবে, আর কখন বের হবে? দেখছ না সকলে রেডি যাওয়ার জন্য।'

ওর কথায় যেন সম্বিত ফিরে পেলাম। তাই তো সকলেই প্রস্তুত। আর আমি সবে বসেছি ডিমের পুডিং নিয়ে। সকলেরই ব্রেকফাস্ট শেষ। বাক্সপেটরা নিয়ে ঘর খালি করছে সবাই। কোন মতে চা শেষ করে ছুটলাম। ঘরে ঢুকে দু মিনিটেই দীপালী ঘর খালি করে এক হাতে ট্রলি ব্যাগ আর অন্য হাতে আমাকে নিয়ে টানতে টানতে ছুটল বাসের দিকে। বুঝলাম এটাই আলেকজান্দ্রিয়া ফিভার।

সূর্য উঠেছে, আলো ঝলমল সকাল বেলায় ছুটে চলেছে আমাদের বাসটি। গাইড বলল, 'সব ঠিক থাকলে সময় লাগবে পাক্কা সাড়ে তিন ঘন্টা।'

পাশে বসা দীপালী বিরক্তি নিয়ে বলল, 'সাড়ে তিন ঘন্টা?'

আমি বললাম, 'ভালোই তো হল। সকালের এই ফুরফুরে মেজাজে প্রকৃতির দৃশ্য দেখতে দেখতে যাব।'

এ কথা দীপালীর ভালো লাগেনি। এখনই যদি ও আলেকজান্দ্রিয়া পৌঁছে যেতে পারত তবেই ওর শান্তি। সকলেরই মনে এমনই অবস্থা। আগ্রহ আমারও আছে তাই বলে এত ব্যাকুলতা? আলেকজান্দ্রিয়াই পারে এই ব্যাকুলতা তৈরি করতে।

দীপালীকে বললাম, 'চল, তোমাকে এখনই পৌছে দেব আলেকজান্দ্রিয়ায়। তারপর থেকে যেও তুমি ওখানে একটা ফ্ল্যাট কিনে। দেশে ফিরতে হবে না। আমি মাঝে মাঝে এসে তোমাকে দেখে যাব।'

ওর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া, 'হ্যাঁ এটাই তো তুমি চাও। এটাই তোমার মনোবাসনা।'

'একদম ঠিক বলেছ' - বলেই আমি একটু হেসে বাসের জানালা দিয়ে বাইরে মনোনিবেশ করলাম। ততক্ষণে বাস গতি পেয়েছে। দূরে সবুজ আর আকাশের নীলিমা। মরুভূমিতে এত সবুজ যারা দেখেছে তারাই অবাক হচ্ছে। এদেশের সরকার সবুজায়নে দৃষ্টি দিয়েছে এবং অনেকাংশে খুবই সফল। এদের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অনেকের অনুকরণীয়। নীলনদের অবদান তো আছেই। খেজুর গাছ আর খেজুর গাছ - মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। মাঝে মাঝে রাস্তায় উটের কাফেলা দেখেও মন ভরে গেছে। লম্বা সারি বেঁধে ওরা চলেছে কি এক অদ্ভুত শৃঙ্খলা মেনে। ভাবি এক এক সময়ে বোকা উটেরা কি করে বোঝে যে সকলে এক সারিতে নিয়ম মেনে পথ চলতে হবে। বহু দূর যেতে হবে মরুভূমির পথ ধরে। আমরা মানুষেরা কি সব সময় এই নিয়ম নীতি মেনে চলি! তাহলে কি আমরা উটেরও অধম?

মোটেই নয়। প্রতিযোগিতা মানুষের রক্ত মজ্জায়। আধিপত্যের আকাঙ্খাও কখনও প্রকাশ্যে কখনও অবদমিত। তাই তো মানুষ সারা পৃথিবীর সকল প্রাণীর উপরে আধিপত্য করছে। তার মধ্যে দুর্বলের উপর আবার সবলের আধিপত্যও চলছে পৃথিবীময়। অত্যাচার করছে শোষণও করছে সবল মানুষেরা। মুখ বুজে সয়ে চলেছে অত্যাচারিতের দল। আবার বিক্ষোভে ফেটে পড়ার ইতিহাসও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে। সেই পাঁচ হাজার বছর আগে এই মিশরেও শ্রমিক বিক্ষোভ হয়েছিল ফারাওদের বিরুদ্ধে ভ্যালি অফ কুইনস তৈরির সময়ে। শ্রমিকরা ভ্যালি অফ কুইনস এর কাজ বন্ধ করে দিয়েছিল। বেশি পরিশ্রম করানো হচ্ছিল আর তারা উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাচ্ছিল না তাই। তখন পারিশ্রমিক হত খাদ্যশস্যের বিনিময়ে। লুঠতরাজের ফলে ভ্যালি অফ কুইনসের অনেক সমাধি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সোনা দানা অলংকারাদি নিয়ে গিয়েছিল তারা। মমির ক্ষতি হয়েছিল অপরিসীম।

ভাবতে ভাবতে অনেক পথ অতিক্রম করে ফেলেছি। অনেকটা সময় পার করেছি। বাসের মধ্যে অনেকেই তন্দ্রাচ্ছন্ন- একটু ঝিমিয়ে নেওয়া। আলেকজান্দ্রিয়ার কাছে এসে গেছি এর মধ্যে। আলেকজান্দ্রিয়ার নিকটে আসতে আসতে এখানকার রাস্তায় অন্য ছোঁয়া পাচ্ছিলাম। মিশরের অন্যত্র যেমন মুসলিম অনুশাসনের ব্যাপক ছোঁয়া দেখা যায় বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে এখানে সেটা কম চোখে পড়ছে। পশ্চিমি পোশাক ও আচরণের প্রভাব পরিলক্ষিত হতে লাগল। অনেক

সাহেব, মেম- সাহেবদেরও দেখলাম। মিশরের অন্য জায়গার মত বোরখা বা আপাদমস্তক ঢেকে রাখার পোশাক পরার প্রবণতা মুসলিম মহিলাদের মধ্যে একটু কম দেখলাম এখানকার রাস্তায়। বিশেষ করে অল্পবয়স্ক তরুণী ও মহিলাদের মধ্যে এই প্রবণতা কম।

আমাদের বাসটি সোজা গিয়ে থামল প্রায় দশতলা হোটেলের সামনে। নাম হোটেল রিজেন্সি। ভুমধ্যসাগরের তীর ঘেঁসে হোটেলটি। হোটেলের বাইরের চেহারা অসাধারণ। রিসেপশনে ঢুকে যথারীতি ঘরের চাবি নেওয়ার জন্য হুটোপুটি। কে আগে ঘরে ঢুকবে সেই চেষ্টা সকলের। অবশ্য আজ এই সাড়ে তিন ঘন্টার বাস যাত্রার পর সকলেই কম বেশি ক্লান্ত। তাই হোটেল রুমে ঢুকে একটু বিশ্রামের প্রয়োজন। যাই হোক ব্যাগ টেনে নিয়ে হোটেল রুমে ঢুকলাম।

ব্যাগটা রেখেই দীপালী ঘরের জানালার ভারি পর্দা সরিয়েই আমাকে ডাকতে লাগল, 'দেখ দেখ ওই দেখ, সাগর দেখা যাচ্ছে।' সত্যিই তো মনটা জুড়িয়ে গেল। তাছাড়া দীপালীরও সাগর পছন্দ। ঢেউ আছড়ে পড়ছে তীরে। সাগরের গর্জন শোনা যাচ্ছে। নারী পুরুষ সব সমুদ্র স্নান করছে।

দীপালী বলল, 'চল সাগরে যাই। এখন তো কোথাও বেরোনোর পরিকল্পনা নেই লাঞ্চের আগে।' পোশাক বদলে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম দুজনে। সাগর তীরে পৌঁছতেই কয়েকজন স্থানীয় লোক এগিয়ে এল আমাদের কাছে। জানতে চাইল স্নানের জায়গা আর ছাতা ভাড়া নেব কিনা।

আমি বললাম, 'ও সব লাগবে না। আমরা এমনিই স্নান করব।'

এ কথা বলে আমরা সামনের দিকে এগোতে চাইলাম। সঙ্গে সঙ্গে লোক দুটো বলল এটা ওদের জায়গা। এখানে স্নান করা যাবে না। পাশের দিকে এগোলাম। সেখানেও একই কথা। খুব শীঘ্রই বুঝলাম ওদের ছাতা আর জায়গার জন্য পয়সা না দিয়ে সমুদ্র স্নান হবে না। অথচ টাকা পয়সা সঙ্গে নিয়ে বের হইনি।

দীপালী বলল, 'আমি এখানে দাঁড়াচ্ছি। তুমি যাও টাকা নিয়ে এসো।'

ঘন্টায় দশ ইজিপ্সিয়ান পাউন্ড ভাড়া দিতে হবে। ওদের একজন আমাদের মনোভাব বুঝেই এগিয়ে এসে বলল, 'এখনই টাকা দিতে হবে না। নাম, হোটেল আর রুম নং দিলেই হবে। পরে টাকা দেবেন। আমাদের বিশ্বাস আছে। এক ঘন্টার জন্য বুকিং নিন।'

আমাদের আমব্রেলা আর বসার বা শোয়ার জন্য বড়ো গদি আঁটা বেঞ্চি দেখিয়ে দিল। একটা স্লিপে নাম ঠিকানা লিখে নিয়ে গেল ওদের একজন। ছাতার নিচে বসলাম দুজনে আধা শোয়া করে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে। দুপাশে শত শত মানুষ - দেশি বিদেশি। পুরুষ মহিলা সকলের স্নানের পোশাক। স্নানের পোশাকেও পশ্চিমা ছাপ স্পষ্ট। কেউ কারও দিকে নজরও দিচ্ছে না। আপত্তিকর কিছু করছেও না, বলছেও না। সবাই ব্যস্ত নিজেদের নিয়ে। সকলেই জলকেলিতে মত্ত। এর মধ্যে দীপালীও জলে নেমে গিয়েছে। তাকিয়ে দেখি ও তীর থেকে অনেকটা দূরে চলে গিয়েছে।

আমি একটু ভয় পেয়েই চিৎকার করে ডাকলাম, 'দীপালী, অত দূরে যেও না। চলে এসো।'

আমি পাড়ে দাড়িয়ে চিৎকার করছি দেখে আমায় ইশারায় ডাকল। আমি নামলাম বেশ কিছুটা কিন্তু ওর পর্যন্ত গেলাম না। ওকেই ফিরে আসতে বললাম। এতটা সাহসী হওয়া ভাল নয়। বুঝলাম ও খুব মজা পেয়েছে ভূমধ্যসাগরের জলে এত উৎসাহী মানুষের মাঝে। চারপাশে প্রায় দুই কিলোমিটার জুড়ে মানুষ সাগরে নেমেছে। বিশাল এই সি বিচ। উঠতে মন চাইছে না দীপালীর– তা বেশ বুঝতে পারছিলাম। বুঝিয়ে ওকে সাগর থেকে উঠিয়ে আনলাম। বিপদ কখন কি ভাবে আসে কেউ বলতে পারে?

দীপালী আমার হাত থেকে তোয়ালেটা নিয়ে মাথায় জড়িয়ে নিতে নিতে বলল, 'সাগর থেকে উঠতে ইচ্ছে করে না। আমি যে সাগর ভালবাসি সে তো তুমি জানো। আমি যে ভূমধ্যসাগরের জলে স্নান করে গেলাম এটা তোমার একটা লেখার বিষয় হয়ে থাকল। লিখে নিও, দীপালী আজ ভূমধ্যসাগরের জল গায়ে মেখেছে, দীপালী আজ ভূমধ্যসাগরের জলে ডুব দিয়েছে। এটাও একটা ঘটনা হয়ে থাকল। আমাদের দলের আর কেউ কিন্তু ভূমধ্যসাগরের জলে নামেনি।'

আমি ওকে বললাম, 'তুমি যা বলেছ। বেশ এটাও লিখে রাখার মতো বিষয়।'

ভেজা কাপড়ে হোটেল রুমে পৌছলাম। বাথরুমে স্নান সেরে কাপড় পাল্টে নিলাম। একটু বিশ্রামের জন্য বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছি সবে মাত্র। এরই মধ্যে রিসেপশান থেকে ফোন এল–কেউ দেখা করতে এসেছে। বুঝলাম সাগরের লোক এসেছে টাকা নিতে। গিয়ে টাকাটা দিয়ে এলাম। একটু পর লাঞ্চে যেতে হবে আলেকজান্দ্রিয়ারই কোন রেস্টুরেন্টে। গাইড জানিয়ে দিল লাঞ্চ করেই যেতে হবে আলেকজান্দ্রিয়ার মিউজিয়ামে। তাই দ্রুত বাসে উঠলাম। তাজমহল নামের রেস্টুরেন্টে নিয়ে গেল গাইড। বুঝলাম এখানে অনেক ভারতীয় পর্যটক আসে তাই এখানেও ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট গড়ে উঠেছে। সম্পূর্ণ ভারতীয় মেনু। মাছ ভাত মুরগীর মাংস স্যালাড মিষ্টি দই ছিল খাদ্য তালিকায়।

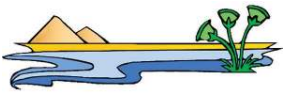

আলেকজান্দ্রিয়া ন্যাশনাল মিউজিয়াম
The Alexandria National Museum

দইয়ের প্লেট হাতে নিয়ে চামচ দিয়ে খেতে খেতে দীপালীকে বললাম, 'দইটা হয়েছে বেশ। তোমার দই খাওয়া দেখেই আমি নিলাম। তবে আরও মজা একটু পরেই– আলেকজান্দ্রিয়া মিউজিয়াম।'

দীপালী বলল, 'তুমি এক প্লেট দই নিয়ে যেভাবে মজা করে খাচ্ছ মনে তো হচ্ছে না আলেকজান্দ্রিয়া মিউজিয়াম নিয়ে কোনও টেনশন আছে তোমার। আমি তো আলেকজান্দ্রিয়া মিউজিয়ামের কথা ভেবে ভালো করে খেতেই পারিনি। একটু চালিয়ে খাও আর চল, বাসে ওঠ।'

তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে হন্তদন্ত হয়েই বাসে উঠলাম। বাস সোজা নিয়ে চলল আলেকজান্দ্রিয়া মিউজিয়ামের দিকে। আলেকজান্দ্রিয়া মিউজিয়াম নিয়ে আমারও আগ্রহ রয়েছে খুব। কারণ আশা করেছি এই মিউজিয়ামে আলেকজান্দ্রিয়ার ইতিহাসের অনেক কিছুই দেখতে পাব।

আমাদের নিয়ে আলেকজান্দ্রিয়া মিউজিয়ামে পৌঁছোল আমাদের বাস। বাইরে থেকে খুব সুন্দর দেখতে মিউজিয়ামটি। সাদা ধবধবে মিউজিয়াম বিল্ডিং। গায়ে ইংরেজি ও আরবিতে লেখা আলেকজান্দ্রিয়া ন্যাশনাল মিউজিয়াম। নামতেই দেখি ট্যুর কোম্পানীর পক্ষ থেকে আলেকজান্দ্রিয়ার একজন তরুণী গাইড আমাদের টিমের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন মূল প্রবেশ পথের পাশেই। তার দায়িত্ব ছিল মিউজিয়ামের সকল কিছু আমাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখানো। আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে নিজেই পরিচয় দিলেন, 'আমি শারাহ শাহীন। আলেকজান্দ্রিয়া যাদুঘর ঘুরিয়ে দেখানোর জন্যে আমি আপনাদের গাইড।'

এরপর শারাহ আমাদের নিয়ে ভিতরে ঢুকলেন। আগেই আমাদের জন্য ঢোকার টিকিট করে রেখেছিলেন। তিনি প্রথমেই নিচতলায় নিয়ে গেলেন। প্রতিটি জিনিস এক এক করে ধরে ধরে ইতিহাস সমেত বলতে লাগলেন। এরপর একে একে সমস্ত ঘরে নিয়ে রক্ষিত সকল কিছু দেখাতে লাগলেন। ইংরেজিতে সাববলীল বর্ণনা দিয়ে চলেছেন শারাহ শাহীন।

আলেকজান্দ্রিয়ায় ন্যাশনাল মিউজিয়াম ২০০৩ সালে ৩১ সে ডিসেম্বর মিশরের প্রেসিডেন্ট

আলেকজান্দ্রিয়া ন্যাশনাল মিউজিয়াম

হোসনি মোবারক উদ্বোধন করেছিলেন। এটি আলেকজান্দ্রিয়ার তারিক আল হোরাইয়া স্ট্রিটে অবস্থিত যা এক সময়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কনসুলেটের বাসভবন ছিল। আলেকজান্দ্রিয়ার এই মিউজিয়ামে প্রায় ১৮০০টি হস্তনির্মিত বস্তু প্রদর্শনের জন্য রক্ষিত আছে। এ সকল দ্রব্যাদি মিশরের বিভিন্ন মিউজিয়াম থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। আলেকজান্ডার দি গ্রেটের মুর্তি স্থাপিত হয়েছে এখানে। চারতলা এই মিউজিয়ামের নিচ তলায় ফারাওদের মুর্তি ও তাদের ব্যবহার্য দ্রব্যাদি রয়েছে।

দ্বিতীয় তলায় গ্রীক, রোমান ও খ্রিস্টিয় আমলের বিভিন্ন শাসকদের মুর্তি ও সে সময়কার দ্রব্যাদি প্রদর্শনের জন্য আছে। আর তিন তলায় বাইজেন্টাইন ও মুসলিম শাসনকালের ও তৎপরবর্তী মিশরের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চিত্রও তুলে ধরা আছে। সে সঙ্গে মিশরে ইসলাম ধর্মের প্রসার ও বৃদ্ধির ইতিহাসও এখানে খুঁজে পাওয়া যায়। বিভিন্ন সময়ের ব্যবহার্য, মুদ্রা, অস্ত্র, পোশাক ও মূল্যবান গয়না দেখা যায়।

হেলেনিস্টিক (গ্রীক) আলেকজান্দ্রিয়ার সময়ে আলেকজান্দ্রিয়ার বাতিস্তম্ভ প্রাচীন সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম দর্শনীয় বস্তু ছিল। এটির উচ্চতা ছিল প্রায় ১১৬ ফুট। এই বাতিস্তম্ভের উপর রাতের বেলায় আলো জ্বলত যা দেখে নাবিকেরা দিক নির্ণয় করতে পারত। চতুর্দশ শতকে এক ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়। সেই ভূমিকম্পে বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্যের এই বাতিস্তম্ভ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

প্রতিটি জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখাচ্ছেন আর অনর্গল বর্ণনা দিয়ে চলেছেন শারাহ। সে সময়ে আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরিও পৃথিবী বিখ্যাত ছিল। তখন সে লাইব্রেরি মিশরের সম্রাট টলেমি-২ গড়ে তোলেন। মিউসেস দেবতার উদ্দেশ্যে একটি মন্দির তৈরি করেন টলেমি-২ এর বাবা। সেই মন্দিরেই তার ছেলে টলেমি-২ পরবর্তিতে লাইব্রেরি স্থাপন করেন। বর্তমানে সেই লাইব্রেরির সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে আরও সম্প্রসারিত ও বর্ধিত করা হয়েছে। বইয়ের সংগ্রহও বেড়েছে বহুগুণ। অনেক পর্যটক আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরি দেখতে ভিড় করেন।

প্রচুর প্রাচীন বই পুস্তক বা অনেক পুস্তকের খন্ডিতাংশ দেখে চমৎকৃত হলাম। আমাদের গাইড শারাহ অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় এমন ভাবে বর্ণনা করছিলেন যেন চোখের সামনে ভেসে উঠছিল সমগ্র ইতিহাস। মিউজিয়ামটির এক অদ্ভুত আলো আঁধারি পরিবেশ আমাদের যেন সেই হাজার বছরের পুরোনো দিনে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। একপাশে দেখলাম অর্ধশায়িত অবস্থায় লাস্যময়ী অপূর্ব সুন্দর একটি নারী মূর্তি।

মিশরীয় তরুণী গাইড শারাহকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ইনি কে সেই ক্লিওপেট্রা?'

অদ্ভুত এক উদাসীনতা দেখিয়ে উত্তর দানে বিরত থাকলেন শারাহ। আরও দু একবার জানতে চাইলে নিরব বিরক্তিও প্রকাশ করেছিলেন। পরে জেনেছিলাম আলেকজান্দ্রিয়ার একশ্রেণীর মানুষ ক্লিওপেট্রাকে ঠিক সুনজরে দেখে না। তার কারণও বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছিলাম পরে। সেও এক বিচিত্র কাহিনি - ক্লিওপেট্রার জীবন কাহিনি।

বিকেল পর্যন্ত মিউজিয়াম খোলা থাকে। এক তলা, দোতলা, -তিনতলা ঘুরে শেষ করে নিচে নামলাম। বিকেল সাড়ে চারটা ওখানকার সময়। সূর্য তখনও মধ্য গগনে। আগেই বলেছি এখানে সূর্য অস্ত যায় অনেক পরে।

নিচে নেমে যাদুঘরের মূল গেট পর্যন্ত এসে শারাহ একেবারে ভারতীয় ভঙ্গিতে জোড়হাত করে আমাদের নমস্তে বলে বিদায় দিয়ে বলতে ভুললেন না, 'আবার দেখা হবে।' তার সেই বিদায় দেওয়ার মুহুর্ত আর হাসিখানা এখনও মনে আছে।

The Alexandria National Museum:

Egypt Feature Story by Zahraa Adel Awed:

The Alexandria National Museum has grown in importance these days, and is now considered one of Egypt's finest museums. It was inaugurated by President Hosni Mubarak on December 31st, 2003, and is one more addition to the reasons one should visit this grand old city. The national museum in located in a restored palace and contains about 1,800 artifacts that narrate the history of Alexandria throughout the ages, including the Pharaonic, Ptolemaic, Roman, Byzantine, and Islamic eras.

There are even some more modern pleces, including 19th glassware, silverwaere, chinaware and precious jewels, which provide a sense of the richness of the court of Mohammmed Ali and his descendants. Mummies are shown in a special underground chamber (basement), Also, some of the items found during the archaeological underwater excavations in Alexandria are now on the same floor as the Greco-Roman Artifacts.

The museum is housed in the old AI-Saad Bassili Phasha Palace. he was one of the wealthiest wood merchants in Alexanndria during his lifetime. It is located on Fouad Stret (Tariq al-Horreyya), near the center of the city. Construction on the site was first undertaken in 1926. The palace covers an area of 3,480 square meters. It is a white Italian-style mansion that sits in an expensive garden of rare trees and plants. The palace consists of four floors and an underground shelter, which was used during World War II air raids. The palace was designed by a French engineer who used the Italian styles in its construction.

This three-store place was a gathering place for the upper class people of Egyptian society in Alexandria, including notables such as Egypt former Prime Ministers, Ismail Sedqi Pasha and Ali Maher Pasha, along with many other. This villa was sold to the Americans as a consulate in 1960 and thereafter in 1997, was purchased by the Ministry of Culture for

about 12 million LE. Its conversion to a museum, including up to date audiovisual equipment, security and fire proection, cost another 18 million LE. In prepation of the Alexandria National Museum, the highest of standards has been adopted, especially in display techniques and in the design of educational and cultural galleries.

The first floor of the museum contains the Pharaonic items including a lot of statues of different ancient Egyptian rulers and goes and very interesting protaits of Menkaure, Ankhenaton, and Hatshepsut.

There are also some duplicates of the tombs that were discovered in the Valley of the Kings. These tombs include Canopic jars and many other interesting items.

The middle floor of the museum contains the antiquities of the Greco-Roman period. There are various statues of Greek ladies and an amazing statue of the god Serapi, as well as a granite statue of Carecalla. There are also some scientific studies that were made in the Freco-Roman period concerning the human body.

The last floor of the museum displays items belonging to the Coptic and Islamic civilizations which reflect how prosperous these two periods were.

The Coptic section includes a lot of everyday life items made out of bronze, copper, and silver. There are also some interesting icons that demonstrate religious scenes of Christ and the Last Supper. This is addition to a lot of cotton and textile products.

There are also some displays from the intermediate Pharaonic period that reflects how the arts of this period became more realistic. Afterward, there is the section of the family of Mohamed Ali that includes a lot of jewellery made out of silver and gold that belonged to the royal family.

The most interesting section in the Alexandria National Museum is the section that displays antiquities that were found under the sea in Alexandria. The museum also displays live pictures of how these items were pulled out of the sea. This section includes a black bronze statue of Isis, some portraits, and statues of Greek gods which includes an interestinng statue of the head of Alexander the Great and another for Venus, the goddess of love.

The museum gives a comprehensive picture of not only Alexandrian history but the history of Egypt as whole. A visit to the National Museum of Alexandria is a must for anyone who is interested in Egyptian antiquites and history.

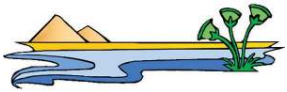

আলেকজান্দ্রিয়া
Alexandria

মিউজিয়াম দেখা হলে আমাদের গাইড আমাদের ফ্রি টাইম দিল কিছুক্ষণ নিজেদের মত ঘোরার জন্য ডিনারের আগে পর্যন্ত। আমি, দীপালী আর মলয় সাহা তিন জন বেরোলাম আলেকজান্দ্রিয়ার রাস্তায় হেঁটে হেঁটে শহরটা দেখব বলে। সমুদ্রপাড়ে বেশ কিছুটা হাঁটলাম। রাস্তায় প্রচুর বিদেশি দামি গাড়ি - ট্রামও চলছে। কসমোপলিটান শহর এটা। মিষ্টি বিকেলে হাঁটতে বেশ ভালোই লাগছিল।

একটা জায়গায় দেখলাম বেশ কিছু মিশরীয় তরুণী বসে আড্ডা দিচ্ছে। নিজেদের মধ্যে গল্প করছে। দীপালী এগিয়ে গেল ওদের দিকে—ভাব জমাতে। দীপালী যেখানেই যায় ওর একটা লক্ষ্য থাকে স্থানীয় মানুষদের সাথে কথা বলে ওদের থেকে কিছু জেনে নেওয়ার। তাদের আচার আচরণ স্বভাব পছন্দ অপছন্দ সব জানার একটা ইচ্ছে ওর বরাবর। রাত্রে সে আমাকে এসব শোনায় আর আমি আমার ডায়েরিতে সে সব লিখে রাখি।

লোকজন দেখলেই চেষ্টা করে ভাব জমিয়ে কথার ফাঁকে কিছু জানা যায় কিনা। মনে হল ওরাও ওকে দেখে বেশ খুশিই হল। আমি আর মলয়দা একটু দূরেই দাঁড়ালাম। ভাবলাম মুসলিম মেয়ে, হয়ত আমাদের দেখে অপ্রস্তুত হতে পারে। ইতিমধ্যেই দীপালী ওদের সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়ে ফেলেছে। বুঝলাম মেয়েগুলো বেশ শিক্ষিতা। আলেকজান্দ্রিয়ায় মহিলা শিক্ষিতের হার অনেক বেশি।

মিশরে অন্যত্র মেয়েদের সাথে দীপালী কথা বলার চেষ্টা করেছে কিন্তু তাদের অনেকেই ইংরেজিতে কথা বলতে পারে না। আরবি ছাড়া অন্য ভাষা জানেই না। তাই অনেক জায়গায় ওদের সাথে দীপালী কথা বলতেই পারেনি।

আলেকজান্দ্রিয়ার এই মেয়েগুলো ঝরঝরে ইংরেজিতে কথা বলে চলেছে দীপালীর সাথে। দীপালীও এদের সাথে কথা বলতে পেরে খুব মজা পাচ্ছে সেটা আমি দুর থেকে বেশ বুঝতে পারছিলাম।

দীপালীও সুযোগ পেয়েছে মন খুলে ওদের সাথে কথা বলতে, ভাব জমাতে।

দীপালীকে ওদের মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্য আর স্বাভাবিক দেখে আমি আর মলয়দা এগিয়ে গেলাম। আমরাও বোঝার চেষ্টা করলাম কথা বলে। ওদের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে ও স্কুল শিক্ষক এমন দুইজন উচ্চ শিক্ষিতার সাথেও আলাপ হল। এক পর্যায়ে আমি সকলকে চা খেতে বললাম। সকলে হেসে উঠে সানন্দে রাজি হল। চায়ের সাথে ওদের মধ্যে একজন তরুণী আমাদের সকলকে ওখানকার একধরনের ফিস ফ্রাই খাওয়াল। চা পানের পর আবার আমরা এগোতে লাগলাম।

রাস্তার পাশে একটা স্টলে দেখি সুন্দর সুন্দর বিভিন্ন রকমের টুপি বিক্রি হচ্ছে। আমি আর মলয়দা দুজনেই দুটো টুপি কিনলাম যাকে বলে সাহেবি টুপি বা হ্যাট। এক একটি দশ ইজিপশিয়ান পাউন্ড দামের। এটা পরে রোদের মধ্যে পিরামিড দেখতে গিয়ে খুব কাজে দিয়েছিল।

আলেকজান্দ্রিয়া কে মিশরীয় আরবি ভাষায় বলে এসকেন্দ্রিয়া। আর কপটিক ভাষায় বলে আলেকজান্দ্রিয়া।

Alexandria (Al-Iskandariyya), Egyptian Arabic: Eskendria, In Coptic: Alexandria. It is the Second largest city in Egypt and extending about 32km along the coast of the Mediterranean Sea in the north central part of the country.

আলেকজান্দ্রিয়া শহরটা বেশ ছিমছাম পরিপাটি। এটি মিশরেরে দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর, কায়রোর পরেই। ভূমধ্যসাগরের তীর ঘেঁসে প্রায় ৩২ কিলোমিটার বিস্তৃত মিশরের উত্তর দিকে নীলনদের অববাহিকায় এর অবস্থান। শহরটির অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরের মধ্যে যোগাযোগের কেন্দ্র এই আলেকজান্দ্রিয়া। এই শহরটি শিল্প সমৃদ্ধ বানিজ্য অঞ্চল এবং সুয়েজ খালের মধ্য দিয়ে গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামের পাইপলাইন গিয়েছে এখান দিয়ে। মিশরের বৃহত্তম সমুদ্র বন্দর এই আলেকজান্দ্রিয়া। মিশর দেশটি গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামে স্বয়ংসম্পূর্ণ। গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম আমদানি করতে হয় না কোন দেশ থেকে।

মিশররের ফারাওদের কর্তৃত্ব দুর্বল হতে থাকলে বাইরের বিভিন্ন রাজা বা সেনাপতিরা বারেবারে মিশর দখল করেছে, শাসন করেছে। পাশের দেশ ইথিওপিয়া থেকে এসে মিশর দখল করে নেয়। বহু বছর শাসন করে তারা। আসে লিবিয়ার আক্রমণ। নিজেদের রক্ষা করতে পারেনি মিশর। ৫২৪ খ্রিস্টপূর্বে পার্শিয়ানরা লিবিয়ানদের হটিয়ে মিশর দখল করে। মিশরের অধিবাসিদের কোন মতামত জানানোর জায়গায় ছিল না। মুখ বুজে তারা সব মেনে নিত। প্রতিরোধের কথা কোনদিন ভাবেনি। তাদের সংগঠিত করার মত নিজস্ব শাসক কেউ ছিল না। প্রায় দুশো বছর পার্শিয়ান রাজাদের দুঃশাসনে কাটিয়েছে মিশর।

গ্রীসের মেসিডোনিয়ার সম্রাট আলেকজান্ডার দি গ্রেট টায়ারের যুদ্ধে টায়ার সম্পুর্ণ ধ্বংস করেন এবং গাজার দিকে অগ্রসর হন। গাজার দিকে অগ্রসর হতে গিয়ে যতগুলি শহর সামনে পড়ে সবই তিনি দখল করেন। গাজায় গিয়ে কিছুটা প্রতিরোধের মুখে পড়েন তিনি। তার কুশলীরা তাকে বলেন উঁচু উঁচু ঢিপিগুলির জন্য গাজা জয় করা কঠিন হবে। তিনি আরও শক্তিবৃদ্ধি করে যুদ্ধ শুরু করেন। তিন তিন বার যুদ্ধের পর আলেকজান্ডার দখল করেন গাজা। সে সময় তার কাঁধে তিনি মারাত্মক আঘাত পান।

৩৩২ খ্রিস্টপূর্বে তিনি মিশর দখল করেন। মিশরে গ্রীক রাজত্ব শুরু হল আলেকজান্ডার দি গ্রেট এর মিশর অভিযানের পর। এরপর মিশরের পূর্বদিকের শহর পেলুসিয়াম দখল করতে তার সেনাবাহিনী এগিয়ে যায়। এ সময়ে না মিশরীয় না পার্সিয়ান কোন তরফেই কোন বাধা আসেনি। তার সৈন্যদল খুব সহজেই মিশরের দখল নেয় ও নীলনদ বরাবর মেমফিস শহর অধিকার করে। এরপর নীলনদের পশ্চিম তীর বরাবর অগ্রসর হয়ে সেখানে লেক মারিয়ুটএ ক্যাম্প করেন। তখন তিনি দেখতে পান ভূমধ্যসাগর পাড়ে র‍্যাকোটিস একটি সুন্দর গ্রাম। তিনি তৎক্ষণাৎ তার স্থপতি ডাইনোক্রেটিসকে র‍্যাকোটিসে মিশরের রাজধানী নির্মাণের নির্দেশ দেন। খ্রিস্টপূর্ব ৩৩২এ তার হাতেই সেখানে পত্তন আলেকজান্দ্রিয়া নগরীর। স্থানীয় লোকজন তাকে মিশরের মুক্তিদাতা আখ্যায়িত করে। তাকে সকল মানুষ বিপুল ভাবে অভিনন্দন জানায়। তাকে দেবতা আমনএর পুত্র বলে মনে করতে থাকে।

আলেকজান্দ্রিয়া শহরের প্রতিষ্ঠার পর আলেকজান্ডার দি গ্রেট আলেকজান্দ্রিয়া শহর ছেড়ে চলে যান এবং আর কখনও আলেকজান্দ্রিয়ায় ফিরে আসেননি। আলেকডান্ডার দি গ্রেট মাত্র ছয় মাস আলেকজান্দ্রিয়ায় ছিলেন। তার পর ফিরে যান গ্রীসে। তার ভাইসরয় ক্লিওমেনিস আলেকজান্দ্রিয়ার সম্প্রসারণের কাজ করে যান। খ্রিস্টপূর্ব ৩২৩ এ আলেকজান্ডার দি গ্রেট এর মৃত্যুর পর তার প্রিয় সেনাপতি জেনারেল টলেমি ল্যাগিডেস তার মরদেহ তার প্রিয় শহর আলেকজান্দ্রিয়াতে নিয়ে আসেন এবং এখানেই সমাধিস্থ করেন। খ্রিস্টপূর্ব ৩২৩ এ তার মৃত্যুর পর টলেমি রাজত্বের রাজধানী ছিল আলেকজান্দ্রিয়া।

২১শে জুলাই ৩৬৫ খ্রিস্টাব্দে এক মহাসুনামিতে আলেকজান্দ্রিয়ায় ভয়াবহ ক্ষতি হয়। প্রতি বছর এই দিনটি আলেকজান্দ্রিয়ার মানুষ স্মরণ করে আতঙ্কের দিন হিসাবে।

৬৪১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় এক হাজার বছর ধরে এই শহর টলেমিক, রোমান ও বাইজেন্টাইন মিশরের রাজধানী ছিল। ৬৪১ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম বিজয়ের পর মিশরের রাজধানী ফুস্টাটে সরিয়ে নেওয়া হয় যা পরে কায়রোর সঙ্গে মিশে যায়।

এর আগে পর্যন্ত আলেকজান্দ্রিয়া ছিল পৃথিবীর বৃহত্তম শহর। এরপর ইটালিতে রোম শহর গড়ে ওঠে। সেটি আলেকজান্দ্রিয়ার চেয়েও বড়ো। আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্বের বৃহত্তম শহরের মর্যাদা হারায় ও বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর রূপে পরিগণিত হয়।

বাইজেনটাইন সম্রাট হেরাক্লিয়াস ৬২৯ খ্রিস্টাব্দে মিশর দখল করেন। ১৪ মাস যুদ্ধের পর ৬৪১ খ্রিস্টাব্দে আরব সেনাপতি আমর-ইবন-আল-আস হেরাক্লিয়াসের নিকট থেকে আলেকজান্দ্রিয়া জয় করে মিশরে মুসলিম বিজয় সূচনা করেন।

১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে রিদানিয়ার যুদ্ধে জয় করে অটোম্যান তুর্ক আলেকজান্দ্রিয়ার ক্ষমতা নিয়ে নেন এবং ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মিশরে অটোম্যান রাজত্ব চলে।

এই সময়ে আলেকজান্দ্রিয়ার গরিমা ক্রমেই নষ্ট হতে থাকে।

১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে নেপোলিয়ানের নেতৃত্বে ফরাসি সৈন্যবাহিনী আলেকজান্দ্রিয়ায় সামান্য বাধার পর আলেকজান্দ্রিয়া প্রবেশ করে ও পুরোপুরি শাসন কায়েম করে।

১৮০১ খ্রিস্টাব্দে বৃটিশ সেনাবাহিনী আলেকজান্দ্রিয়ায় নেপোলিয়ানের বাহিনীকে আক্রমণ করে এবং ওই বছরের ২১শে মার্চ নেপোলিয়ানের সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে। বৃটিশ বাহিনী ২রা সেপ্টেম্বর ফরাসিদের থেকে আলেকজান্দ্রিয়ার পূর্ণ ক্ষমতা পায়।

১৮১০ খ্রিস্টাব্দে অটোম্যান গবর্ণর মুহাম্মদ আলি আলেকজান্দ্রিয়ার পূনর্গঠন শুরু করেন এবং ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের দিকে গ্রীক ও অন্যান্য ইউরোপিয়ানরা আলেকজান্দ্রিয়া আসতে শুরু করে। বিংশ শতাব্দীতে আলেকজান্দ্রিয়া কবি ও সাহিত্যিকদের চারণভূমিতে পরিণত হয়।

১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে বৃটিশ নৌবাহিনীর বোমারু বিমানের প্রচন্ড আঘাত নেমে আসে আলেকজান্দ্রিয়ায় এবং অটোম্যানদের থেকে বৃটিশ বাহিনী পুনরায় আলেকজান্দ্রিয়া দখল করে নেয়।

এক সময় পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের খ্রিস্টধর্মের প্রসার কেন্দ্র ছিল আলেকজান্দ্রিয়া। এখানে বেশ কয়েকটি বড়ো চার্চ আছে। গ্রীকদের মিশর দেশে মূল শহর ছিল এই আলেকজান্দ্রিয়া। গ্রীসের বহু মানুষ আলেকজান্দ্রিয়ায় চলে আসে স্থায়িভাবে বসবাস করতে।

এই বিখ্যাত শহরটি খ্রিস্টান ও মুসলমানদের আবাসভূমিতে পরিণত হয়। তাই এখনও এ শহরে বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন ধরনের মানুষ দেখা যায়। সে কারণে শহরটি এক আলাদা আভিজাত্য ও গৌরব বহন করে চলেছে। এখানে এখন নানা ধর্মের মানুষ থাকলেও তাদের মধ্যে সৌহার্দ্য রয়েছে বেশ। ওরা একে অন্যের ধর্মে নাক গলান না। তাই ধর্মের কারণে এখানে কোন হানাহানি ঝগড়া মারামারিও হয় না। এখন এক শান্তির শহর আলেকজান্দ্রিয়া।

Alexandria was founded in a small ancient Egyptian Town Rhacotis in 332 BC by Alexander the Great.

After Muslim conquest of Egypt in AD 641 when a new captial was founded at Fustat which was later absorbed into Cairo.

Hellenistic Alexandria became an important center of Hellenistic civilization and remained the Capital of Ptolemic (Greek) Egypt and Roman and Byzantine Egypt for alomst 1000 years.

Hellenistic Alexandria was best known for the Lighthouse of Alexandria, one of the Seven Wonders of the Ancient World, its Great Library, the largest in the ancient world and the Necropolis, one of the Seven Wonders of the Middle Ages.

Alexandria was the second most powerful city of the ancient world after Rome.

Alexandria was founded by Alexander the Great in April 332 BC. Dinocrates was Alexander's Chief Architect for the project.

The major centers of early Christianity in the Eastern Roman Empire was Patriarchate of Alexandria. In the modern world, the Coptic Orthodox Church and the Greek Orthodox Church of Alexandria both claim to this ancient heritage.

Alexander left Egypt a few months after the foundation of Alexandria, He never returned to his city. Cleomenes, Viceroy of Alexander continued the expansion of Alexandria after his departure.

General Ptolemy Lagides braught Alexander's body to Alexandria after his death in Rome.

Alexandria had become the largest city in the world in a century and for some centuries more was second largest city.

Rome became the largest of the World. It became Egypt's main Greek city, with Greek people from diverse backgrounds.

A greater part of Alexandria was destroyed during the Kitos War in AD 115. Hadrian and his acrhitect, Decriannus, again tried to rebuild the development of its museum into the leading Hellenistic center of learning Library of Alexandria but were carefully maintained its populations three largest ethnicities, Greek, Jewish, and Egyptian.

A greater part of Alexandria was destroyed during the Kitos War in AD 115, Hadrian and his architect, Decriannus, again tried to rebuild the city. The Emperor Caracalla visited the city in 215 and because of some satires shown to him by some local people he commanded his troops to put to death all youths capable of bearing arms. This order caused a killing of thousands of inhabitants both male and female youths of Alexandria.

Alexandria was devastated by a tsunami on 21 Jyly 365 and it is annually commemorated later as a day of horror.

The Byzantine Emperor Heraclius recovered it in 629, After a siege that lasted 14 months in 641 the Arabs under the General 'Amr-ibn al-As captured it during the Muslim conquest of Egypt.

In 1517 after the Battle of Ridaniya, the city was conquered by the Ottoman Turks and remained under Ottoman rule until 1798.

Alexandria lost its importance to the Egyptian port city of Rosetta during the 9th to 18th centuries.

Alexandria regained its former prominence with the construction of the Mahmoudiyah Canalin in1807.

Napoleon with his French troops entered the city Aexandria on 2 July. 1798 and it remained in their occupation until 1801. The British force won the Battle of Alexandria defeating the French on 21 March 1801.

The Brithsh got total occuption from the French on 2 September 1801. Muhammad Ali, the Ottoman governor of Egypt, began building and development around 1810 and by 1850 Greeks and other Europeans moved to the city. In the early 20th century, the city became a home for poets and novelists.

The city came under bombardment from British navel forces and was occupied from Ottoman In July 1882.

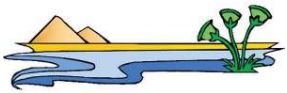

টলেমি রাজবংশ
The Ptolemaic Kingdom

টলেমি রাজবংশকে গ্রীক ভাষায় বলা হয় টলেমাইক ব্যাসেলিয়া (Ptolemaike Basileia)। আলেকজান্ডার দি গ্রেট এর সাতজন জেনারেল ছিলেন। ৩২৩ খ্রিস্টপূর্বে আলেকজান্ডার দি গ্রেটের মৃত্যুর পর ওই সাত জেনারেলের একজন টলেমি সোটারকেই মিশরের শাসক করে পাঠানো হয়। টলেমি জেনারেলদের মধ্যে অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও প্রিয়ভাজন ছিলেন।

আলেকজান্ডার দি গ্রেট এর মৃত্যুর পর ফিলিপ-৩ ও পারডিকাস যৌথ ভাবে গ্রীসের মেসিডন থেকে টলেমিকে আলেকজান্দ্রিয়ার শাসক নিযুক্ত করে পাঠান। টলেমি ৩২৩ খ্রিস্টপূর্ব থেকে আলেকজান্দ্রিয়াকেই মিশরের রাজধানী ঘোষণা করে শাসন করতে থাকেন। ৩০৫ খ্রিস্টপূর্ব পর্যন্ত টলেমি ফিলিপ-৩ আলেকজান্ডার -৪-এর নামে মিশরের শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। মেসিডোনিয়ার শাসকদের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও দুর্বলতার সুযোগে টলেমি নিজেই শক্তি সঞ্চয় করেন এবং ৩০৫ খ্রিস্টপূর্বে টলেমি নিজেকে টলেমি-১ সোটার নামে ঘোষণা করেন ও মিশরে কর্তৃক করেন। টলেমির রাজত্ব দক্ষিণের সিরিয়া সাইরিন থেকে নুবিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

৩০৫ খ্রিস্টপূর্ব থেকে ৩০ খ্রিস্টপূর্ব পর্যন্ত সময় ধরে মিশরে টলেমি রাজত্ব ২৭৫ বছর দীর্ঘস্থায়ি হয়। মিশরের মানুষদের বিশ্বাস অর্জনের জন্য টলেমি-১ নিজেকে ফারাও বলতে শুরু করেন। মিশরের মানুষও টলেমিদের ফারাওদের উত্তরাধিকার মনে করতেন। মিশরের মানুষ দেবতা ভাবত ফরাওদের। টলেমিরা স্থানীয় লোকজনের মত পোশাক পরতেন। তাদের মত করে মুর্তি গড়তেন। তাদের ধর্মীয় মতানুসারেই চলতেন। সকল টলেমি রাজাকেই মিশরবাসী স্বাধীন মিশরের ফারাও ভাবত। টলেমি-১ সোটার ছিলেন প্রথম টলেমি রাজা আর টলেমি রাজবংশ শেষ হয় ক্লিওপেট্রা-৭ এর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে।

টলেমি-১ এর সকল পুরুষ উত্তরাধিকারই টলেমি নাম ধারণ করতেন। আর টলেমি নারী শাসকরা ছিলেন ঃ

❑ ক্লিওপেট্রা (Cleoptra)

❑ আরসিনো (Arsinoe)

❑ বেরেনিস (Berenice)

বিভিন্ন সময়ে তারা শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করেছেন। অনেক রানিই ছিলেন রাজাদের সহোদরা বোন ও স্ত্রী। টলেমি রাজবংশে রাজাদের মধ্যে নিজেদের বোনকে বা সৎবোনকে বিয়ে করার প্রচলন ছিল।

বেরেনিস-৩ এবং বেরেনিস-৪ এই দুই রানি নিজেরা এককভাবে মিশর শাসন করেন। প্রথম দিকে যদিও টলেমি শাসকরা মিশরীয়দের আচার আচরণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলতেন কিন্তু টলেমি-২ ও টলেমি-৩ এর শাসনামলে গ্রীসের মেসিডোনিয়ানদের আলাদা ভাবে পুরস্কৃত করা শুরু হয়। তাদের প্রচুর সংখ্যায় মেসিডন থেকে মিশরে এনে বসবাসের জন্য জমি দেওয়া হতে থাকে। তাদের বাড়িঘর বাসস্থান তৈরি করে দেওয়া হয়। তাদের জন্য আলাদা গ্রাম ও গ্যারিসন তৈরি করা হয়। তারা বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে সমস্ত মিশরে ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় মিশরীয়দের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক শুরু হয় এবং গ্রীক-মিশরীয় বংশোদভুতরা আলাদা শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট লাভ করতে থাকেন, সমগ্র মিশরে বিশেষ করে আলেকজান্দ্রিয়া ও তার আশে পাশে তারা বিস্তার লাভ করে বিপুল সংখ্যায়।

ক্লিওপেট্রা-৭ এর মর্মান্তিক মৃত্যুর পর এবং একই সঙ্গে ৩০ খ্রিস্টপূর্বে মিশরে রোমান অভিযানের পর টলেমি রাজত্বের অবসান হল।

টলেমি রাজত্বে যে সকল রাজা ও রানি শাসন করেছেন তাদের একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা এবং তাদের রাজত্বকাল নিচে দিলাম যারা এসব পছন্দ করেন তাদের ভালো লাগবে ঃ

১. টলেমি ১ সোটার (৩০৩-২৮২ খ্রিস্টপূর্ব)

২. টলেমি ২ ফিলাডেলফাস (২৮৫-২৪৬ খ্রিস্টপূর্ব)

৩. টলেমি ৩ ইউরেগেটিস (২৪৬-২২১ খ্রিস্টপূর্ব)

৪. টলেমি ৪ ফিলোপ্যাটর (২২১-২০৩ খ্রিস্টপূর্ব)

৫. টলেমি ৫ ইপিফ্যানেস (২০৩-১৮১ খ্রিস্টপূর্ব)

৬. টলেমি ৬ ফিলোম্যাটর (১৮১-১৬৪ খ্রিস্টপূর্ব)

৭. টলেমি ৭ নিওস ফিলোম্যাটর-টলেমি-৭ ফিসকন (১৭০-১৬৩খ্রিস্টপূর্ব, ১৪৫-১১৬ খ্রিস্টপূর্ব)

৮. ক্লিওপেট্রা ২ ফিলোমেটোরা সোটেইরা নিকেফোরাস (১১৬-১০১ খ্রিস্টপূর্ব)

১০. টলেমি ৯ ল্যাথিরস (১১৬-১০৭ খ্রিস্টপূর্ব)

১১. টলেমি ১০ আলেকজান্ডার (১০৭-৮৮ খ্রিস্টপূর্ব)

১২. বেরেনিস ৩ ফিলোপ্যাটর (৮১-৮০ খ্রিস্টপূর্ব)
১৩. টলেমি ১১ আলেকজান্ডার (৮০-৫৮ খ্রিস্টপূর্ব)
১৪. টলেমি ১২ নিওস ডায়োনিসস (৮০-৫৮ খ্রিস্টপূর্ব)
১৫. ক্লিওপেট্রা ৫ টিফাএনা (৫৮-৫৭ খ্রিস্টপূর্ব)
১৬. ক্লিওপেট্রা ৭ ফিলোপ্যাটর (৫১-৩০ খ্রিস্টপূর্ব)
১৭. আরসিনোই ৪ (৪৮-৪৭ খ্রিস্টপূর্ব) ক্লিওপেট্রা বিপরীতে।

The Ptolemaic Kingdom :

In Ancient Greek the Ptolemaic Kingdom was called Ptolemaike basileia - and was the Hellenistic Kingdom based in Egypt. It was ruled by the Ptolemaic Dynasty which started with Ptolemy I Soter after the death of Alexander the Great in 323 BC and ended with the death of Cleopatra VII with the Roman conquest in 30 BC.

In 305 BC the Ptolemaic Kingdom was founded by Ptolemy I Soter, who declared himself Pharaoh of Egypt and created the Hellenistic Dynasty that ruled and area stretching from southern Syria to Cyrene and south to Nubia. Alexandria became the capital city and a major center of Greek Culture and trade.

Ptolemies named themselves as the successors to the Pharaohs to gain recognition by the native Egyptian people. The later Ptolemies took on Egyptian traditions by marrying their siblings had themselves portrayed on public monuments in Egyptian style and dress and participated in Egyptian religious life. The Ptolemies were involved in foreign and civil wars that led to the decline of the kingdom and ended with occupation by Rome.

Until the Muslim conquest Hellenistic culture continued to thrive in Egypt throughtout the Roman and Byzantine periods.

The Ptolemy Kingdom :

1. Ptolemy I Soter (303 BC-282 BC)
2. Ptolemy II Philadelphus (285-246BC)
3. Ptolemy III Eueregetes (246BC - 221 BC)
4.Ptolemy IV Philopator (221 BC-203 BC)
5. Ptolemy V Epiphanes (e0e BC-181 BC)
6. Ptolemy VI Philometor (181 BC-164 BC); (163 BC - 145 BC)
7. Ptolemy VII Neos Philopator Ptolemy VIII Physcon (170BC-163 BC, 145BC -116BC)

8. Cleopatra II Philometora Soteira (32 BC-127BC)

9. Cleopatra III Philometor Soteira Dikaiosyne Nikephoras (116-101 BC)

10. Ptolemy IX Lathyros (116-107 BC, 88-81 BC as SoterII)

11. Ptolemy X Alexander I (107-88 BC)

12. Berenice III Philopator (81-80 BC)

13. Ptolemy XI Alexander II (80 BC)

14. Ptolemy XII Neos Dianysos (Auletes) (80-58BC, 55-51 BC)

15. Cleopatra V Tryphaena (58-57 BC) ruled jointly with Berenice IV Epiphaneia (58-55 BC) and CleopatraVI Tryphaena (58 BC)

16. Cleoptra (Cleopatra VII Philopator, 51-30 BC) ruled jointly with Ptolemy XIII Theos Philopator (51-47BC), Ptoolemy XIV (47-44 BC) and Ptolemy XV Caesarion (44-30 BC).

17. Arsinoe IV (48 BC-47 BC), in opposition to Cleoptra.

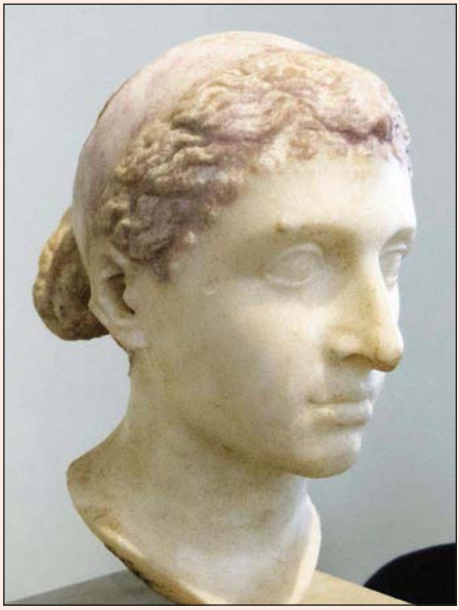

ক্লিওপেট্রার দেয়াল চিত্র ও মূর্তি

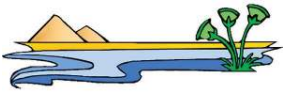

ক্লিওপেট্রা
Cleoptra VII Philopator

এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেন ক্লিওপেট্রা-৭ যিনি ক্লিওপেট্রা-৭ ফিলোপ্যাটর নামেও পরিচিত। ক্লিওপেট্রা শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ থেকে যার অর্থ পিতার ঐশ্বর্য। গ্রীক শব্দ ক্লিওস অর্থ ঐশ্বর্য।

In Greek : Cleopatra Philopator.

The name Cleopatra comes from the Greek name Kleopatra, meaning "Glory of her father' in the feminine form.

ক্লিওপেট্রা-৭ যদিও কাগজে কলমে টলেমি-৮ থিওস ফিলোপ্যাটর (৫১-৪৭ খ্রিস্টপূর্ব), টলেমি-(৯৪৭-৪৪ খ্রিস্টপূর্ব) ও টলেমি-১৫ সিজারিয়ান (৪৪-৩০ খ্রিস্টপূর্ব) এর সঙ্গে যৌথভাবে শাসন কার্য পরিচালনা করেছেন। আসলে ক্লিওপেট্রা-৭ সে সময় একক ক্ষমতা রাখতেন এবং একক ক্ষমতাতেই শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্বার সাথে ৫১ খ্রিস্টপূর্ব থেকে ১২ই আগস্ট ৩০ খ্রিস্টপূর্ব পর্যন্ত ২১ বছর মিশর শাসন করেন।

টলেমিক রাজত্বে মিশরের শেষ কর্তৃত্বময় শাসক ছিলেন ক্লিওপেট্রা (পুরোনাম ঃ ক্লিওপেট্রা -৭ ফিলোপ্যাটর)। তিনিও সকলের কাছে ছিলেন একজন ফারাও বা দেবতা। তিনি যেমন ছিলেন বিচক্ষণ কূটনীতিবিদ, তেমনি ছিলেন একজন ভালো নৌ কমান্ডার, ভাষাবিদ এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের লেখিকা। তার নিজস্ব ভাষা ছিল কোইনি গ্রীক কিন্তু তিনিই প্রথম কোন মিশরীয় শাসক যিনি মিশরীয় ভাষা শিখে নিয়েছিলেন।

ক্লিওপেট্রার বাবা টলেমি-১২ নিওস ডিওনিসোস ও তার মা ক্লিওপেট্রা-৬ ট্রাইফিনা (কারও মতে ক্লিওপেট্রা-৫ ট্রাইফিনা)। ক্লিওপেট্রা-৭ খ্রিস্টপূর্ব ৬৯-এ জন্মগ্রহণ করেন। তার বোন ছিল আরসিনো-৪ এবং ভাইয়েরা ছিল টলেমি-১৩ ও টলেমি-১৪।

তিনি ছিলেন এক তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও মেধাসম্পন্ন নারী শাসক। অসম্ভব প্রতিকূলতা কাটিয়ে তার কৌশলি চালে সকল বিরুদ্ধ শক্তিকে পরাস্ত করেছেন। একজন নারী শাসক হয়েও তিনি নিজের ভাষা ছাড়াও ইথিওপিয়ান, ট্রোগাডাইট, হিব্রু, আরবি, সিরিয়ান, পারথিয়ান, ল্যাটিন

প্রভৃতি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতেন। তিনি ছিলেন অসাধারণ আকর্ষণীয় ও সুন্দরী এবং জীবনযাত্রায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে ছিলেন অনেকটা বেপরোয়া স্বভাবের। ক্লিওপেট্রা তার নিজের শারীরিক সৌন্দর্য ও আকর্ষণী ক্ষমতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন এবং প্রয়োজনে এর সদ্ব্যবহার করতে কুণ্ঠা বোধ করতেন না। তার শাসনামলে প্রায় সকল রোমান শাসক তার রূপ ও ব্যক্তিত্বে আকর্ষণ বোধ করেছেন ও সান্নিধ্য পাওয়ার চেষ্টা করছেন। তার রূপ, চেহারা ও আকর্ষণ নিয়ে আজও গবেষণার অন্ত নেই। তাকে নিয়ে কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, ইতিহাসবিদ, গবেষকদের চর্চা চলছেই।

আজ থেকে প্রায় দুই হাজার বছর আগে খ্রিস্টপূর্ব ৬৯ এ তার জন্ম হয়েছিল অথচ আজও তার ছবি আঁকা হচ্ছে শিল্পীর তুলিতে, কম্পিউটারের স্ক্রিনে আর সিনেমার পর্দায়। তার গায়ের রঙ খুব ফর্সা ছিল না। গায়ের রঙ ছিল তামাটে বর্ণের। গ্রীক বংশোদ্ভুত তিনি। তার রাজ পরিবার তার জন্মের প্রায় তিনশো বছর আগেই মিশর চলে আসে। তাই তার চেহারার মধ্যে মিশরীয় প্রভাব যথেষ্ট ভাবেই লক্ষণীয়। উঁচু নাক ও তীক্ষ্ণ চোখে প্রচণ্ড মোহনীয় ও আকর্ষণীয় ছিলেন ক্লিওপেট্রা। ছিলেন প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন এক শক্তিশালী শাসক।

অনেক চড়াই উৎরাই যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্য দিয়ে চলেছে তার গোটা জীবন। এর মধ্যে আছে ক্লিওপেট্রার প্রেম, সে এক মহান প্রেম কাহিনি। সবশেষে তার আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে গোটা অধ্যায়ের সমাপ্তি।

৫৮ খ্রিস্টপূর্বে ক্লিওপেট্রার বাবা টলেমি-১২ কে রোমে নির্বাসনে পাঠানো হয়। ক্লিওপেট্রা তখন তার বাবার সঙ্গী ছিলেন। মিশরে প্রচণ্ড বিক্ষোভ শুরু হয় তখন। এই সুযোগে টলেমি-১২-এর মেয়ে বেরেনিস-৪ মিশরের শাসকের দাবিদার হন এবং তিন বছর শাসন করেন। এরপর বেরেনিস-৪ নিহত হন ৫৫ খ্রিস্টপূর্বে অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে। তখন টলেমি-১২ রোমের সামরিক সাহায্য নিয়ে আবার মিশরে প্রত্যাবর্তন করেন এবং পুনরায় ক্ষমতা দখল করেন।

রোমান সাম্রাজ্যের ক্ষমতা ও শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে টলেমিদের মিশরের উপর কর্তৃত্ব খর্ব হতে থাকে। একের পর এক এলাকা হাত ছাড়া হতে থাকে রোমান আগ্রাসনের কাছে। রোমান সাম্রাজ্যের নিকট টলেমিদের আত্মসমর্পন ছাড়া গত্যান্তর থাকে না। নিজেদের কর্তৃত্ব অক্ষুন্ন রাখতে টলেমিদের প্রচুর ধন সম্পত্তি রোমান শাসকদের হাতে তুলে দিতে হত। এইভাবে প্রচুর ধন সম্পত্তির বিনিময়ে টলেমি-রোমান সন্ধি করে তারা দেড়শো বছর ক্ষমতায় টিকে ছিল।

টলেমি-১২ নিওস ডিওনিসোস ৫১ খ্রিস্টপূর্বে তার মৃত্যু পর্যন্ত মিশরে রাজত্ব করেন। বাবার মৃত্যুর পর ক্লিওপেট্রা ১৮ বছর বয়সে তার ছোট ভাই টলেমি-১৩ কে নিয়ে মিশরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি অন্যান্য পুরুষ সহকর্মী ও রাজাদের সহযোগিতায় মিশরে কর্তৃত্ব করেন। তিনি খ্রিস্টপূর্ব ৫১ থেকে ৩০ খ্রিস্টপূর্ব পর্যন্ত টানা ২১ বছর মিশরের কর্তৃত্বে ছিলেন। ৩৯ বছর বয়সে তিনি আত্মহত্যা করেন। সেও এক চাঞ্চল্যকর কাহিনি।

বাবার মৃত্যুর পর দায়িত্ব গ্রহণের অল্প দিনের মধ্যেই ক্লিওপেট্রার সঙ্গে তার ভাইয়ের মতানৈক্য শুরু হল। টলেমি-১৩ এর সঙ্গে দ্বন্দ্ব এমন পর্যায়ে পৌঁছোয় যে টলেমি-১৩ ক্লিওপেট্রাকে সকল দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন। দুই ভাইবোনের দ্বন্দ্বে বিশেষ করে ক্লিওপেট্রাকে ক্ষমতা থেকে অপসারণের কারণে জনতার মধ্যে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে ও মিশরে প্রচণ্ড গৃহযুদ্ধ বেধে যায়। ক্লিওপেট্রা গোপন আস্তানায় পালিয়ে যান এবং ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার জন্যে সেনা ও শক্তি সংগ্রহের চেষ্টা করেন। মিশর থেকে যে প্রচুর পরিমাণ খাদ্যশস্য ও মূল্যবান সম্পদ রোমে যেত তা বন্ধ হয়ে যায়। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রচণ্ড ক্ষতি হয়। মিশরের গৃহযুদ্ধ বন্ধের জন্য ৪৮ খ্রিস্টপূর্বে রোমান সেনানায়ক জুলিয়াস সিজার রোম থেকে আলেকজান্দ্রিয়ার উদ্দেশ্যে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে যাত্রা করেন।

ওদিকে রোমান সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব নিয়ে জুলিয়াস সিজার ও পম্পি দি গ্রেট-এর মধ্যে প্রবল দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। তাদের দ্বন্দ্বের কারণে রোমে গৃহযুদ্ধ বেঁধে যায়। খ্রিস্টপূর্ব ৪৮-এ সিজার ও পম্পির অনুগত সৈন্যদের মধ্যে গ্রীসের পারসালুস-এ এক ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে পম্পি পরাজিত হন ও মিশরে পালিয়ে আসেন। জানা যায় মিশরে পম্পি নিহত হন। সিজার বিপুল সৈন্য নিয়ে আলেকজান্দ্রিয়া আসেন। মিশরে টলেমি-১৩ও ক্লিওপেট্রার মধ্যে বিরাজমান দ্বন্দ্ব মেটানোর জন্য সিজার চেষ্টা করেন। চেষ্টা করেন ক্লিওপেট্রা ও তার ভাই টলেমি-১৩ 'র মধ্যে একটা সমঝোতা করার।

ইতিমধ্যে ক্লিওপেট্রা সিজারের সঙ্গে তার প্রাসাদে গোপনে মিলিত হন। সিজারকে তার ইচ্ছার কথা জানান এবং মিশরে তার কর্তৃত্ব স্থাপনে ক্লিওপেট্রা সিজারের সর্বাত্মক সাহায্য চান। মোহময়ী ক্লিওপেট্রার অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারেননি সিজার। টলেমি-১৩-এর প্রধান উপদেষ্টা পোথেইনোস-সিজার ও ক্লিওপেট্রার গোপন সম্পর্কের কথা জেনে যান এবং এও লক্ষ্য করেন সিজারের চুক্তিটি ক্লিওপেট্রার শক্তি বৃদ্ধি করবে। এই সমঝোতা টলেমি-১৩ এবং আরসিনো-৪ এর হাতে আর কোন ক্ষমতাই থাকবে না। তখন পোথেইনোস আরসিনো-৪ কে বোঝান যে সমস্ত ক্ষমতা ক্লিওপেট্রা কুক্ষিগত করে নিতে চলেছেন সিজারের সঙ্গে গোপন বোঝাপড়ায়। তখন মিশরের সেনাবাহিনী ছিল আরসিনো-৪ এর নিয়ন্ত্রণে।

আরসিনো তার সেনাবাহিনীর সহায়তায় একদিন অতর্কিত আক্রমণে সিজারকে আলেকজান্দ্রিয়ায় তার প্রাসাদে বন্দি করেন। ক্লিওপেট্রা তখন সিজারের সঙ্গে একত্রে তার প্রাসাদে গোপনে অবস্থান করছিলেন। আরসিনো জানতেন না যে ক্লিওপেট্রা তখন সিজারের শয্যাসঙ্গী। ঘটনাচক্রে ক্লিওপেট্রা বন্দি হন আরসিনোর সেনার হাতে।

সিজার ও ক্লিওপেট্রার বন্দি হওয়ার সংবাদে সিজার ও ক্লিওপেট্রার সৈন্যদের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। সিজার ও ক্লিওপেট্রার সৈন্যরা টলেমি-১৩ ও আরসিনো-৪ এর সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করে। শুরু হয় নীলের যুদ্ধ। ৪৭ খ্রিস্টপূর্বে সেই যুদ্ধে সিজার ও

ক্লিওপেট্রার অনুগত সৈন্যদের নিকট টলেমি-১৩ ও আরসিনো-৪ এর সেনাবাহিনী পরাজিত হয়। শোনা যায় আরসিনো-৪ তার সৈন্যদের নিকট ততটা প্রিয় হয়ে উঠতে পারেননি। সৈন্যদের উপর তার নিয়ন্ত্রণ ভালো ছিল না। ক্লিওপেট্রাকে বন্দি করার সংবাদে সৈন্যদের মধ্যে প্রবল ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ক্লিওপেট্রাকে বন্দি করা সৈন্যরা মোটেই মেনে নিতে পারে নি। সৈন্যদের মধ্যে ক্লিওপেট্রার বিপুল জনপ্রিয়তার কারণে ও আরসিনোর শিথিল নিয়ন্ত্রণের জন্য সৈন্যদের একটা বিরাট অংশ নীলের যুদ্ধে আরসিনো-৪ কে ত্যাগ করে ও ক্লিওপেট্রার দিকে চলে যায়।

টলেমি-১৩ একটি নৌকায় করে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু ক্লিওপেট্রার সৈন্যরা তাকে নৌকা সমেত ধরে ফেলে। তিনি জলে ঝাঁপ দেন বাঁচার জন্য। নীলনদের জলে ডুবেই তার মৃত্যু হয়। কয়েকদিন নীলনদের উপর তার মৃতদেহ ভাসতে দেখা যায়। এত শত্রুতা সত্বেও বোন আরসিনো-৪ কে খুন না করে ক্লিওপেট্রা তাকে গ্রীসের ইফিসাস-এ নির্বাসনে পাঠিয়ে দেন।

এই যুদ্ধ জয়ের পর সিজার ক্লিওপেট্রাকে নীলনদের নৌকায় আনন্দ বিহারের প্রস্তাব দেন। ক্লিওপেট্রা সিজারের সে প্রস্তাবে সম্মত হন। সিজার ক্লিওপেট্রাকে নিয়ে নীলনদে এক প্রমোদ তরীতে আনন্দ বিহারের আয়োজন করেন। প্রায় ৪০০ যুদ্ধ জাহাজ তাদের প্রমোদতরী অনুসরণ করে নিয়ে যায়।

জানা যায় এই প্রমোদতরীটি টলেমি-৪ এর বিশেষভাবে নির্মিত যার দৈর্ঘ্য ৩০০ ফুট এবং উচ্চতা ৮০ ফুট। বিশেষ ভাবে নির্মিত এই প্রমোদ তরীটিতে আমোদ ফুর্তি, বিলাসিতা ও আনন্দ উপভোগের যাবতীয় উপকরণ মজুদ ছিল। সিজার ও ক্লিওপেট্রা বেশ কিছুদিন একান্তে প্রমোদ তরীর বিলাসিতায় সময় কাটান। বেশ কিছু দিন চলার পর তাদের নৌবহর ইথিওপিয়ার সন্নিকটে পৌঁছে যায়। ইথিওপিয়া পৌঁছোনোর আগে সিজার ও ক্লিওপেট্রাকে মিশর ফিরে আসতে হয়। ওরা দুজন আরও কিছুদিন নীলনদের প্রমোদ বিলাসে ভাসতে চেয়েছিলেন একন্তে। কিন্তু সৈন্যদের মধ্যে অনিচ্ছা দেখা দেওয়ায় সিজার সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন।

এরপরও সিজার ও ক্লিওপেট্রার মধ্যে দীর্ঘদিন গোপন সম্পর্ক চলতে থাকে। এক সময় ক্লিওপেট্রা গর্ভবতী হয়ে পড়েন। একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেন, নাম রাখেন সিজারিয়ান। সিজারিয়ানের জন্ম হয় ৪৭ খ্রিস্টপূর্বের ২৩শে জুন। পরে সিজারিয়ানের নাম হয় টলেমি-১৫। ৪৬ ও৪৪ খ্রিস্টপূর্বে ক্লিওপেট্রা রোমে বেড়াতে যান সিজারের অতিথি হয়ে এবং সেখানে সিজারের ভিলাতে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন। সিজারের স্ত্রী কালপুর্নিয়ার গর্ভে কোন সন্তান হত না। এটা সিজারের জন্য ছিল আক্ষেপের ও অপবাদের। রোমে ক্লিওপেট্রা সর্বসমক্ষে তার সন্তান সিজারিয়ানের পিতৃত্বের কথা ঘোষণা করেন।

৪৪ খ্রিস্টপূর্বের ৫ই মার্চ রোমে সিজার নিহত হন। রোমান রিপাবলিকের সিনেট সিজারকে রোমের একনায়ক ঘোষণা করার পর তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে তিন রোমান সিনেটর (Three conspirator Roman Senetors against Julius Caeser) ঃ

❑ গাইয়াস ক্যাসিয়াস লংগিনাস (Gaius Cassius Longinus)

❑ ডেসিমাস জুনিয়াস ব্রুটাস আলবিনাস (Decimus Junius Brutus Albinus).

❑ মারকাস জুনিয়াস ব্রুটাস (Marcus Junius Brutus)

একদিন পম্পির থিয়েটারের পাশে এক অনুষ্ঠান চলাকালে এই তিন সিনেটর পরপর ছুরিকাঘাত করে তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

তার মৃত্যুর পর রোমে প্রচণ্ড গৃহযুদ্ধ বেঁধে যায়। ৪৩-৪২ খ্রিস্টপূর্বে জুলিয়াস সিজারের হত্যার প্রতিশোধ নিতে লিবারেটর যুদ্ধ বাধে মার্ক অ্যান্টনি ও অক্টাভিয়ান এর সঙ্গে সিজারের হত্যাকারী মার্কাস জুনিয়াস ব্রুটাস ও ক্যাসিয়াস লঙ্গিনাসের সঙ্গে। এই যুদ্ধে ক্লিওপেট্রা স্বাভাবিক ভাবেই অ্যান্টনি ও অক্টাভিয়ানের পক্ষ অবলম্বন করেন।

লিবারেটরস যুদ্ধের পর খ্রিস্টপূর্ব ৪৩এ রোম সাম্রাজ্যে তিন ব্যক্তির শাসন কায়েম হয়। এরা হলেন ঃ

❑ অক্টাভিয়ান (Octavian)

❑ মার্ক অ্যান্টনি (Mark Antony)

❑ মারকাস এমিলিয়াস লিপিডাস (Marcus Aemillius Lepidus)

৪১ খ্রিস্টপূর্বে অ্যান্টনির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই অ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রার মধ্যে গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়। অ্যান্টনি ক্লিওপেট্রার প্রেমে আসক্ত হয়ে ওঠেন। ক্লিওপেট্রাও অ্যান্টনির প্রতি অনুরক্ত হন গভীরভাবে। ক্লিওপেট্রার গর্ভে অ্যান্টনির তিন সন্তানের জন্ম (Daughter and sons of Cleopetra and Antony) :

❑ আলেকজান্ডার হেলিওস (Alexander Helios) -son

❑ ক্লিওপেট্রা সেলিনি-২ (Cleopetra Selene) daughter

❑ টলেমি ফিলাডেলফাস (Philadelphus) - son

অ্যান্টনি ক্লিওপেট্রার উপর খুব নির্ভরশীল হয়ে পড়েন অর্থ ও সৈন্য সামন্তের সমর্থনের জন্য, বিশেষ করে পার্থিয়ান সাম্রাজ্য ও আর্মেনিয়া রাজত্ব আক্রমনের সময়। অ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রার বিয়ের পর অ্যান্টনির সঙ্গে অক্টাভিয়ানের বোন অক্টাভিয়া মাইনরের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। এর ফলে অক্টাভিয়ান প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন অ্যান্টনির উপর।

অক্টাভিয়ান চাইলেন রোমান সাম্রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে। ৩২ খ্রিস্টপূর্বে অ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন অক্টাভিয়ান। অ্যাক্টিয়ামের যুদ্ধে অক্টাভিয়ান জেনারেল মার্কাস বিপসানিয়াস অ্যাগ্রিপ্পার নেতৃত্বে সৈন্য পাঠান। দীর্ঘদিন ধরে এই যুদ্ধ চলে।

অ্যাক্টিয়ামে অক্টাভিয়ানের নৌবাহিনীর নিকট অ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রার নৌবাহিনী পরাজিত হয়। তারপর অক্টাভিয়ান এক বছর অপেক্ষা করেন মিশরকে রোমের একটি প্রদেশ ঘোষণার জন্য।

অক্টাভিয়ান ৩০ খ্রিস্টপূর্বে পুনরায় আলেকজান্দ্রিয়া আক্রমণ করেন। অক্টাভিয়ানের বাহিনীর নিকট খুব সহজেই অ্যান্টনির বাহিনী পরাজিত হয়। অক্টাভিয়ানের সেনাবাহিনী ছিল দক্ষ। তাদের যুদ্ধ জাহাজ ও অস্ত্রশস্ত্র ছিল অপেক্ষাকৃত আধুনিক অপরদিকে অ্যান্টনির সেনাবাহিনী তত দক্ষ ছিল না। তার যুদ্ধে ব্যবহৃত যুদ্ধ জাহাজগুলো ঠিক যুদ্ধ জাহাজ ছিল না। ব্যবসার কাজে ব্যবহার করা জাহাজকে যুদ্ধ জাহাজে পরিণত কার হয়েছিল। অ্যান্টনির অস্ত্রশস্ত্র ও ছিল অপেক্ষাকৃত কম ক্ষমতা সম্পন্ন ফলে অক্টাভিয়ানের আক্রমণের মুখে অ্যান্টনির সেনাবাহিনী টিকে উঠতে পারেনি।

যুদ্ধে পরাজিত হয়ে অ্যান্টনি কোনোভাবেই নিজেকে ধরা দিতে চাননি অক্টাভিয়ানের সৈন্যদের কাছে। তিনি ঠিক করলেন এর চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়। অক্টাভিয়ান সৈন্যদের হাতে ধরা পড়ার আগেই অ্যান্টনি নিজের তরবারি বুকে বিঁধে আত্মহত্যা করেন। আত্মহত্যার আগে তিনি সহযোদ্ধাদের বলেছিলেন তার দেহ যেন ক্লিওপেট্রার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। তার সহযোগীরা তাকে আলেকজান্দ্রিয়ার এক পাহাড়ের গোপন আস্তানায় ক্লিওপেট্রার কাছে নিয়ে যায়। ক্লিওপেট্রার বুকে রক্তাক্ত অ্যান্টনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

অক্টাভিয়ান যুদ্ধ জয় করার পর তার সেনাবাহিনী আলেকজান্দ্রিয়া প্রবেশ করে। অক্টাভিয়ানের সৈন্যরা ক্লিওপেট্রাকে খুঁজতে থাকে। অক্টাভিয়ান ক্লিওপেট্রার তিন ছেলে মেয়েকে সঙ্গে সঙ্গে বন্দি করেন। তিনি জানেন ছেলে মেয়েদের জন্যই ক্লিওপেট্রা ধরা দেবেন। ক্লিওপেট্রা তার গোপন আস্তানা থেকে বেরিয়ে এসে অক্টাভিয়ানের সঙ্গে দেখা করলেন। ক্লিওপেট্রা অক্টাভিয়ানের সঙ্গে দেখা করলে অক্টাভিয়ান তার সঙ্গে অত্যন্ত ভালো ব্যবহার করেন এবং তাকে তার সঙ্গে রোম যেতে অনুরোধ করেন। তিনি তাকে জানান যে রোমের রাজপথে যে বিজয় ও আনন্দ উৎসব হবে সেখানে তাকে নিয়ে তিনি অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক। তাকে এ কথা বলেও আশ্বস্ত করেন যে তাকে উপযুক্ত সম্মান দেওয়া হবে ও তার কোন ক্ষতি করা হবে না। এ প্রস্তাবে ক্লিওপেট্রা রাজি হতে পারলেন না।

তার গুপ্তচর তাকে খবর এনে দেয় যে তিন দিনের মধ্যে অক্টাভিয়ান তাকে জোর করে রোম নিয়ে বিজয় উৎসব করবেন। এও খবর দেয় যে রোমে বিজয় উৎসবের পর তাকে হত্যা করে প্রতিশোধ নেবে অক্টাভিয়ান।

ক্লিওপেট্রা সিদ্ধান্ত নেন এর চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়। তার দুই সহচরী এইরাস ও চারমিয়ানকে নির্দেশ দেন তার জন্যে মিশরের সবচেয়ে বিষধর গোখরো সাপ 'অ্যাসপ' (Asp) নিয়ে আসার জন্য। ১২ই আগস্ট ৩০ খ্রিস্টপূর্ব তারিখে ওই বিষধর সাপের কামড়ে তিনি মৃত্যুকে বরণ করে নেন। এভাবে প্রচলিত আছে যে ক্লিওপেট্রা ওই বিষধর সাপ তার বুকের উপর

ছেড়ে দেন ও ওই সাপ তৎক্ষণাৎ তার বুকে কামড়ে বিষ ঢেলে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ক্লিওপেট্রা মৃতু মুখে ঢলে পড়েন। তার দুই সহচরীও তার সঙ্গে মৃত্যুবরণ করেন ওই সাপের কামড়ে। এভাবেই ক্লিওপেট্রার বৈচিত্র্যময় জীবনের মর্মান্তিক অবসান হল।

ক্লিওপেট্রার মৃত্যুর পর তার গর্ভজাত জুলিয়াস সিজারের ছেলে সিজারিয়ানকে নামে মাত্র আলেকজান্দ্রিয়ায় ক্ষমতায় বসানো হয়। কিন্তু তার মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই তাকে খুন করা হয়। ক্লিওপেট্রার গর্ভজাত অ্যান্টনির ছেলেমেয়েদের রেহাই দেন অক্টাভিয়ান। ছেলেদের দায়িত্ব অ্যান্টনির রোমান স্ত্রী তার বোন অক্টাভিয়ান মাইনরের হাতে তুলে দেওয়া হয়। মেয়ে ক্লিওপেট্রা সেলেনিকে মৌরিতানিয়ান রাজপরিবারে বিয়ে দেওয়া হয়।

ক্লিওপেট্রা ও তার ছেলে সিজারিয়ানের মৃত্যুর পর মিশরে টলেমি রাজত্বের অবসান হয়। সঙ্গে সঙ্গে মিশরে ফারাও শাসনেরও ইতি টানা হয়। অনেকদিন একটি প্রদেশ হিসাবে মিশর রোমের অধীনে থাকে– তার রাজধানী থাকে এই আলেকজান্দ্রিয়া।

আলেকজান্দ্রিয়ার কথা বলে শেষ করা যাবে না। কত শত কাহিনি কত দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মানুষের মুখে মুখে।

আমরা আলেকজান্দ্রিয়া ছেড়ে সকলে চলেছি গিজার উদ্দেশ্যে। ডেজার্ট রোড ধরে মিশরের বুক চিরে ঘণ্টায় একশো কিলোমিটারের বেশি গতিতে । ফাঁকা রাস্তা। দুই পাশে ধু ধু মরুভূমি শুধু। এক টানা সোজা রাস্তা মাইলের পর মাইল, আঁকা বাঁকা কম। সাঁই সাঁই শব্দে বাতাস কেটে ছুটছে আমাদের বিলাসবহুল বাসটি। বাসের ভিতরে বসে আমরা যেন নিরবতার সাগরে ডুবে আছি। একবার গাইড শুধু বলল, সময় লাগতে পারে আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা। মরুভূমির মাঝ দিয়ে চলেছে আমাদের বাস, মাঝে মাঝে দুই একটা উটের গাড়ির জন্যে আমাদের বাসের গতি একটু কমাতে হচ্ছে।

আজ সকালে মনটা বিষাদে ভারাক্রান্ত সকলেরই– আলেকজান্দ্রিয়া ছেড়ে যাচ্ছি তাই। তন্ময় হয়ে এতক্ষণ আলেকজান্দ্রিয়া নিয়েই ভাবছিলাম আমিও।

একসময় সারা বিশ্বের সবচেয়ে বড় শহর ছিল আলেকজান্দ্রিয়া, ছিল মিশরের রাজধানী, ছিল আলাদা অহংকার। এত রোমাঞ্চকর কাহিনি জড়িয়ে এই শহরের সঙ্গে, বিদেশি শাসকদের এত আক্রমণ পৃথিবীর আর কোন শহরে এমন হয়েছে বলে মনে হয় না। এত আকর্ষণ এ শহরের। বিদেশ থেকে রাজা মহারাজারা, বীর সেনাধ্যক্ষরা, পর্যটকেরা হাজার হাজার বছর ধরে শহরটির টানে এসেছে। আমরাও দেখতে গিয়ে বার বার হারিয়ে গিয়েছি ইতিহাসের পাতায় ক্লিওপেট্রার দীর্ঘ একুশ বছরের শাসনামলে, মিশরের বিষধর সাপের ছোবলে মৃতুকে বরণ করে নেওয়ার করুণ কাহিনিতে–ক্লিওপেট্রার দীর্ঘশ্বাসে।

ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকতে গিয়ে কূটনীতির যে পারদর্শিতা তাকে দেখাতে হয়েছে তেমন ভাবে অন্য কোন নারী শাসককে কোন কালে দেখা যায়নি। সে জন্যই দীর্ঘ একুশ বছর একটানা

ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ দেশের শাসন ব্যবস্থায় টিকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন নিজেকে। এর মধ্যে নিজের ক্ষমতা নিরঙ্কুশ রাখতে রয়েছে প্রেম অথবা ক্ষমতার অলিন্দে থাকার বাসনায় নিজেকে সমর্পণ অথবা শত্রুর মোকাবিলায় জুলিয়াস সিজারের সঙ্গে সম্পর্কে জড়ানোয়।

আবার এও দেখলাম অ্যান্টনিকে মনে প্রাণে ভালোবেসেছিলেন ক্লিওপেট্রা। অ্যান্টনির তিন সন্তান গর্ভে ধারণ করেছেন ক্লিওপেট্রা। আলেকজান্দ্রিয়ায় বসে শাসন করেছেন মিশর। অক্টাভিয়ানের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে গিয়ে অ্যান্টনি আত্মহননের পথ বেছে নেন। অ্যান্টনির মৃত্যু সংবাদ পেয়ে প্রচণ্ড ভেঙ্গে পড়েছিলেন ক্লিওপেট্রা। অক্টাভিয়ানের শত প্রলোভনেও তার হাত ধরেননি। বিষধর সাপের কামড়ে শেষ করে দিলেন নিজের জীবন, শেষ করে দিলেন দুই দশকের রাজপাট। শুধুই প্রেমের মহিমা রচনা করে গেলেন তিনি কালজয়ী এক ট্রাজেডির মধ্য দিয়ে।

শেক্সপিয়ার ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে জুলিয়াস সিজার, অ্যান্টনি আর ক্লিওপেট্রাকে নিয়ে মর্মস্পর্শী নাটক রচনা করেছিলেন। শেক্সপিয়ার তাদের প্রেমকাহিনী নিয়ে যে নাটক লিখেছেন সারা বিশ্বে সর্বকালের সেরা প্রেমকাহিনি রূপে আদৃত হয়েছে।

১৯৬৩ সালে ওয়াল্টার ওয়াগনারের প্রযোজনায় হলিউডের পরিচালক জোশেপ এল মানকুইকজ 'ক্লিওপেট্রা' নামে সেই সময়ের সবচেয়ে বড়ো বাজটের একটি সিনেমা তৈরি করেন। এতে অভিনয় করেন তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সুন্দরী নায়িকা এলিজাবেথ টেলর। সঙ্গে অন্যান্য তারকাদের মধ্যে ছিলেন রিচার্ড বার্টন ও রেক্স হ্যারিসন। বিশ্বের সেরা সুন্দরী এলিজাবেথ টেলরের অভিনয় দেখে বহু বছর বহু দর্শক চোখের জল ফেলতে ফেলতে সিনেমা হল থেকে বেরিয়েছে।

Cleopatra was born in 69 BC and died on 12 August 30 BC.

She was the last active ruler of the Ptolemaic Kingdom of Egypt. She was also a diplomat, naval commander, linguist, and medical author. As a member of the Ptolemaic Dynasty, She was a descendant of its founder Ptolemy-I Sotar, a Macedonian Greek General and Companion of Alexander the Great. After the death of Cleoptra Egypt became a province of the Roman Empire.

Her own language was Koine Greek and she was the first Ptolemaic ruler to learn the Egyptian language.

After a revolt in Egypt Ptoloemy XII allowed his eldest daughter Berenice IV to claim the throne. In 58 BC Cleoptra accompanied her father Ptolemy XII during his exile to Rome. Berenice IV was killed in 55 BC when Ptolemy XII returned to Egypt with Roman military help.

When Ptolemy XII died in 51 BC Cleopatra and her Younger brother Ptolemy XIII became joint rulers, but quarrel between them led to a civil war. After losing the 48 BC Battle of Pharsalus in Greece against his rival Julius Caesar in Caesar's Civil War, the Roman statesman Pompey the Great fled to Egypt, a Roman client state. After Pompey was killed, Caesar occupied Alexandria in pursuit of Pompey.

Caesar attempted to reconcile Ptolemy XIII with Cleoptra. But Ptolemy XIII's Chief Adviser Potheinos noticed that Caesar's terms as favoring Cleopatra, so his forces, which eventually fell under the control of Cleoptra's younger sister Arsinoe IV, attacked and arrested both Caesar and Cleoptra at the palace of Caesar.

The siege was lifted by reinforcements in early 47 BC and Ptolemy XIII died shortly thereafter in the Battle of the Nile. Arsinoe IV was exiled to Ephesus and Caesar, now an elected dictator declared Cleopatra and her younger brother Ptolemy XIV as joint rulers of Egypt. However, Caesar maintained a private affair with Cleopatra that produced a son, Caesarion.

In 46 and 44 BC Cleopatra traveled to Rome as a client queen, staying at Caesar's villa as a Royal Guest. After assassination of Caesar in 44 BC Cleopatra made an attempt ot have Caesarion named as heir.

But Caesar's grandenephw Octavaian, also known as Augustus by 27 BC became the first Roman emperor had Ptolemy XIV was killed and Cleopatra then attempted her son Caesarion as co-ruler.

Cleopatra sided with the Roman Second Triumvirate formed by Octavian, Mark Anotny and Marcus Aemilius Lepidus in the Liberators' civil war of 43-42 BC.

After their meeting at Tarsos in 41 BC, Cleopatra had an affair with Antony that would eventually produce three children Alexander helios, Cleopatra Selene II, and Ptolemy Philadelphus. Antony used his authority as triumvir to carry out the execution of Arsinoe IV at Cleopatra's request.

Antony became too much reliant on Cleopatra for both funding and military aid during his attack to the Parthian Empire and the Kingdom of Armenia. In the Donations of Alexandria, Cleopatra's children with Antony were declared rulers over various territories under Antony's authority. This event, along with Antony's marriage to Cleopatra and divorce of Octavia Minor, sister of Ovtavian, led to the Final War of the Roman Republic.

Octavian forced Antony's allies in the Roman Senate to flee Rome in 32 BC and declared war on Cleopatra. The naval fleet of Antony and Cleopatra was defeted at the 31 BC Battle of Actium by Octavin's General Agrippa. Octavin's forces intruded Egypt in 30 BC and defeated force of Antony, leading to his suicide.

Cleopatra came to know that Ovtavian planned to bring her to Rome for his procession of triumph, she committed suicide by poisoning, bitten by a snake Asp.

Cleopatra's legacy survives in numerous works of art, both ancient and modern, and many dramatisations of incidents from her life in literature and other media.

She was the subject of many works in Renaissance and Baroque art, which included sculpture, paintings, poetry, theatrical dramas such as William Shakespeare's Antony and Cleopatra in 1608 and operas such as George Frideic Handel's Giulio Cesare in Egitto in 1724.

In modern times Cleopatra has appeared in both the applied and fine arts, burlesque satire, Hollywood films such as Cleopatra in 1963.

সারাপথ ভাবছি আর মিলিয়ে দেখছি সেদিনের সাথে আজকের দেখা আলেকজান্দ্রিয়াকে। এত ঝড়ঝঞ্ঝার পরও সে শহরটি আবার প্রাণ চঞ্চল। তাই সহযাত্রিরা সকলেই চুপ, আলেকজান্দ্রিয়ার বিরহে বিষণ্ণ।

পাশে বসা দীপালীকে ছোট্ট একটা ধাক্কা দিয়ে বললাম, 'কি ভাবছ? এত চুপ যে!'

দীপালীও যেন সম্বিত ফিরে পেল।

'তুমিও তো চুপ। সারা বাসটাই চুপ দেখেছি? সত্যিই আমরা আলেকজান্দ্রিয়াকে এত ভালোবেসে ফেলেছি এই দুই দিনে। ফিরে যেতে মন চাইছে না। এখানকার মানুষ, যাদুঘর, ভূমধ্যসাগরবেলা, সমুদ্র স্নান, সুন্দর রাস্তাঘাট সব কিছুই আমাদের স্মৃতিতে জড়িয়ে রাখবে অনেক দিন'—বলে চলে দীপালী।

পিছনের সিটে বসা ডাঃ সুনীল নাগ ও তার স্ত্রী আমাদের কথা শুনে ফেললেন। তারাও নিরবতা ভাঙলেন আমাদের কথায়। সুনীলদা বললেন, 'সত্যিই তপন, মনটা ভারি হয়ে উঠেছে আমাদেরও। এত অল্প সময়ে এত প্রেমে পড়ে যাব আলেকজান্দ্রিয়ার!'

সুনীলদার কথার রেশ ধরে আবার বাসের সকলের মধ্যে প্রাণ চাঞ্চল্য, আবার কলরোল।

ছুটে চলেছি আলেকজান্দ্রিয়া সীমানা ছাড়িয়ে। এই আলেকজান্দ্রিয়াকে রাজধানী করে কত বিদেশি রাজারা সারা মিশর কব্জা করেছে। শস্য আর সম্পদ নিয়ে গেছে তাদের দেশে। বাইরে থেকে এসেছে, আক্রমণ করেছে, যুদ্ধ করেছে, দখল করেছে। কতবার শহরে ধ্বংসযজ্ঞ হয়েছে। প্রায় ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে আলেকজান্দ্রিয়া আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

মিশরীয় ফারাওরা যতই দুর্বল হয়েছে ততই এসেছে বহিঃশত্রুর আক্রমণ। মিশরের উপর পাশের দেশ ইথিওপিয়ান রাজাদের থেকে আসে আক্রমণ। তারপর লিবিয়ার রাজারা এসে দখল করল মিশর। ৫২৪ খ্রিস্টপূর্বে পার্শিয়ানরা আক্রমণ করল। এরপর আসেন গ্রীসের মেসিডোনিয়া থেকে আলেকজান্ডার দি গ্রেট। তিনি অবশ্য প্রবেশ করেছিলেন পার্শিয়ানদের থেকে মিশরের মানুষের মুক্তিদাতা হিসাবে। গ্রীসের পর আসে রোমের শাসন—জুলিয়াস সিজারের সৈন্যবাহিনী প্রবেশ করে আলেকজান্দ্রিয়ায়। রোমের একটি প্রদেশ রূপে দীর্ঘদিন শাসিত হয় মিশর। রোমান শাসনের সময়কালেই গ্রীক ও ইহুদিদের মধ্যে প্রচণ্ড গৃহযুদ্ধ বাধে ৩৮ এবং ৬৬ খ্রিস্টাব্দে। ১১৫ খ্রিস্টাব্দে কিটোর যুদ্ধে আলেকজান্দ্রিয়ার ভয়ানক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

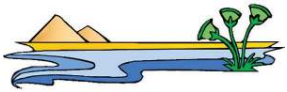

মিশরে মুসলিম শাসন ও ইসলাম ধর্ম
Muslim Rule in Egypt & Islam Religion

৬২৮ খ্রিস্টাব্দে মিশরে জাইদ ইবন হারিতাহ অভিযান পরিচালনা করেন নবী হজরত মোহাম্মদের নির্দেশে। ইসলামের নবী হজরত মোহাম্মদ আরব থেকে তাঁর দূত হাতিব বিন আবি বালতাহকে আলেকজান্দ্রিয়ার সম্রাট হেরাক্লিয়াসের নিকট পাঠান।

হাতিব বিন আবি বালতাহ মারফত তিনি সম্রাট হেরাক্লিয়াসকে বলেন, 'আপনারা সকলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করুন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে মহামহিম আল্লাহ আপনাকে ও আপনাদের সকলকে পুরস্কৃত করবেন, আর না করলে পাপের অংশীদার হবেন ও তার ফল ভোগ করতে হবে আপনাদের সকলকেই।'

দিয়াহ বিন খলিফা কালবি সম্রাট হেরাক্লিয়াসের সৈন্যদের দ্বারা আক্রান্ত হন। হজরত মোহাম্মদ জাইদ ইবন হারিতাহকে ৫০০ জন সৈন্য সমেত আরব থেকে দিয়াহ বিন খলিফা কালবিকে সাহায্যের জন্য পাঠান।

জাইদ ইবন হারিতাহ ও তার সৈন্যদের বানু জুধামের সঙ্গে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে প্রতিপক্ষের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। তাদের বহু সৈন্য নিহত হয়। এমনকি বানু জুধামের প্রধান সেনাপতি আল-হুনায়েদ ইবন আরিদ ও তার ছেলে নিহত হয়। জাইদ ইবন হারিতাহের হাতে এই যুদ্ধে বানু জুধামের ১০০০ উট, ৫০০০ গবাদি পশু ও ১০০ নারী ও শিশু বন্দী হয়। তখন বানু জুধাম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি হজরত মোহাম্মদের নিকট তার অনুসারি সকলের মুক্তি চান। হজরত মোহাম্মদ সকলের মুক্তি দেন। বানু জুধামের সকল অনুসারি পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

আমর-ইবন-আল-আস মিশরে আসেন ৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে। তিনি মিশরে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তন শুরু করেন ব্যাপকভাবে। তার সময়ে দলে দলে মিশরীয়রা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকেন।

বর্তমানে মিশরে ৯০ শতাংশ মানুষ ইসলাম ধর্মালম্বী। তাদের অধিকাংশ সুন্নি, বাকি কিছু আছে শিয়া ও আহমদি মুসলিম। যদিও মিশরে শিয়া ও আহমদিদের মুসলমান স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। বাকি ১০ শতাংশ খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী।

৬৪১ খ্রিস্টাব্দ থেকে আরবদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় মিশরে। আলেকজান্দ্রিয়ার রাজধানীর মর্যাদা শেষ হয়ে যায়। শহরটির গরিমা ক্রমেই ক্ষীণতর হতে থাকে। অটোম্যান রাজত্বে একটি সামান্য মাছ ধরার গ্রামে পরিণত হয় আলেকজান্দ্রিয়া।

অটোম্যান রাজত্বের পর মুসলিম শাসকরা মিশর শাসন করতে থাকেন। এক একটি যুগের শাসন চলে বহু সময় ধরে। যেমন–

মিশরে মুসলিম শাসক(Muslim Rulers of Egypt) :-

❑ রাশিদিন যুগ (৬৪১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৬৬১ খ্রিস্টাব্দ) (Rashidin Period : 641-661)

❑ উন্মায়েদ যুগ (৬৬১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ) (Umayyad Period 661-750)

❑ আব্বাসিদ যুগ (৭৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ) (Abbasid period : 750-935)

❑ টুলুনিদ যুগ (৮৮৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৯০৫ খ্রিস্টাব্দ) (Tulunid period 886-905)

❑ ইখসিদিদ যুগ (৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ) (Ikhshidid Period 935-969)

❑ ফাতিমিদ যুগ (৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১১৭১ খ্রিস্টাব্দ) (Fatimid Period 969-1171)

❑ আয়ুবিদ যুগ (১১৭১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২৫০ খ্রিস্টাব্দ) (Ayyubid Period 1171-1250)

❑ মামলুক যুগ (১২৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দ) (Mamluk Period (1250-1517)

ফুস্টাট শহর যা কিছুদিনের জন্য মিশরের রাজধানীর মর্যাদা পেয়েছিল পরে তা মিশে যায় কায়রোর সাথে। ফাতিমিদ রাজবংশের সময় ৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে পাকাপাকি ভাবে মিশরের রাজধানী কায়রো প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এ সময়ে আলকজান্দ্রিয়া পুরোপুরি অবহেলিত এক শহর।

Now Islam in Egypt is the dominant religion with around an estimated 90% of the population. Almost the entirety of Egypt's Muslims are Sunnis, with a small minority of Shia and Ahmadi Muslims. The latter, however, are not recognized by Egypt. Islam has been recognized as the state religion since 1980.

The Christians are estimated to be number between 8% to 12% according to sources cited in articles– Religion in Egypt and Christianity in Egypt.

In 628 was the Islamic prophet Muhammad's first interaction with the people of Egypt, during the expedition of Zaid Ibn Harithah. He sent Hatib bin Abi Baltaeh with a letter to the King of Egypt, in reality to emperor Heraclius.

Muhammad in the letter said : "I invite you to accept Islam, Allah the sublime, shall reward you doubly. But if you refuse to do so, you will bear the burden of the transgression of all the Copts."

Dihyah bin Khalifa Kalbi was attacked during this expedition one of Muhammad's envoys, Muhammad sent Zayd ibn Harithah to help him. Dihya approached the Banu Dubayb for help. When the news reached Muhammad, he immdiately dispatched Zayed ibn Harithah with 500 men to battle.

The Muslim army fought with Banu Judham, killed several of them including their Chief Al-Hynayd ibn Arid and his son and captured 1000 camels, 5000 of their cattle and 100 women and boys. The new Chief of the Banu Judham who had embraced Islam appealed to Muhammad to release his fellow tribesmen, and Muhammad released them.

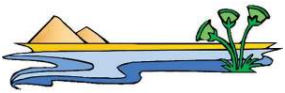

মিশরের স্বাধীনতা
Independence as Republic of Egypt

মামলুক শাসন আমল চলে ১২৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এরপর আসেন তুরস্কের অটোম্যান শাসকদল। তারা মিশর শাসন করেন ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময় কাল। ফ্রান্সের নেপোলিয়ন ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে আলেকজান্দ্রিয়া দখল করেন। এর মধ্যে অল্প কিছুদিনের জন্য ফরাসি শাসকদের অধীনে চলে যায় মিশর ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে থেকে ১৮০১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। আলবেনিয়া থেকে মহম্মদ আলি মিশরের শাসন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আসেন। তিন তিনবার গৃহযুদ্ধ বাধে ১৮০৩ থেকে ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। যুদ্ধ হয় তুরস্কের অটোম্যান, মামলুক ও আলবেনিয়ার সৈন্যদের সঙ্গে। ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দেই মোহাম্মদ আলি সকল বিদেশি প্রভাব মুক্ত মিশরের একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারি হন। তার সময় কাল ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। মামলুক, অটোম্যান ও মহম্মদ আলি শাসকেরা সকলেই কায়রোর উন্নতির দিকে সবসময় নজর দেন। ইসলাম ধর্ম কায়েম করেন সারা মিশরেই। আলেকাজান্দ্রিয়া তখন প্রায় মৃত এক নগরী।

১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে মিশর ব্রিটিশ কর্তৃত্বাধীনে চলে যায়। বহু বছর ব্রিটিশ মিশর শাসন করে। সর্বশেষ ব্রিটিশ সেনা সরিয়ে নেয় ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে। এর মধ্যে মিশরীয়দের স্বাধিকারের আন্দোলন, যুদ্ধ অনেক কিছু হয়েছে। দুই দুটো বিশ্বযুদ্ধ দেখেছে মিশর এই ব্রিটিশ কর্তৃত্বাধীনে থেকে। সে এক লম্বা ইতিহাস। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ব্রিটিশ অভিভাবকত্বে সুলতানেত শাসন চলে। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার একতরফা মিশরের স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত নামে মাত্র স্বাধীন ছিল মিশর। বৈদেশিক, সেনা ও অর্থ- সকল ক্ষমতাই ছিল ব্রিটিশ কর্তৃত্বে।

১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে ঈঙ্গ-মিশর চুক্তি হয়। মিশরে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ব্রিটিশ সেনা ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও আধিপত্য চলতে থাকে। ২৮শে এপ্রিল ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে রাজা ফুয়াদ-১ এর মৃত্যুর পর তার ছেলে রাজা ফারুককে ব্রিটিশ শাসক ক্ষমতায় বসিয়ে পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠা করে। ক্রমেই জনতার অসন্তোষ বাড়তে থাকে রাজা ফারুকের

বিরুদ্ধে। দুর্নীতিতে ডুবে গিয়েছিল রাজা ফারুকের শাসন ব্যবস্থা। ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে জনগন। রাজা ফারুকের সময় মিশরে ওয়াফদ পার্টি গঠিত হয়। এরা ব্রিটিশ আধিপত্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে।

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে মিশরে কট্টরপন্থি কম্যুনিস্ট পার্টির জন্ম হল। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম ব্রাদারহুড নামে আরও একটি চরমপন্থী দলের সৃষ্টি হয়। ১৯৪৮-৪৯ খ্রিস্টাব্দে প্যালেস্টাইন যুদ্ধ বাধে। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে মিশরে স্বাধিকারের সর্বাত্মক বিপ্লব শুরু হয়। ২৬শে জুলাই ১৯৫২ তারিখে রাজা ফারুক তার ছেলে ফুয়াদ-২ কে ক্ষমতা ছেড়ে দেন। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে রাজতন্ত্রের অবসান হয় ও মিশর প্রজাতন্ত্র ঘোষণা হয়। ফুয়াদ-২ কে সুইজারল্যান্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ব্রিটিশ ও মিশর চুক্তি অনুসারে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে মিশর পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা পায়।

Muhammad Ali came to power through three civil wars beween the Ottoman Turks, Egyptian Mamlukhs, and Albanian mercenaries, lasted from 1803 to 1807. Albanian Muhammad Ali Pasha took over the control of Egypt in 1805 and the Ottoman Sultan acknowledged his position. Thereafter, Muhammad Ali was the undisputed ruler of Egypt.

Egypt from 1805 to 1953 spanned the later period of Ottoman Egypt. French occupation, Muhammad Ali Pasha dynasty, the Khedivate of Egypt under British patronage, and the nominally independent Sultanate of Egypt and Kingdom of Egypt. Ending with Revolution of 1952 and the formation of the independent Republic of Egypt.

আধুনিক মিশরের প্রথম দিকের দখলদার বা শাসকরা ছিলেন (Early Rulers of Modern Egypt) :

❑ অটোম্যান ঃ ১৫১৭ সাল থেকে ১৮৬৭ সাল (Ottoman Egypt : 1517-1867)

❑ ফরাসি দখলদার ঃ ১৭৯৮ সাল থেকে - ১৮০১ সাল (French occupation : 1798 - 1801)

❑ মুহম্মদ আলি ঃ ১৮০৫ সাল থেকে ১৮৮২ সাল (Muhammad Ali 1805 - 1882)

❑ খেডিভেট ঃ ১৮৬৭ সাল থেকে - ১৯১৪ সাল (Khedivate of Egypt 1867 - 1914)

❑ আধুনিক মিশরের শাসক (Rulers of Modern Egypt) :-

❑ বৃটিশ শাসন ঃ ১৮৮২ সাল থেকে ১৯২২ সাল (British Ocupation : 1882 -1922)

❑ সুলতানেত শাসন ঃ ১৯১৪ সাল থেকে ১৯২২ সাল (Sultanate of Egypt : 1914-1922)

❑ মিশর রাজত্ব ঃ ১৯২২ সাল থেকে - ১৯৫৩ সাল (Kingdon of Egypt. 1922-1953)

❑ মিশর রিপাবলিক ১৯৫৩ সাল থেকে বর্তমান সময় (Republic 1953 to Present period)

Egypt under the British lasts from 1882, When it was occupied by British forces during the Anglo-Egyptian War, continued until 1956, when the last British forces withdrew in accordance with the Anglo-Egyptian agreement of 1954 after the Suez Crisis.

The First period of British rule from 1882 to 1914 is called the "veiled protectorate" During this time the Khedivate of Egypt remained an autonomous province of the Ottoman Empire and the British occupation had no legal basis but constituted a de facto protectorate over the country. This state of affairs lasted until the Ottoman Emmpire joined the Frist World War on the side of the Central Powers in November 1914 and Britain unilaterally declared a protectorate over Egypt. The ruling Khedive was deposed and his successor, Hussein Karmel, compelled to declare himself Sultan of Egypt Independent of the Ottomans in December 1914.

The formal protectorate over Egypt did not long outlast the war. It was brought to an end by the uniliateral declaration of Egyptian independence on 28 February 1922. Shortly afterwards, Sultan Fuad-1 declared himself King of Egypt and the British occupation continued, in accordance with several reserve clauses in the declaration of independence. The situation was normalise in the Anglo-Egyptian treaty of 1936, which granted Britain the right to station troops in Egypt for the defence of the Suez Canal.

In December 1921, the British auhorities in Cairo imposed martial law and once again deported Zaghlul. Demonstration again led violence. In deference to the growing nationalism and at the suggestion of the High Commissioner, Lord Allenby, UK Unilaterally declared Egyptian independence on 28 February 1922, abolishing the protectorate and establishing in Egypt to liberate Egypt. Another Nationalist fundamentalist group-Muslim Brotherhood Party was also formed for struggle against British occupationist.

Britain also continued to control the training of the Egyptian Army. During the Second World War from 1939 to 1945, Egypt came under

attack from Italian Libya on account of the British presence there, although Egypt itself remained neutral until late in the war. After the war Egypt sought to modify the treaty, but it was abrogated in its entirety by an anti-British Government in Octobor 1951. After the the Egyptian Revolution of 1952, the British agreed to withdraw their troops and by June 1956 had done so, Britain went to war against Egypt over the Suez Canal in late 1956, but with insufficient international support was forced to back down. During World War II, British troops used Egypt as base for Allied operations through the region.

British troops were withdrawn to Suez Canal area in 1947, but nationalist anti-British feelings continued to grow after the war. The Egyptian Revolution of 1952 overthrew the Egptian monarcy, eliminated the British military presence in Egypt.

In 1952 anti Britsh Movement spreaded all over Egypt. King Farouk handed over his power to his son Fuad-2. With the grown up movement against the British rulers and with the demand of complete withdrawn of British troops from Egypt, King Fuad-2 was sent in exile to Switzerland..

In 1956 Egypt got its complete independence as Republic of Egypt. All British troops, Officers and Buerocrates were sent to Britain.

Following the 1952 Revolution by the Free Officers Movement the rule of Egypt passed to military hands. On 18 June 1953. the Egyptian Republic was declared, with General Muhammad Naguib as the first President of the Republic, serving in that capacity for a little under one and a half years.

Naguib was forced to resign in 1954 by Gamal Abdel Nasser - a Pan-Arab and the real architect of the 1952 movement - and was later put under house arrest. After Naguib's resignation the position of President was vacant until the election of Gamal Abdel Nasser in 1956.

Nasser assumed power as President in June, 1956. British forces completed their withdrawal from the occupied Suez Canal Zone on 13 June 1956. He nationalised the Suez Canal on 26 July 1956 promting the 1956 Suez Crisis.

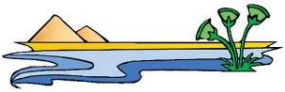

কেনা কাটা
Shopping

দুপুর হয়ে এল। গিজার কাছে পৌঁছে গেছি আমরা। লাঞ্চের জন্য কোন একটা রেস্টুরেন্টে নিয়ে যাবে গাইড। বাস চলতে চলতে গাইড সকলকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা কি আগে লাঞ্চ করবেন নাকি কেনাকাটার জন্য কোন দোকানে থামবেন?' গাইডের কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে দীপালী, ভারতী, সুচেতা বৌদি সমস্বরে বলে উঠল, 'আগে কেনাকাটা- পরে লাঞ্চ। খিদে লাগেনি, বাসে তো সকলেই কিছু খেয়ে নিয়েছি।'

গাইডও একটু রসিকতা করে বলে উঠল, 'আমি জানতাম এখানে কেনা কাটার কথাই উঠবে। আর কেউ সেটাতে বাধা দিতে পারবেন না। চলুন ইজিপশিয়ান কটনের একটা ভালো দোকানে নিয়ে যাব। একেবারে খাঁটি জিনিস নিয়ে যাবেন আপনাদের দেশে। দামেও সঠিক তবে এখানে কিন্তু বারগেনিং চলবে না, একদামের দোকান।' এতে আমরাও খুশি। অন্ততঃ ঠকার সম্ভাবনা থাকবে না।

মিনিট কুড়ির মধ্যেই একটা বড়ো দোকানের সামনে গিয়ে বাসটি থামল। ভিতরে ঢুকে দেখলাম অজস্র কাপড়ের সম্ভার সাজিয়ে নিয়ে বসে আছে। কি নেই সেখানে- মেয়েদের পোশাক, ছেলেদের পোশাক, বাচ্চাদের পোশাক- রকমারি রং, রকমারি ডিজাইন। হাত দিয়ে দেখলাম, সত্যিই গাইড যা বলেছিল - একেবারে খাঁটি ইজিপশিয়ান কটন। অন্ততঃ কিনলে কেউ ঠকবে না। সব রকমের দামের জিনিসই আছে। কম দামি আবার বেশি দামেরও। এখানে লক্ষ্যণীয়- দোকানের মালিক ছাড়া প্রায় আর সকলেই নারী- সেলস গার্ল, বিলিং , প্যাকেজিং সকলেই।

বলাই বাহুল্য মিশরীয় মহিলারা সকলেই অসামান্য সুন্দরী ও স্মার্ট। বাইরের দারোয়ানটি শুধু পুরুষ। মেয়েগুলো ভীষণ চটপটে হাসি মুখ ক্লান্তি নেই - যে যা দেখতে চাইছে নামিয়ে নামিয়ে দেখাচ্ছে। ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতে ওরা সিদ্ধহস্ত বুঝলাম। ওদিকে আমাদের ওরা যত পারে মনের সুখে যে যা পারে, যার যা পছন্দ ব্যাগ ভরছে। পছন্দের তালিকা আর প্যাকেট করার বহর বেড়েই চলেছে। বাড়িতে যাদের রেখে এসেছে, আত্মীয় স্বজন সকলের জন্যই কিনছে দীপালী। বললাম, 'এত যে কিনছ, বাড়ি পর্যন্ত বয়ে নেবে কি করে ভেবেছ একবারও?'

একবার শুধু ঘাড় ফিরিয়ে এক নজর আমার দিকে তাকিয়ে আবার নজর জিনিসের দিকে, কি বললাম দীপালী তা শোনেইনি হয়ত, ও এত ব্যস্ত।

সবগুলো প্যাকেট রেডি হলে দীপালী আমার দিকে বড়ো দুটো প্যাকেট এগিয়ে দিয়ে বলল, 'চল এবার এগুলো নিয়ে পেমেন্ট কর্ণারে যাই। তোমার মানি ব্যাগে যা আছে বের কর, আর আমার কাছে যা আছে এতে হয়ে যাবে।'

দুজনে ধরাধরি করে এগোলাম পেমেন্ট কর্ণারের দিকে। ক্যাশমেমো হাতে নিয়েই দীপালী বলল, 'আমি বলছি আর তুমি একটা একটা করে মিলিয়ে নাও।'

বললাম, 'এখন এটা মিলিয়ে দেখা সম্ভব? মেলানোর কি আছে? এরা কি ফাঁকি দেবে আমাদের?'

—ও কি আর আমার কথা শুনবে?

যেখানেই কিছু কেনাকাটা করবে মিলিয়ে নেবেই। বলেই উঠল, 'পরে বাড়ি গিয়ে ভুল ধরা পড়লে কোনও কাজে লাগবে? কোন ভুলত্রুটি হলে এখন শুধরে নেওয়া যাবে।'

অগত্যা কি আর করা যাবে। সব জিনিসপত্র মিলিয়ে আবার ব্যাগে ভরা কম ঝামেলা তো নয়। এরপর আবার ক্যাশ মেমোর টাকার হিসেব মিলিয়ে নিতে নিতে দীপালী বলল, 'আমি কি এসব শুধু আমার নিজের জন্য করছি?'

বলতে বলতে একটা ভুল বের করল দীপালী। —'এই দেখ একটা সার্টের দাম দুইবার ধরেছে।'

পেমেন্ট কর্ণারে ওদের দেখাতেই ওরা ঠিক করে দিয়ে সঠিক দাম রাখল। এবার দীপালী বলল, 'দেখলে তো, মানুষের ভুল হতেই পারে। দেখে নিলে দোষ কি?'

দাম চুকিয়ে বাসের দিকে চললাম। আমাদের সহযাত্রি সকলেরই হাতে হাতে ব্যাগ।

ভাবলাম, আনন্দ যখন ভাগ করে নিতে পেরেছি এগুলোও বয়ে নিতে পারব। বাড়িতে নিয়ে গেলে এক একজনের হাতে একটা মিশরের গিফট দিলে নিশ্চয়ই মহাখুশি হবে তারা।

বাসে উঠতে উঠতে দীপালী বলল, 'দুই ছেলের জন্য, শাশুড়ি মায়ের জন্য, বাংলাদেশের দাদা বৌদির জন্য, নার্সিংহোমের মেয়েগুলোর জন্য, আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট অঞ্জু আর সংগীতার জন্য, তোমার চেম্বারের অ্যাসিস্ট্যান্ট অমিতের জন্য, গাড়ির ড্রাইভার নিতাইয়ের জন্য আর বাড়ির কাজের মাসিদের জন্যও নিয়েছি। রাজেশ আর মুকেশের জন্য দুই সেট করে টি সার্ট কিনেছি মিশরের পিরামিডের ছবি দেওয়া।'

দীপালী যেখানেই যাবে নিজের জন্য কিছু না কিনুক দুই ছেলে রাজেশ আর মুকেশের জন্য কিনবেই।

বলল, 'খরচ করে ফেললাম সব ইজিপশিয়ান পাউন্ডগুলো। বাড়ি ফিরে ওদের মুখে যে আনন্দ দেখব সেটা কিন্তু অনেক। মিশর বেড়ানোর আনন্দের চেয়ে কি কম আনন্দ হবে, সেটা বল?'

দীপালীর চোখে মুখে আলাদা পরিতৃপ্তি এগুলো কিনতে পেরে। আমিও দীপালীর দায়িত্ববোধের কথা ভাবলাম, বাড়ির সকলের কথাই সে মনে রেখেছে।

বাসে উঠে আর এক সমস্যা। বসার জায়গা হচ্ছে না কারোই। এত ব্যাগ এত প্যাকেট কে কোথায় রাখবে আর কোথায় বসবে।

গাইড বলল, 'একটু কষ্ট করুন। মাত্র পাঁচ মিনিট। চলুন আগে হোটেলে যাই। ওখানে গিয়ে সকলে যার যার জিনিসপত্র ঘরে রাখুন, একটু ফ্রেশ হয়ে নিয়ে তারপর লাঞ্চ হবে।'

সকলেই বলল, 'তাই হবে। এখন সারাদিনের বাস যাত্রার কোন কষ্টই নেই অন্ততঃ আমাদের মহিলা সহযাত্রীদের- হাতে হাতে সবার কটন হাউসের ব্যাগ।'

লাঞ্চ সেরে সকলকে দুই ঘন্টার বিশ্রাম দিয়ে গাইড বললল, 'আজ আপনাদের সন্ধ্যায় নিয়ে যাব বিশ্বের সেরা লাইট এন্ড সাউন্ড শো দেখাতে। ঠিক ছয়টায় বাস ছাড়বে। তার পরদিন সকালে পিরামিড।'

পিরামিড শুনে চমকে উঠলাম। স্বপ্নের পিরামিড দেখব। তার আগে আজ বিশ্বসেরা লাইট এন্ড সাউন্ড। চমকের পর চমক। কি ভাবে দ্রুত কেটে যাচ্ছে সময়গুলো।

সন্ধ্যায় সকলকে হোটেল ছেড়ে উঠতে হবে বাসে। দীপালীকে বললাম, 'দেখি নতুন যে সার্টটা কিনলে আমার জন্যে ওটা পরে যাই লাইট এন্ড সাউন্ড শো দেখতে।' জানি সবগুলো প্যাকেট ঘেঁটে সার্টটা বের করতে হবে তবুও একটুও বিরক্তি নেই দীপালীর চোখে মুখে। আমার সার্টের বোতাম খুলতে খুলতে দীপালী বলল, 'আমি নিজে পছন্দ করে কিনেছি তোমার সার্ট।'

সার্টটা বের করে নিজেই পরিয়ে দিয়ে তারপর খুশি, 'দারুণ হয়েছে তোমার সার্টটা। চল বেরোই।' আমি বললাম, 'তুমিও একটা নতুন কিছু পরে চল।' ও বলল, 'লাগবে না আমার। দেখ, যা পরেছি ঠিক আছে না? চেঞ্জ করতে গেলে আবার দেরি হয়ে যাবে। চল বেরোই।'

বাইরে হোটেলের লবিতে জটলা। দেখি সকলেই একটু অন্য মেজাজে অন্য সাজে। যেন কোন বিয়ে বাড়িতে যাচ্ছি আমরা দল বেঁধে। পর্যটনে এসে সাজগোজের দিকে বিশেষ নজর থাকে না কারও। কিন্তু আজ একেবারেই আলাদা। সেন্টের গন্ধে মউ মউ। বিশেষ করে মহিলারা আজ অন্য মেজাজে আর অন্য সাজে। আসলে সময় শেষ হয়ে আসছে। আর মাত্র একটি দিন মাঝে। তারপর আবার যার যার ঘরে ফেরা।

আবার সেই একঘেয়েমি জীবন। ডাক্তারদের যা হয়—চেম্বার, রোগী, নার্সিংহোম, চব্বিশ ঘন্টা টেনশন- মাঝরাতে এমার্জেন্সি ফোন কল। কয়জন ডাক্তার বলতে পারবে মাঝরাতে ফোন কল ছাড়া একটানা ঘুমিয়েছে নিরবচ্ছিন্ন? মাঝরাতের ফোন-কল, মাঝরাতে নার্সিংহোম বা হাসপাতালে ছোটা—মেনে নিয়েছে ডাক্তারদের বউয়েরাও। আর ডাক্তার বউ হলে তো আগে থেকে মানসিক প্রস্তুতি থাকেই একটা। আমার এখনও মনে আছে বিয়ের দ্বিতীয়

রাতেই রাত বারোটায় হাসপাতাল থেকে কল এসেছিল, রোগী খারাপ। বাকি রাতটা ওই রোগী নিয়েই ব্যতিব্যস্ত ছিলাম হাসপাতালে। ভোরে ঢুলতে ঢুলতে ঘরে এসেছিলাম।

দীপালী শুধু জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কিসের রোগী ছিল?'

ওকে তখন কি উত্তর দিয়েছিলাম আমার মনে নেই।

তবে বুঝেছিলাম সেও সারারাত ঘুমোয়নি। দীপালী একলা ঘরে জেগেই ছিল সারারাত।

এই কটা দিন ছিলাম যেন সেই চেনা পৃথিবীর চেনা গন্ডির বাইরে আলাদা কোন জগতে। চিন্তা নেই ভাবনা নেই-এর পৃথিবী এই মিশর ভ্রমণের কটা দিন।

কিন্তু এভাবে তো আর সারা জীবন চলে না। কাজের মধ্যেই ফিরতে হবে আবার। প্রবেশ করতে হবে বাস্তবতার জগতে, সেই চেনা সংসারে, সেই চেনা ব্যস্ততায়। আবার দায়িত্বের বাঁধা নিয়ম কানুনে।

রোগীর আত্মীয় স্বজনরা সব কিছু ছেড়ে দেন ডাক্তারের হাতে। কিসে দ্রুত আরোগ্য লাভ হবে সেই চিন্তা মাথায় রেখেই প্রতিদিনের ব্যস্ততা আমাদের। অন্য কোনও কিছু ভাববার অবকাশ আর থাকে না। অন্য কোনোভাবে আনন্দ ফুর্তি করার মন মানসিকতাও থাকে না কারও।

কয়েকজন ডাক্তার এক জায়গায় জড় হলেই ওই এক আলোচনা, কার কোন রোগীটা খারাপ আছে, আজ কোন একটা অপারেশন করেছে তাই চিন্তা যতক্ষণ না ভালোভাবে ডিসচার্জ হচ্ছে হাসপাতাল থেকে, কোন রোগীর ক্যানসার ধরা পড়েছে বায়োপসি রিপোর্টে - কি করে রোগীর আত্মীয়কে বলা যাবে - এই সবের মধ্যেই আবদ্ধ।

না রাজনীতি, না সমাজনীতি, না অর্থনীতি—কোন কিছুই মাথায় ঢোকে না আর যেন। সকালে চা খেতে খেতে পাঁচ মিনিটে খবরের কাগজে হেডলাইনে চোখ বুলিয়ে যা জানা যায় দুনিয়ার খবর - ব্যাস ওইটুকুই। কতদিন আগে পরিবারের ছেলে মেয়ে স্ত্রী সাথে নিয়ে সিনেমা দেখেছে ঠিক করে বলতে পারবে না কোন ডাক্তার। ডাক্তার সিনেমা হল থেকে বেরোচ্ছে তিন ঘন্টা সিনেমা দেখে—এ যেন অবাক করা দৃশ্য। চোখ কপালে তুলবে সকলে। ভাবাই যায় না।

কতদিন রাত জেগে টিভিতে ফুটবল খেলা, ক্রিকেট খেলা দেখা হয় না—বলতে পারবে না বেশির ভাগ ডাক্তার। পরদিন সকালে উঠতে হবে, অপারেশন আছে তাই ঘুমিয়ে পড়া সময় মতো। যন্ত্রচালিতের মতো চলেছে সকলে মানব সেবার মহান দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকারে। তাই এই মিশর ভ্রমণের আনন্দ সকলের কাছে এতটাই উপভোগের।

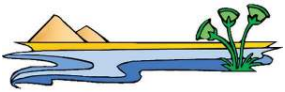

লাইট এন্ড সাউন্ড শো
Light and Sound Show

গাইড এসে বলে গেল, 'বাস এসে গেছে। উঠে পড়ুন। সন্ধ্যা আটটায় শো শুরু। এখানে আটটাতে সন্ধ্যা নামে। অন্ধকার না নামলে লাইট এন্ড সাউন্ড শুরুই হবে না, জমবেও না।'

বাস আমাদের নিয়ে চলল গন্তব্যে। নামিয়ে দিল সকলকে যেখানে শো হবে তার টিকেট কাউন্টারের সামনে। আর বলে দিল শো শেষ হলে আবার ওই জায়গা থেকেই বাসে উঠতে হবে। লাইন দিয়ে টিকেট কাটা হল। শোয়ের জায়গায় গিয়ে বসলাম। ততক্ষণে পুরো আধাঁর নেমে এসেছে সমগ্র এলাকাটিতে। প্রায় এক হাজার মানুষ বসতে পারে এমন ভাবে চেয়ার সাজিয়ে রেখেছে খোলা মাঠে। দলে দলে আসছে বিভিন্ন দেশের মানুষ এই বিশ্বসেরা লাইট এন্ড সাউন্ড শো দেখবে বলে। আমাদের গ্রুপ একেবারে সামনের সারিতে জায়গা করে নিলাম। আমাদের সামনেই একটা দল বিশেষ পোশাক পরে ব্যান্ড বাজাতে লাগল। মনে হল যেন সামরিক ব্যান্ড- যেমন ছন্দ তেমন সুর। ওরা হাটছে মার্চ করছে এদিক ওদিক। আমরা আবার কেউ কেউ চেয়ার ছেড়ে ওদের সাথে ফটো তুলে নিলাম।

আমার ভিডিও ক্যামেরায় ওদের মার্চের ছবিটা ধরে রাখলাম। ক্রমেই মিউজিকের ছন্দ-গতি অন্য মাত্রায় নিয়ে যেতে লাগল।

হঠাৎ মিউজিক থেমে হয়ে গেল। চারিদিকের সমস্ত লাইট বন্ধ হয়ে গেল। অন্ধকার নেমে এল। সকলেই নিরব। দূর থেকে সার্চ লাইট গিয়ে পড়ল সামনের স্ফিংস আর পিরামিডের উপর। সকলেই আগ্রহ আর উত্তেজনায় চুপ।

গুরু গম্ভীর আওয়াজে মাইকে বলে উঠল, 'ওয়েলকাম লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন।' নীরবতা ভেঙে তুমুল করতালিতে ফেটে পড়লাম সকলে। সে করতালি প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল বারে বারে। পিরামিড আর স্ফিংস আমাদের চোখের সামনে এক অতি উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। একি দৃশ্য আমাদের চোখের সামনে - অবিশ্বাস্য

আলোকমালায় সজ্জিত পিরামিড আর স্ফিংস। পাঁচ হাজার বছর আগে ফারাওরা কি আমাদের জন্যই এমন জ্যামিতিক কোণে পিরামিড আর স্ফিংস বানিয়েছিল যে আজ এখানে বসে এক ফ্রেমেই সব দেখতে পাচ্ছি - এই লাইট এন্ড সাউন্ড শোতে! সে সময়ে স্থাপত্যবিদ্যায় তারা কতটা পারদর্শি ছিল ভেবে কুল কিনারা পাই না।

লেসার রস্মি আর আলোর কি অপরূপ প্রয়োগ স্ফিংস আর পিরামিড গুলোর উপর- বিস্মিত হতে হয়। তার সঙ্গে কি সাবলিল ধারা বর্ণনা - সহজ সরল ইংরেজিতে বলে চলেছে ভাষ্যকার। পাঁচ হাজার বছরের সেই পিরামিডই তো ফারাওদের সাক্ষ্য বয়ে চলেছে। এই মোহময় পরিবেশে যেন কথা বলছে স্ফিংস, কথা বলছে পিরামিড, কথা বলছে সমগ্র মিশর আমাদের সাথে। এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে যেন আমরাও লাইট এন্ড সাউন্ডে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছি। ফারাওরা, ফারাও পত্নীরা ও তাদের সন্তানেরা যেন আমাদের সাথে কথা বলে যাচ্ছে। বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির অত্যাধুনিক প্রয়োগে আজ এ লাইট এন্ড সাউন্ড এত প্রাণবন্ত—হৃদয়গ্রাহি হয়ে উঠেছে।

বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির এ ব্যবহার চমৎকৃত করল সকল দর্শককে। এত দীর্ঘ ইতিহাসের বিবরণ দিয়ে চলেছে এমন ভাবে যেন কোথা থেকে ফারাওরা উঠে আসছে কথা বলছে শব্দের মাধ্যমে - নাটকীয়তার মাধ্যমে। বহু কষ্টের মমি কিভাবে চুরি হয়ে গেল, কিভাবে তাদের গায়ে পরানো সোনা-দানা চুরি করে নিয়ে গেল চোরের দল—সকল বর্ণনা। পিরামিড ও স্ফিংস সামনে রেখে প্রাচীন মিশরের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ তুলে ধরা হল এমন ধারাবাহিরতায় কিছুই যেন বাদ পড়েনি। এত দীর্ঘ ইতিহাস তুলে ধরছে অথচ এতটুকু ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটেনি কারও।

Light & Sound, Abol-Hoal Square-Nazlet EI Semman :

Have you ever wondered how life was thousands of years ago? This question and other similar thoughts inspired creators to accompany you for a short while to the past, by introducing the light and sound show. It is a magnificent show that brings creatively to life the rule of ancient Egyptians.

The artists skillfully created a show to present images of all historical eras. For an hour, you enjoy the sound and light show near the Pyramids and the Sphinx. The history is re-told by the Sphinx, telling you the most ancient secrets of the world. In the 21st century, you go back in time thousands of years ago to see how they were built and survived. The show manages to convey the great humane spirit and creativity behind their creation.

মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুধু শুনে গেলাম, শুধু দেখে নিলাম- দুই নয়ন সার্থক হল আজকের এ সন্ধ্যায়। সারা জীবন যেন মনের অলিন্দে গেঁথে থাকবে এ লাইট এন্ড সাউন্ড। সবশেষে ভাষ্যকারের কণ্ঠে শোনা গেল, 'গুড নাইট লেডিজ, গুড নাইড জেন্টলমেন।

সমাপ্ত হল আজকের এ মন ভোলানো বিশ্বসেরা শো। দীপালী যেন আনন্দে বাকরুদ্ধ। বললাম, 'চল। শেষ হয়ে গিয়েছে শো। উঠবে না? হোটেলে ফিরবে না, নাকি এ রাত থেকেই যাবে এখানে?' আমরা সবাই উঠে পড়েছি। দীপালী বসেই আছে তখনও।

দীপালী বলে উঠল, 'তুমি যদি বল আমি আজ রাত থেকে যেতেও রাজি। কি দেখলাম এতক্ষণ! জন্ম সার্থক আমাদের, কি বল? আর পিরামিড না দেখলেও চলে। যেন আস্ত পিরামিড তুলে এনে চোখের সামনে ধরেছে। এমন উপস্থাপনা ভাবা যায়?'

আমি বললাম, 'তা হলে বল কাল আমরা যখন পিরামিডের গায়ে পৌঁছোব তখন তোমার কি অনুভূতি হবে। ভাবতেই পারছি না। পিরামিড নিজ হাতে ছুঁয়ে দেখব। কত দিন ধরে ভেবেছি এই পিরামিড নিয়ে। বহু দিনের স্বপ্ন সার্থক হতে চলেছে।'

ওখান থেকে বেরিয়ে গেলাম কিছু কিনব বলে। বাইরে অনেক ছোটো বড়ো দোকান যেমন আমরা দীঘা পুরী বা অন্য জায়গায় দেখি, তেমনই। নানান পসরা সাজিয়ে। পিরামিড, স্ফিংস, তুতেনখামুনের প্রতিকৃতি এ সব স্যুভেনির। আমি একটা মিশরীয় গানের সিডি আর কয়েকটা পিরামিডের প্রতিকৃতি কিনে নিলাম। তিনটে করে এক এক সেট পিরামিডের। এরই ফাঁকে মেয়েরা কিছু প্রসাধনীও কিনে নিল। ওখানেও চুড়ি, কানের গলার গয়না এসব কিছুই আছে। কিনলও অনেকে।

গাইড তাড়া দিচ্ছে বাসে উঠতে, 'রেস্টুরেন্ট বন্ধ হয়ে যাবে চলুন সকলে। রাতে খাওয়া পাবেন না শেষে।'

সঙ্গে সঙ্গে দীপালী বলে ওঠে, 'দরকার নেই খাওয়ার। আজ যা দেখলাম খাওয়া না হলেও দুঃখ নেই।'

উঠে পড়লাম বাসে সকলে। আজ রাতে নিয়ে চলল এক ভারতীয় রেস্টুরেন্টে। এখানেও ভারতীয় রেস্টুরেন্ট আছে। বেশ কিছুটা দূরে বাস চালিয়ে তারপর গন্তব্য—তাজ ইন্ডিয়া হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট। মিশরীয় খাবার খেয়ে খেয়ে দেশীয় খাবারের প্রতি একটা টান অনুভব করছিলাম। ভালোও লাগল এদের মেনু আর রান্না। মাছ, ভাত, মুরগি, পায়েস আর গোলাপজামুন মিষ্টি।

এরপর হোটেলে ফেরা আর ঘুমের প্রস্তুতি। লাইট অফ করে শুয়েও পড়লাম দুজনে। ঘুম আসছে না। চোখের সামনে যেন এখনও ভাসছে পিরামিড আর স্ফিংস।

যেন কানে শুনতে পাচ্ছি সেই গমগম শব্দ - সেই ধারাভাষ্য - ওয়েলকাম লেডিজ এন্ড জেন্টলমেন। অনেকক্ষণ সময় কেটে গেছে ঘুম আসছে না। মনে হল দীপালীও ঘুমোয়নি।

ডাক দিলাম, 'দীপালী।'

'হুম' - সাড়া দিল ও।

'কি, ঘুমোও নি?'

'না গো ঘুম আসছে না। শুধু আজকের সন্ধ্যার শোয়ের কথা মনে পড়ছে, চোখে ভাসছে সব।'

বললাম, 'শুয়ে পড়। কাল সকালে উঠতে হবে।'

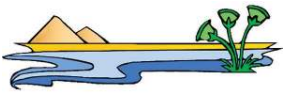

পিরামিড
Pyramid

আজকের দিনটি যদি সোনার কালি দিয়ে সোনার অক্ষরে কোথাও লিখে রাখতে পারতাম! সোনার তৈরি কোন কাগজ পেতাম লিখে রাখতাম আজকের তারিখটা!

কি যে এক আনন্দ আজ মনের মধ্যে ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না।

সকাল সকাল প্রস্তুতি সবার - পিরামিড দেখতে যাবে। আজ সাজো সাজো রব- সবার মন তোলপাড়। দীপালী আজ শাড়ি পরেছে। আকাশি রঙের একটা কাজ করা শাড়ি।

বললাম, 'খুব সুন্দর লাগছে তোমাকে।'

-'সত্যি? জানো, রাজেশ আসার আগে বলে দিয়েছিল-মা, তুমি পিরামিডের সামনে শাড়ি পরে ফটো তুলে আনবে। আমি আমার বন্ধুদের দেখাব। তাই এ শাড়িটা এনেছি আজ পরব বলে।'

-'বাহ। গুড আইডিয়া। একেবারে জাতীয় পোশাকে মিশরের প্রাচীন ইতিহাসের সামনে তোমাকে দাঁড় করিয়ে আমি ছবি তুলব। একটা স্পেশাল কিছু হবে। দেখে নিও আমাদের টিমের অন্য মহিলারা সবাই অন্য পোশাকেই আসবে হয়তো।'

তাইই হয়েছিল। হাঁটার সুবিধার জন্য সবাই চুড়িদার কুর্তি জিন্স প্যান্ট টপস ইত্যাদি পরেছে। শুধু সুচেতা বৌদিকে দেখেছিলাম শাড়ি পরতে।

সকলেই আজ অন্য মেজাজে। গাইড এসে গেছে। বলল, 'আপনারা সকলে রেডি? ব্রেকফাস্ট কমপ্লিট? বাইরে বাস দাঁড়িয়ে আছে। তাহলে আর দেরি নয়। উঠে পড়ুন।'

আমরা সকলেই হৈ হৈ করে বাসে উঠে পড়লাম দৌড়ে গিয়ে। যেন ছেলেমানুষি শুরু করেছি। ভাবটা এমন যেন বাসে আগে উঠলেই পিরামিডে সবার আগে পৌঁছে যাব। বিদেশ ভ্রমণে আসলে সকলের মধ্যে যেন একটা ছেলেমানুষি সরলতা এসে যায়। আমরা ছেলে মানুষ হয়ে যাই। বয়সটা কমিয়ে ফেলি এক ধাক্কায়। তাই হুটোপুটি করে বাসে উঠে আগে জায়গা নেওয়া। জানালার ধারে বসা। আবার এরাই বাড়ি ফিরে সব ব্যস্ত-সমস্ত গম্ভীর ডাক্তার। মেপে মেপে কথা বলা, মেপে হাসি, মেপে চলা।

সকালবেলা ছুটে চলেছে আমাদের বাস। গিজার পিরামিডের দিকে। ভোরের আলো উঠেছে একটু আগে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে যাব পিরামিডগুলো যেখানে দাঁড়িয়ে

পিরামিডের সামনে লেখক

পিরামিডের সামনে লেখক

আছে বছর বছর সেই মরুভূমির মাঝখানে। কিছুটা চলতেই বাসের জানালা দিয়ে চোখে পড়ল পিরামিড। সকলেই প্রায় সমঃস্বরে বলে উঠি চিৎকারে, 'ওই যে পিরামিড দেখা যায়।' যেন প্রতিযোগিতা–কে আগে দেখেছে পিরামিড। ডাঃ চন্দন ঘোষাল তো বলেই ফেলল চিৎকার করে, 'তপন, আমি সবার আগে পিরামিড দেখলাম রে। তোর ডায়েরিতে আমার নামটা লিখিস। আর যদি কোনদিন বই লিখিস তাহলেও যেন আমার নামটা এখানে থাকে যে, প্রথম পিরামিড আমিই দেখেছি।'

আরও কয়েকজন বলে উঠল, 'না না আমি দেখেছি আগে।'

বাস গিয়ে থামল গিজার সবচেয়ে বড় পিরামিডের পাশে। ওটাকে বলে রাজা খুফুর পিরামিড বা চিওপস-এর পিরামিড। বাস থেকে নামতেই দেখি ইতিমধ্যে বহু লোকের সমাগম। এই মরুভূমির মধ্যেই মিশর সরকার পর্যটকদের জন্য বিশেষ সুবিধা করে দিয়েছেন। সুন্দর ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন রাস্তা একেবারে পিরামিডের গা পর্যন্ত। প্রকৃতিও আজ সুপ্রসন্ন মনে হচ্ছে। গাইড বলেছিল খুব গরম পড়বে। কোথায় গরম? সকালের এই সোনা ঝরা রোদ যেন পিরামিডের গা ধুইয়ে দিচ্ছে। সকালের রোদ চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে বিশাল পিরামিডের শরীর বেয়ে। তাকিয়ে থাকলাম অনেকক্ষণ। ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলাম। পৃথিবীর বিস্ময় আগে নয়ন ভরে দেখি - যে পিরামিড দেখে কত কবি কত কবিতা লিখেছে, কত সিনেমা তৈরি হয়েছে এই পিরামিড সাক্ষী রেখে, কত পর্যটক বলেছে, আর ফিরে যাব না এ সৌন্দর্য ফেলে। নিজের চোখে দেখছি সেই পিরামিড–এ তো এক স্বপ্ন ছিল। অনেকের কাছেই স্বপ্ন। ক'দিন আগে কি ভেবেছি, স্বচক্ষে পিরামিড দেখার সৌভাগ্য হবে কোনোদিন এ জীবনে?

সারা পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু, সারা পৃথিবীর তাবৎ প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণা আজও শেষ হল না। রহস্য রহস্যই থেকে যাবে। আর আজ সকালে যেন আমিও ঢুকে পড়েছি সেই রহস্যের ঘুর্ণিতে।

বিশাল আকার বড়ো বড়ো তিনটি পিরামিড আর তার পাশেই আরও ছোটো তিনটি পিরামিড দাঁড়িয়ে। এক অসাধারণ কৌণিক অবস্থানে ওরা দাঁড়িয়ে–ওদের নির্মাণের সময় সূর্যের অবস্থান, নীলনদের সঙ্গে সম্পর্ক সবই বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। তিনটি পিরামিড এমন ভাবে তৈরি যেন কোনোটিই সূর্যের আলো আসার পথে কোন বাধা না হয়ে দাঁড়ায়। একসাথে প্রত্যেকটি পিরামিডের উপর সূর্যের আলো পড়বে। গিজায় পাশাপাশি দাঁড়ানো তিনটি পিরামিড হচ্ছে (Big three Pyramids in Giza):-

১) রাজা খুফু বা চিওপসের পিরামিড (Pyramid of Khufu or Pyramid of Cheops)

২) রাজা খাফরে বা চেফরেনের পিরামিড (Pyramid of Khafre or Pyramid of Chephren)

৩) রাজা মেনকাউরের পিরামিড (Pyramid Menkaure)

এর মধ্যে রাজা খুফু বা চিওপসের পিরামিড হচ্ছে পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের একটি।

এই পিরামিডগুলো মিশরের পশ্চিম মরুভূমিতে নীলনদ থেকে ৯ কিলোমিটার দূরত্বে গিজাতে নির্মিত হয়েছিল। সূর্য পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। মানুষের মৃত্যুকেও অস্তগামী পশ্চিম দিকের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন প্রাচীন মিশরের রাজারা। সেই ধারণা থেকেই তাদের সমাধি নীলনদের পশ্চিম তীরে নির্মাণ করেন। তাদের বিশ্বাস ছিল এই পৃথিবীতে মৃত্যুর পর আত্মার অন্য এক জগতে যাত্রা শুরু হবে ঈশ্বরের সাথে। তাদের ধারণা মৃত্যুর পর তারা মিশে যাবে দেবতা ওসিরিসের আত্মায়। আর সে মিলন হবে মৃত্যুর পর তাদের দেহ থেকেই। তাই দেহকে আগলে রাখতে হবে অতি যত্নে- রাখতে হবে সুরক্ষিত। সেই সঙ্গে দিতে হবে প্রতিদিনের ব্যবহার্য খাদ্য ফল মূল পোশাক পরিচ্ছদ। দেহ সুরক্ষিত থাকলে প্রতিদিন দেবতা ওসিরিসের আত্মার সঙ্গে বেঁচে থাকবেন তারা। সেই বিশ্বাস থেকেই পিরামিডে নিজেদের দেহকে মমি বানিয়ে নিরাপদে নিরিবিলিতে হাজার হাজার বছর অক্ষত রাখার পরিকল্পনা।

পিরামিড গড়ার চিন্তা প্রাচীন রাজবংশের সময়েই (খ্রিস্টপূর্ব ৩১৫০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ২৬১৩)- তখন স্থাপত্যবিদ ইমহোটেপ তার রাজা জোসারের একটি সমাধি তৈরির নকশা প্রস্তুত করেন ও কাজে হাত দেন। এই ইমহোটেপ ছিলেন একাধারে পুরোহিত ও চিকিৎসক। পুরোহিতরাই তখন মানুষের চিকিৎসা করতেন। গ্রীসে তিনি এসকুলোপিয়াস নামে খ্যাত।

তার আগে মাটি ও কাদা দিয়ে সমাধি তৈরি করা হত যাকে বলা হত মাসটাবাস। ইমহোটেপ দেখলেন মাসটাবাসের চেয়েও শক্ত, স্থায়ী ও বিশালাকৃতির সমাধি করা যেতে পারে যদি একটি পাথর খন্ডের উপর একটি পাথর খন্ড কৌণিক অবস্থানে বিশেষভাবে বসিয়ে ধাপে ধাপে উপরে তোলা যায়। এই জ্যামিতিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তা থেকেই ইমহোটেপ প্রথম সাক্কারাতে ধাপযুক্ত বিশাল সমাধি গড়ে তোলেন রাজা জোসারের জন্য। সেই সমাধি পিরামিডের রূপ নেয়। আজও পৃথিবীর সবচেয়ে পুরোনো পিরামিড সাক্কারাতে দাঁড়িয়ে আছে।

এরপর রাজা স্নেফেরু (খ্রিস্টপূর্ব ২৬১৩ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ২৫৮৯) ইমহোটেপের পরিকল্পিত পিরামিডের চেয়ে আরও শক্ত পোক্ত সুন্দর পিরামিড তৈরিতে মনোনিবেশ করলেন। তার প্রথম প্রচেষ্টায় তৈরি পিরামিড ধসে পড়ে কারণ তিনি ইমহোটেপের পরিকল্পিত পিরামিডের ভিতের চেয়ে অনেক বেশি চওড়া ভিত বানাতে গিয়েছিলেন। রাজা স্নেফেরু নিজের ভুলের থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন লাল পিরামিড তৈরি করেন। সাক্কারাতে রাজা জোসারের পিরামিডই মিশরের প্রথম পিরামিড। প্রাচীন রাজবংশের রাজারা মেমফিস থেকে শাসন করতেন। সাক্কারাতে প্রাচীন রাজবংশের রাজাদের সমাধি ও কিছু পিরামিড আছে। রাজা স্নেফেরুর পিরামিড আছে দাসুরে। মিশরের বিভিন্ন স্থানে এরকম আশিটি পিরামিডের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গেছে। সুদানেও ছড়িয়ে ছিটিয়ে শতাধিক ছোট ছোট পিরামিড পাওয়া যায়। তবে সেগুলি সৌন্দর্য বা স্থাপত্যের দিক দিয়ে ততটা নজরকাড়া নয় বলেই সেগুলো অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে অযত্নে।

During the third and fourth Dynasties of the Old Kingdom, Kings held a unique position in Egyptian society. Somewhere in between human and divine, they were believed to have been chosen by the Gods to serve as mediators between them and the people on Earth. Because of this, it was in everyone's interest to keep the King's majesty intact even after his death, when he was believed to become Osiris, God of the dead. The new Pharoah, in turn, became Horus the falcon-God who served as protector of the Sun-God Ra. The Pyramid's smooth, angled sides symbolised the rays of the Sun and were designed to help the king soul ascend to heaven and join the Gods, particularly the Sun God Ra.

Ancient Egyptians believed that when the king died, part of his spirit known as 'ka' remained with his body. To properly care for his spirit, the corpse wase mummified and everything the king would need in the afterlife was buried with him, including gold vessels, food, furniture and other offerings. The Pyramids became the focus of a cult of the dead king that was supposed to continue well after his death.

From the beginning of the Dynastic Era - 2950 B. C. Royal tombs were carved into rock and covered with flat-roofed rectangular structures known as 'mastabas', which was built around 2630 B.C. at Saqqara, for the third Dynasty's King Djoser known as the Step Pyramid. It began as a traditional mastabas but grew into something much more ambitious. As the story goes, the Pyramid's architect was Imhotep, a priest and healer who some 1,400 years later would be deified as the patron saint of scribes and physicians. Over the course of Djoser's nearly 2--year reign, Pyramid builders assembled six stepped layers of stone (as opposed to mud-brick, like most earlier tomb) that eventually reached a height of 204 feet (62 meters); it was the tallest building of its time. The Step Pyramid was surrounded by a complex of courtyards, temples and shrines, where Djoser would enjoy after afterlife.

After Djoser, the stepped pyramid became the norm for royal burials, although none of those planned by his Dynastic successors were completed probably due to their relatively short reigns. The earliest tomb constructed as a 'true' smooth-sided, not stepped Pyramid was the Red Pyramid at Dahshur, one of three burial structures built for the first King of the fourth Dynasty, Sneferu–2613-2589 B.C.

গ্রেট পিরামিড অফ গিজার সামনে ডাঃ দীপালী বিশ্বাস

গ্রেট পিরামিড অফ গিজার সামনে লেখক

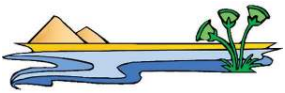

গ্রেট পিরামিড অফ গিজা
The Great Pyramid of Giza

ফারাও খুফুর পিরামিড - গ্রীক নাম চিওপস (Pyramid of Khufu. Cheops-in Greek) ফারাও খুফুর মা হেটেফেরিসএর সমাধি গিজাতেই আছে সেজন্যই রাজা খুফু গিজায় মায়ের সমাধির পাশেই তার পিরামিডের জন্য স্থান নির্বাচন করেন। আর এখানেই নির্মিত হল বিশ্বের প্রাচীন সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম এই পিরামিড যাকে বলা হয় গ্রেট পিরামিড অফ গিজা।

ফারাও খুফুর পিরামিডের কাজের পরিকল্পনাকারি ছিলেন তখনকার সময়ে মিশরের দ্বিতীয় শক্তিশালী মানুষ রাজা খুফুর মূল পরামর্শদাতা হেমিউনু। হেমিউনু ছিলেন রাজা খুফুর ভ্রাতুস্পুত্র। তিনি পিরামিডের নকশা তৈরি করা থেকে শুরু করে সমগ্র নির্মাণ কাজ নিজেই পরিচালনা করেন। তাকে অবশ্য সাহায্য করেন তার বাবা নেফারমাট অর্থাৎ খুফুর ভাই যিনি পূর্বে সম্রাট স্নেফেরুর পিরামিড তৈরির মূল পরিকল্পনাকারি ছিলেন। এই বিশাল বিপুল পিরামিড নির্মাণে তার অতীত অভিজ্ঞতা এখানে কাজে লাগান।

চতুর্থ রাজবংশের ফারাও খুফুর সময়ে খ্রিস্টপূর্ব ২৫৮০তে নির্মাণকাজ শুরু হয়ে খ্রিস্টপূর্ব ২৫৬০এ শেষ হয় (মতান্তরে খ্রিস্টপূর্ব ২৫৬০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ২৫৪০)। হেরোডোটাসের ভাষ্য অনুযায়ী প্রাথমিক প্রস্তুতিতে দশ বছর লাগে–পাথর কাটা, বহন করা, জড় করা, শ্রমিকদের বাসস্থান, ভিত্তি ইত্যাদি। তারপর পিরামিড তৈরিতে আরও কুড়ি বছর লেগে যায়।

প্রথমে পিরামিডের উচ্চতা ছিল ১৪৮.৫ মিটার (৪৮১ ফুট)। প্রকৃতির দুর্যোগ ও ক্ষয়ের কারণে উচ্চতা কমে বর্তমানে হয়েছে ১৩৮.৮ মিটার (৪৫৫ ফুট)। প্রায় তিন হাজার বছর ধরে এটি মানুষের নির্মিত পৃথিবীর সর্বোচ্চ কীর্তি হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল যতক্ষণ না ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে আইফেল টাওয়ার নির্মিত হয়। অবশ্য অনেকে মনে করেন ইংল্যান্ডের লিংকন ক্যাথেড্রাল ১৩০০ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয় যা গিজার পিরামিডকে উচ্চতায় ছাড়িয়ে যায়। এই পিরামিডের ভিত ২৩০.৩৪ মিটার (৭৫৬ ফুট) চওড়া। পিরামিডটির ওজন ৫৯,০০,০০০ টন এবং আয়তন ২৫,৮৩,২৮৩ কিউবিক মিটার। দেয়াল এবং ভূমির কোন ৫১.৫২ ডিগ্রী।

গড়ে এক এক একটি পাথরের ব্লকের ওজন ছিল আড়াই টন (২৫০০ কেজি)। বড় পাথরের ব্লক দশ টন পর্যন্ত আর ছোট ব্লকগুলি দেড় টন পর্যন্ত ওজনের।

এই পিরামিডে মোট ২৩ লক্ষ পাথরের ব্লক লেগেছে। পুরোটা গ্রানাইট পাথরে তৈরি। লাইমস্টোনের ব্যবহার আছে পিরামিডের গায়ে ও ভিতরের ঘরের দেয়াল সৌন্দর্যায়নের জন্য। ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে প্রচন্ড ভূমিকম্প হয় গিজা এলাকায়। সেই ভূমিকম্পে পিরামিডের অনেক ক্ষতি হয়। পিরামিডের গায়ে লাগানো পালিশ করা মশৃণ লাইমস্টোন পাথর খসে খসে পড়ে। বাহরি সুলতান আন-নাসির-আদ-দীন আল-হাসান ১৩৫৬ খ্রিস্টাব্দে সেই সব পাথর নিয়ে গিয়ে কায়রোর পাশে মসজিদ ও দূর্গের দেয়ালের গায়ে লাগান। উনিশ শতকে মুহাম্মদ আলি পাশা পিরামিডের দেওয়াল থেকে লাইমস্টোনের পালিশ করা বাকি সব পাথর খুলে নিয়ে কায়রোর আলবাস্টার মসজিদের উপরিভাগ নির্মাণ করেন। এখনও আলবাস্টার মসজিদে গেলে পিরামিডের সেই মূল্যবান পাথর দেখা যায়।

পিরামিড তৈরির পাথর কোথা থেকে কি ভাবে আনা হল, কি ভাবে এত উঁচুতে তোলা হল, সঠিক মাপে বসানো হল এসব নিয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে। বিস্তর মত পার্থক্য আছে। কুড়ি বছর ধরে এই পিরামিড তৈরি হয়। প্রতিদিন কমপক্ষে ৮০০ টন পাথর উপরে তুলতে হত। প্রতি ঘন্টায় ১২টি ব্লক স্থাপনে করতে হত। ধারণা করা হয়,নীলনদের অপর দিকে দূর থেকে পাহাড় কেটে নীলনদ বেয়ে নৌকায় করে পাথর আনা হয়। পরে সেগুলি আবার টেনে টেনে গিজায় আনা হয়। প্রথমে পাথর ফেলে ভূমির সমতল করে শক্ত ভিত প্রস্তুত করা হয়। সেই শক্ত ভিতের উচ্চতা ১০ মিটার বা ৩৩ ফুট। ভিতের চার পাশে মাটি ও বালি ফেলে উঁচু করা হয় তার উপর দিয়ে একে একে পাথরের ব্লকগুলো তোলা হয়। একটির উপর একটি ধাপে ধাপে বসানো হয়। এক এক বারে এক লক্ষ (মতান্তরে কুড়ি হাজার) শ্রমিক কাজ করত। এ রকম দুই লক্ষ শ্রমিক পর্যায়ক্রমে কাজ করত। এর মধ্যে ছিল দক্ষ, অদক্ষ, কারিগর, প্রকৌশলি ও পাচক - সব রকমের। তিন মাস পরপর এদের বদলি করে অন্যদের নিয়োগ করা হত।

খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে সাতাশ রাজবংশের সময়ে প্রখ্যাত গ্রীক পর্যটক হেরোডোটাস মিশর আসেন। তার দেওয়া তথ্য অনুযায়ি অনেক ঘটনা জানা যায়। রাজা চিওপস তার সময়ে মিশরের প্রজাদের দিয়ে পিরামিড তৈরির কাজ করাতেন। কারও কারও মতে পাথরের ব্লক উপরে তুলতে কাঠের তৈরি ক্রেন ব্যবহার করা হত। কেউ কেউ বলেন কাঠের গোলাকার গুড়ি ব্যবহার করে গড়িয়ে গড়িয়ে পাথরের ব্লক উপরে তোলা হত। এত প্রকান্ড ও ভারি পাথরের চাঁই উপরে তোলা এখনও সকলের কাছে বিস্ময়। বিশেষজ্ঞরা এখনও ভেবে উঠতে পারছেন না। শুধুমাত্র ধারণার উপর নির্ভর করে বলে চলেছেন সকলে। আর পিরামিডের গায়ে লেখা হাইরোগ্লাইফিক পড়েও কিছু কিছু জানা যায়। জানা গেছে সকল প্রজাদের চিওপস ক্রীতদাসের মতো খাটাতেন। লক্ষ লক্ষ মানুষকে এ ভাবে পিরামিড তৈরিতে খাটিয়েছেন।

প্রায় কুড়ি বছর ধরে কাজ করে খুফুর পিরামিড শেষ হয়। শেষের দিকে বাইরের কাজে হাত দেওয়া হয়। পালিশ করা নিখুঁত মাপের লাইমস্টোন বাসানো হয় পিরামিডের দেয়ালে। লাইমস্টোন বসানোর কাজটিও ছিল অদ্ভুত পদ্ধতিতে। সাধারণত পাথর বসানো হয় নিচ থেকে উপরের দিকে। কিন্তু জানা যায় পিরামিডের সৌন্দর্য ও মাপ ঠিক রাখার জন্য পিরামিডের উপর থেকে পাথর বসাতে বসাতে নিচে নামে।

রাজা খুফুর গ্রেট পিরামিডের অভ্যন্তরে চারটি প্রকোষ্ঠ আছে ঃ-

Chambers inside the Pyramid :-

❑ কুইনস চেম্বার (Queen's Chamber)

❑ গ্রান্ড গ্যালারি (Grand Gallery)

❑ বিগ ভয়েড (Big Void)

❑ কিংস চেম্বার (King's Chamber)

পিরামিডের মূল প্রবেশ দ্বারটি উত্তর দেয়ালে ভূমি থেকে ১৭ মিটার (৫৬ ফুট) উপরে এবং পিরামিডের কেন্দ্র লাইন থেকে ৭.২৯ মিটার বা ২৩.৯ ফুট পূর্বে। এই প্রবেশ দ্বার থেকে কোন পথই সোজা কোথাও যায়নি। আঁকা বাঁকা পথ বানিয়ে তারপর সে পথ পৌছোয় কুইনস চেম্বার, গ্রান্ড গ্যালারি, বিগ ভয়েড ও কিংস চেম্বারে। প্রধান প্রবেশদ্বার থেকে প্রথমে নিচের দিকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে পথ - তিন ফুট উঁচু আর সাড়ে তিন ফুট চওড়া পথ চলে গেছে ১০৫ মিটার বা ৩৪৫ ফুট। তার পর ২৯ ফুট যায় নিচের চেম্বারে। এরপর আবার উপরের দিকে ঢালু পথ ১২৯ ফুট উঠে গেছে সোজা গ্রান্ড গ্যালারিতে। এখান থেকে সোজা পথ গেছে কুইনস চেম্বারে।

কুইনস চেম্বার উত্তর ও দক্ষিণ দেওয়ালের ঠিক মাঝখানে ১৮.৯ ফুট দৈর্ঘ্য ও ১৭.২ ফুট চওড়া ঘর যার ছাদটি কৌনিক আকৃতির।

কিংস চেম্বারটি ৩৪.৪ ফুট লম্বা ও ১৭.১৭ ফুট চওড়া। এটি কুইনস চেম্বার থেকে বড়। কিংস চেম্বারের ছাদ নয়টি পাথরের স্লাব দিয়ে তৈরি। এগুলির মোট ওজন চারশো টন। এগুলি দিয়ে মোট পাঁচটি কুঠুরি গড়া হয়েছে। প্রথম চারটি কুঠুরির ছাদ সমতল কিন্তু একেবারে উপরেরটির ছাদ কৌনিক।

এই কুঠুরিগুলোর পরে নাম দেওয়া হয়েছে ঃ

Five Chambers in the King's Chamber:-

❑ ডেভিডসনস চেম্বার (Davidson's Chamber)

❑ ওয়েলিংটনস চেম্বার (Wellington's Chamber)

❑ নেলনসন চেম্বার (Nelson's Chamber)

❑ লেডি আরবুথনটস চেম্বার (Lady Arbuthnot's Chamber)

❑ ক্যাম্পবেলস চেম্বার (Campbell's Chamber)

ধারণা করা হয় যে এই পাঁচটি কুঠুরি নির্মাণ করা হয়েছিল যেন পিরামিডের উপরের পাথরের বিশাল ওজনে মূল কিংস চেম্বারের কোন ক্ষতি না হয় সে জন্য। এই আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা এই যুগের আধুনিক প্রকৌশলিদেরও মাথা ঘুরিয়ে দেয়। ভিতরের দেয়াল গ্রানাইট পাথরের। শিলালিপি খচিত দেয়ালে রয়েছে খোদাই করা নানা রকম চিত্র, হাইরোগ্লাইফিকে লেখা আছে রাজার বিবরণ।

পর্যটকদের জন্য ৮২০ খ্রিস্টাব্দে খলিফা আল-মামুন একটি আলাদা প্রবেশদ্বার তৈরি করেন। প্রায় ২৭ মিটার (৮৯ফুট) টানেল বা সুড়ঙ্গ কেটে বের করেন। তারপর সুড়ঙ্গটি মূল উর্দ্ধমুখি পথটির সঙ্গে যুক্ত করা হয়। এই সুড়ঙ্গটির নাম রবারস টানেল।

এই পিরামিডের চারপাশে আছে ছোটো ছোটো পিরামিড। মোট চারটি ছোটো পিরামিড তৈরি হয়। এগুলোকে বলা হয় কুইনস পিরামিড, তার তিনটি এখনও আছে কিন্তু চতুর্থটি বিলীন হয়ে গেছে। এই চতুর্থ ছোটো পিরামিড রানি হেটোফেরাস-১ এর সমাধি। রানি হেটেফেরাস-১ ছিলেন রাজা খুফুর মা, অন্যদিকে রাজা স্নেফেরুর বোন ও স্ত্রী। পিরামিডের পাশে ছিল ভ্যালি অফ টেম্পল এবং এই ভ্যালি অফ টেম্পলের সঙ্গে সংযোগকারি বাঁধ। পরে নাজলাত এল-সাম্মান গ্রাম তৈরির সময় এই ভ্যালি অফ টেম্পল ও সংযোগকারি বাঁধটি গ্রামের নিচে চলে যায়। পিরামিডের পূর্ব দিকে ছিল পিরামিড টেম্পল বা মন্দির। প্রায় ৫২ মিটার দৈর্ঘে ও ৪০ মিটার প্রস্থে। এটি পুরোপুরি হারিয়ে গেছে কালের গর্ভে।

No Pyramids are more celebrated than the Great Pyramid of Giza, located on a plateau on the West bank of the Nile River, on the outskirts of modern-day Cairo. The oldest and largest of the three Pyramids at Giza, known as the Great Pyramid, is the only surviving structure out of the famed seven wonders of the ancient world. It was built for Khufu (Cheops, in Greek), Sneferu's successor and the second of the eight kings of the fourth Dynasty. Though Khufu reigned for 23 years (2589-2566 B. C.) relatively little is known of his reign beyond the grandeur of his Pyramid. The sides of the Pyramid's base average 756 feet (230.34 meters), and its original height was 481 feet (148.5 meters), making it the largest Pyramid in the world. After erosion height became 455ft (138.8 meters). Weight of the Pyramid 59,00,000 ton and volume is 25,83,283 cubic meter. Angle between wall an base 51.52 degree.

Three small Pyramids built for Khufu's queens are lined up next to the Great Pyramid, and a tomb was found nearby containing the empty sarcophagus of his mother, Queen Hetepheres. Like other Pyramids,

Khufu's is surrounded by rows of mastabas, where relatives or officials of the king were buried to accompany and support him in the afterlife.

Approximately 2.3 million blocks of stone (averaging about 2.5 tons each) had to be cut,transported and assembled to build Khurfu's Great Pyramid. The ancient Greek historian Herodotus worte that it took 20 years to build and required the labour of 100,000 (20,000 on different opinion) men, but later archeological evidence suggest that the Pyramids were build by slaves or foreigners forced into labour. Skeletons excavate from the area show that the workers were probable native Egyptian agricultural labourers who worked on the Pyramids during the time of year when the Nile River flooded much of the land nearby.

মধ্য রাজবংশের সময় পর্যন্ত গিজার পিরামিড ও তার আশেপাশে সংস্কার ও গঠন চলতে থাকে যত্ন সহকারে। কিন্তু নতুন রাজবংশের সূচনা পর্ব থেকেই এই গ্রেট পিরামিডে লুঠপাঠ চলে যথেচ্ছ। নতুন রাজবংশ একটি মরুভূমির উপত্যকায় ভ্যালি অফ দি কিংস তৈরি শুরু করেছেন এবং সেটির শ্রীবৃদ্ধিতেই নজর বেশি ছিল। গ্রীক পর্যটক হেরোডোটাসের দেওয়া তথ্য অনুযায়ি ভ্যালি অফ দি কিংস তৈরিতে এই গ্রেট পিরামিডের অনেক সামগ্রী চুরি করে সেখানে লাগানো হয়।

আমরা এই গ্রেট পিরামিড অফ গিজা অর্থাৎ বিশ্বের সবচেয়ে বড় পিরামিড এর সামনে অনেক ছবি তুললাম। ভিডিও ক্যামেরায় সকলের ছবি তুলছি এমন সময় গাইড এসে বলল, 'আমরা পরের পিরামিড-খাফরের পিরামিড দেখতে যাব, বাসে উঠুন সবাই।'

মন চাইছে না যেতে অগত্যা বাসে উঠতে হল অনিচ্ছা সত্বেও। বাস নিয়ে চলল পাশেরটিতে। যখন সকলে বাসে উঠে বসেছি– বাসের জানালা দিয়ে সবাই শেষবারের মত আর একবার দেখে নিচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় পিরামিড। আর কোন দিন তো আসা হবে না। সকলেই যেন শেষ বিদায় নিচ্ছে খুফুর পিরামিড থেকে। বাসের মোড় ঘুরল। গতি পেল।

ফারাও খাফরের পিরামিডের সামনে লেখক

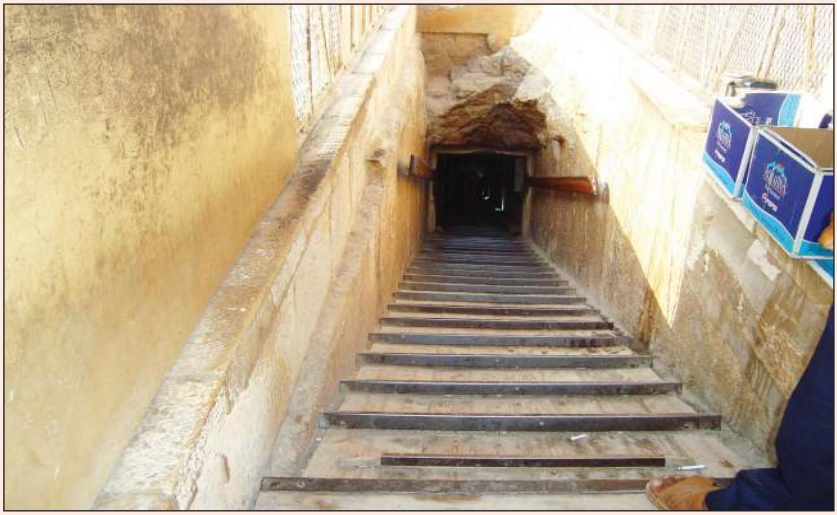

পিরামিডের ভিতরে ঢোকার সুড়ঙ্গ

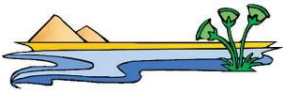

ফারাও খাফরের পিরামিড
The Pyramid of Khafre or the Pyramid of Chephren

খুফুর মৃত্যুর পর তার বড় ছেলে খাফরে মিশরের পরবর্তি ফারাও হন। এই খাফরেই দ্বিতীয় পিরামিডটি তৈরি করেন।

বাস একেবারে পাশে এসে থামল ফারাও খুফুর ছেলে ফারাও খাফরের (চেফরেনের) পিরামিডের গা ঘেঁসে। এখানেও প্রচুর মানুষ। ফারাও চেফরেন বা খাফরে ২৫৫৮ খ্রিস্টপূর্ব ২৫৩২ খ্রিস্টপূর্ব পর্যন্ত রাজত্ব করেন। বিশ্বের দ্বিতীয় সর্ব্বোচ্চ ও দ্বিতীয় বৃহৎ এই খাফরের পিরামিডটি দেখতে আরও সুন্দর। মাথায় মুকুট পরে আছে যেন। আগের পিরামিডের চেয়ে আরও খাড়া। গ্রেট পিরামিডের দেয়াল থেকে সব লাইমস্টোন যেমন পড়ে গেছে না হয় খুলে নেওয়া হয়েছে, এটিরও প্রায় সেই অবস্থা। কিন্তু একেবারে চুড়ায় বেশ খানিকটা রয়ে গেছে। দেখে যেন মনে হচ্ছে পিরামিডটি সাদা একটা মুকুট পরে আছে।

চতুর্থ রাজবংশের সময় ২৫৭০ খ্রিস্টপূর্বে নির্মাণকাজ শুরু হয়। পিরামিডটির ভিত ২১৫.৫ মিটার বা ৭০৬ ফুট। যখন নির্মিত হয় তখন পিরামিডটির উচ্চতা ছিল ১৪৩.৫ মিটার (৪৭.১ ফুট)। ভূমিকম্প ও ক্ষয়ের কারণে বর্তমানে এর উচ্চতা কমে হয়েছে ১৩৬.৪ মিটার বা ৪৪৮ ফুট। এর আয়তন ২,২১১,০৯৬ কিউবিক মিটার (৭৮,০৮৪,১১৮ কিউবিক ফুট)।

লাইমস্টোনে তৈরি প্রতিটি পাথরের ব্লক দুই টনের উপর। এই পিরামিডের দেয়ালের ও ভূমির সাথে কোণ ৫৩.১৩ ডিগ্রি- এই কারণেই এই পিরামিড খুফুর পিরামিডের চেয়েও খাড়া (খুফুর পিরামিডের দেয়াল এবং ভূমির কোণ ৫১.৫২ ডিগ্রী)। অষ্টাদশ রাজবংশের সময় ফারাও রামেসেস-২ এর নির্দেশে হেলিওপোলিসে টেম্পল নির্মাণে প্রচুর পাথর এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে ২রা মার্চ জিওভান্নি বেলজোনি এই পিরামিডের উত্তর দিকের মূল প্রবেশদ্বার ও সমাধিগৃহ পর্যন্ত খনন ও তল্লাশি করেন। তিনি আশা করেছিলেন সমাধিগৃহে একটি সম্পুর্ণ সমাধি দেখতে পাবেন। কিন্তু তিনি সেই সমাধিগৃহে প্রবেশ করে পুরোপুরি হতাশ হন। দেখেন একটি খালি পাথরের বাক্স ও পাথরের একটি ভাঙা ঢাকনা মেঝেতে

পড়ে আছে। সব চুরি হয়ে গেছে ততদিনে। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে জন পিয়ারিং খাফরের সমাধি কিছুটা খনন করেন। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে অগাষ্টে ম্যারিয়েট খনন ও অনুসন্ধান শুরু করে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে শেষ করেন। তিনি অবশ্য খাফরের ভ্যালি টেম্পলে পাথরের মুর্তি উদ্ধার করেন।

এই পিরামিডের ভিত ও নিচের দিকে পিঙ্ক গ্রানাইট পাথর বসানো আছে। বাকি সবটাই লাইমস্টোনের।

এই পিরামিডে আমরা প্রবেশ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। টিকিট কেটে ঢুকতে হয়। পঞ্চাশ ইজিপশিয়ান পাউন্ড এক একজনের টিকিটের দাম। আমি, দীপালী আর ভারতী ঢুকেছিলাম। ওখানে যারা দায়িত্বে আছেন তারা বললেন, যাদের শ্বাসের সমস্যা অথবা জয়েন্টে ব্যথার সমস্যা আছে তারা পিরামিডের ভিতরে ঢুকবেন না। অনেকেই সাহস করেননি। আমাদের কথা হল, মিশর এসেছি আর পিরামিডের ভিতর ঢুকব না তাই হয় নাকি। অনেকে আমাদের নিষেধ করেছিল, শুনিনি ওদের কোনও নিষেধ। যত কষ্ট হয় হোক ভিতরে যাবই। গেলামও আমরা।

এর প্রবেশপথ দুটি। একটি দর্শনার্থীদের জন্য খোলা। এই প্রবেশ পথটিও সোজা সমাধি গৃহে প্রবেশ করেনি। প্রথমে নিচের দিকে ঢালু হয়ে খানিকটা নেমে গিয়ে তারপর আবার কিছুটা সমান্তরাল হয়ে গিয়েছে। শেষে আবার উপরের দিকে ঢালু হয়ে উঠে গিয়ে সমাধিগৃহে প্রবেশ করেছে।

এর পাশেই আর একটি প্রকোষ্ঠ আছে যেটির নিচের প্রবেশপথের সাথে যোগাযোগ। এটি হয়ত তৈরি করেছিল জিনিসপত্র রাখার জন্য। সমাধিগৃহটি চারকোণা ১৪.১৫ মিটার দৈর্ঘ্যে ও ৫ মিটার প্রস্থে। একটি বড়ো গ্রানাইট পাথরে খাফরের চিত্র খোদাই করা ও সেটি মেঝেতে আংশিক ঢুকিয়ে দেওয়া যেন কোনকিছু চুরি না হয়।

আমাদের ওই অদ্ভুত প্রবেশপথ দিয়ে ঢুকতে বেশ কষ্ট হয়েছিল। সোজা দাড়িয়ে হাঁটা যাবে না। কুঁজো হয়ে সামনে ঝুঁকে তবে হাঁটতে হবে সামনের দিকে। কিছুক্ষণ হাঁটার পর ব্যথায় টনটন করছিল হাঁটু আর কোমর। কোনোভাবেই সোজা হয়ে দাঁড়ানো যাবে না। বেশ কষ্ট হচ্ছিল। চারিদিক প্রায় বদ্ধ, এক পর্যায়ে মনে হচ্ছিল আর হল না বুঝি। ফিরে যাওয়ারও আর উপায় নেই। শরীরটাকে টেনে টেনে নিয়ে এগিয়ে চলেছি সামনের দিকে। যত কষ্ট হোক পিরামিডের ভিতর ঢুকব এই মনের জোর আমাদের পৌঁছে দিয়েছিল অবশেষে।

ভিতরে আমরা ঢুকে দেখলাম সমাধি গৃহে আলো জ্বালিয়ে রাখা আছে। একটা পাথরের বড়ো বাক্স আর তার ভাঙা ঢাকনি পড়ে আছে। সমাধিগৃহের ভিতরে ঢুকে সব কষ্ট নিমেষে দূর হয়ে গেল আনন্দের আতিশয্যে। দীপালী আমার হাত চেপে ধরল উত্তেজনায়। দেখলাম উত্তেজনায় আর আনন্দে সে কাঁপছে।

বড় কিছু জয় করলে আর কোন কষ্ট থাকে না। বিরাট কিছু যেন জয় করলাম। যেমন মানুষ এভারেষ্ট জয় করে আনন্দ পায়, কষ্ট করে তেমন আমরাও ওই রকম জয়ের আনন্দ পেলাম- বা তার চেয়েও অনেক অনেক বেশি কিছু।

সময় পার হয়ে যায়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু অনুভব করছি—এ আমি কোথায়! যে ঘরে ফারাওয়ের মমি ছিল সেখানে পৌঁছে গেছি আমি সশরীরে। পৃথিবীর কতজন মানুষের সৌভাগ্য হয় এমন জায়গায় পৌঁছোনোর! গুটি কয়েক মানুষের মধ্যে আমি একজন সৌভাগ্যবান! হাত দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখলাম মমি রাখার পাথরের বাক্সটি। দেওয়ালে যে চিত্র আঁকা আছে তার উপরে হাত রাখলাম। দেয়ালে কান পাতলাম হাজার বছরের আগের কারও কোন কথা শোনা যায় কিনা। আঙুল দিয়ে স্পর্শ করলাম মমি রাখার বাক্সটা। মনে হল ফারাওদের সাথে কিছুক্ষণ অবস্থান করে গেলাম।

ভারতী বলল, 'দাদা, চলুন সময় শেষ হয়ে আসছে। সবাই বিরক্ত হবে আমাদের জন্য।'

ভারতীকে বললাম, 'বল তো যেতে মন চায়? তবু যেতে হবে। যেতেই যখন হবে, চল তবে।'

ফেরার পালা। সেই দুর্গম পথ বেয়ে বেয়ে আবার ফেরা। সেই একই কষ্ট। একই রকম শারীরিক যন্ত্রণা। এ যন্ত্রণায় যেন কষ্ট ছিল না। পিরামিডের ভিতরের সমাধি গৃহ দেখে ফিরছি—এ আনন্দে সব শারীরিক কষ্ট দূর হয়ে গেল। বাইরে বেরিয়ে হয়তো দেখব সবাই আমাদের জন্য অধীর আগ্রহে উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করছে।

বাইরে অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ডাঃ অমিতাভ ভট্টাচার্য আর ভিতরে আমাদের সাথে ওর স্ত্রী ভারতী। দুশ্চিন্তা হবে না! ওই তো বাইরের আলো দেখা যাচ্ছে। পৌঁছে গেছি মূল প্রবেশদ্বারের কাছে। আর একটু, শরীরটাকে মনের জোরে টেনে টেনে নিয়ে পৌঁছোলাম প্রবেশদ্বারের কাছে। বেরোলে দেখি গাইড সহ সকলেই দুশ্চিন্তায়।

ওরা যেন আমাদের সম্বর্ধনা দিচ্ছে এমন ওদের চোখের ভাষা। ওরা আমাদের প্রচুর সাবাস দিল আমাকে, দীপালীকে আর ভারতীকে। আবার এও অনেকে বলল, 'না গিয়ে ভাল করেছি—বাবা।'

ওদের চোখে আমরা তিনজন ততক্ষণে হিরো। মিশর এসে পুরো দলের মধ্যে আমরা তিনজন যেন পিরামিড জয় করে মিশর অভিযান শেষ করেছি।

ভারতী বলল, 'দাদা, পিরামিডের ভিতরে প্রবেশের কৃতিত্বে ডায়েরিতে শুধু আপনার নাম লিখবেন না। আজকের এই ঐতিহাসিক ঘটনায় আমার আর দীপালীর নামও যেন থাকে আপনার ডায়েরিতে।'

ভারতীকে আশ্বস্ত করে বললাম, 'শুধু ডায়েরিতে নয় ভারতী, যদি আমি কোনোদিন মিশর ভ্রমণ কাহিনি নিয়ে লিখি তবে সেখানে তোমাদের এই দুঃসাহসিক অভিযানের কথা লিখবই।'

সুনীলদা বললেন, 'তপন, তোমরা তিনজন আমাদের সম্মান রেখেছ। এখানে অনেকেই হয়তো আসবে বেড়াতে কিন্তু পিরামিডের ভিতরে ঢোকার এই দুঃসাহসিক কাজটি তোমরাই করে দেখালে।' সবাই একটা হাততালিও দিলেন একসাথে।

গাইড বলল, 'বাইরের শ্বাস নিন কিছুক্ষণ দেখবেন সব কষ্ট চলে গিয়েছে।'

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'ভালো আছি, চিন্তা করো না।'

The Pyramid of Khafre or of Chephren is the second-talest and second largest of the Ancient Egyptian Pyramids of Giza and the tomb of the Fourth-Dynasty Pharaoh Khafre (Chefren), who ruled from 2558 BC to 2532 BC.

The Pyramid initially when it was built had its height. 143.5m m (471 ft) but due to natural erosion base length has reduced to 215.5 m (706ft) and rises up to a height of 136.4 metres (448ft). The Pyramid is made of limestone blocks weighing more that 2 tons each. The slope of the Pyramid rises at a 53'13^0 angle, steeper than its neighbor, the Pyramid of Khufu, which makes it appear to be taller.

The Pyramid was likely opened and robbed during the First Intermediate Period. During the Eighteenth Dynasty, the overseer of temple construction took casing stone from it to build a temple in Heliopolis on Ramesses II.

It was first expolred in modern times by Giovanni Belzoni on March 2,1818, when the original entrance was found on the north side of the Pyramid and the burial chamber was visited. Belzoni had hopes of finding and intact burial. However, the chamber was empty except for an open sarcophagus and its broken lid on the floor.

The first complete exploration was conducted by John Perring in 1837. In 1853 Auguste Mariette partially excavated Khafre's valley temple, and in 1858, while completing its clearance, he managed to discover a diorite statue.

Passageways and chambers inside the Pyramid of Khafre :

Two entrances lead to the burial chamber, one that opens 11.54 m (38ft) up the face of the Pyramid and one that opens at the base of the Pyramdis. These passagewas do not align with the centerline of the Pyramid, but are offset to the east by 12 m (39ft). The lower descending passageway is carved completely out of the bedrock, descending, running horizontal, then ascending to join the horizontal passage leading to the burial chamber.

One theory as to why there are two entrances is, that the pyramid was intended to be much larger with the northern base shifted 30m (98ft) further to the north which would make Khafre's Pyramid much larger than his father's. This would place the entrance to the lower descending passage within the masonry of the Pyramid.

There is a subsidiary chamber, equal in length to the 412" long King's Chamber of the Khufu Pyramid, that opens to the west of the lower passage the purpose of which is uncertain. It may be used to store offerings, store burial equipment, or it may be serdab chamber. The upper descending passage is clad in granite and descends to join with horizontal passage to the burial chamber.

The burial chamber was carved out of a pit in the bedrock. The roof is constructed of gabled limestone beams. The chamber is rectangular. 14.15m by 5m (46.4ft x 16ft). and is oriented east-west. Khafre's sarcophagus was carved out of a solid block of granite and sunk partially in the floor, in it, Belzoni found bones of an animal, possibly a bull. Another pit in the floor likely contained the canopic chest, its lid would have been one of the pavement slabs.

মেনকাউরের পিরামিডের সামনে ডাঃ দীপালী বিশ্বাস

ফারাও মেনকাউরে
ও তার স্ত্রী

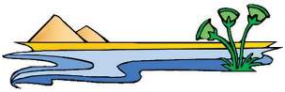

মেনকাউরের পিরামিড
Pyramid of Menkaure

এরপর গাড়ি ঘুরিয়ে আমাদের দেখিয়ে আনল মেকাউরের পিরামিড। মসৃণ রাস্তা চলে গিয়ে থেমেছে পিরামিডের পূর্ব প্রান্তে। গাড়ি গিয়ে থামল পিরামিডের গায়ে।

সব দেখা শেষ হয়ে আসছে ক্রমেই। আজই শেষ দিন। তাই যত পারি দেখে নিতে চাই। মন যত ব্যাকুল হচ্ছে মনের ছটফটানিও ততটাই বেড়ে চলেছে।

ঝটপট গাড়ি থেকেই নেমে ছোটা শুরু করলাম ছোটো পিরামিড মেনকাউরের পিরামিডের দিকে। হঠাৎ দেখি দীপালী নেই। সামনেও নেই পিছনেও নেই। অন্য সময় হলে হাত ধরে ধীরে সুস্থে গাড়ি থেকে নেমে একসঙ্গেই এগোতাম। আজ কি হল! কিছু খেয়াল নেই। দাঁড়িয়ে পড়লাম। তখন দেখি গাড়ি থেকে ও নামছে।

কাছে এসে বলল, 'আজ কি হল তোমার? আমি ভাবলাম, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেল কি না। আমাকে না নিয়েই ছুটেছ? আমিও ইচ্ছে করেই দেরি করছি। দেখি আমার কথা তোমার ভাবনায় আছে কি না।'

আমি বললাম ওকে, 'আজ মনটা কেমন যেন হয়ে উঠেছে। আজ শেষ দিন না? তাই ছুটেছি ওটাও দেখব বলে। চল এগোই।'

এই মেনকাউরের পিরামিডটি খুফু ও খাফরের বড়ো পিরামিড দুটির দক্ষিণপশ্চিম পাশেই নির্মিত হয়েছিল। গিজাতেই কায়রোর দক্ষিণপশ্চিম দিকে এই অপেক্ষাকৃত ছোটো পিরামিডটির অবস্থান। ধারণা করা হয় চতুর্থ রাজবংশের ফারাও মেনকাউরের সমাধির জন্য এই পিরামিড নির্মাণ করা হয়।

এই পিরামিডের নির্মাণকাল সঠিক ভাবে জানা যায়নি। তবে ধারণা করা খ্রিস্টপূর্ব ছাব্বিশ শতকে এটির নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়। যখন এটি নির্মাণ করা হয়েছিল তখন এর উচ্চতা ছিল ৬৫.৫ মিটার (২১৫ ফুট) গিজা সমাধিক্ষেত্রের বড়ো তিনটি পিরামিডের মধ্যে সবচেয়ে ছোটো এটি। কালের যাত্রায় ক্ষয় হয়ে বর্তমানে এর উচ্চতা দাঁড়িয়েছে ৬১ মিটার (২০৪ ফুট)। ভূমির সঙ্গে এর কোন ৬১.২০ ডিগ্রি। লাইমস্টোন ও গ্রানাইট দিয়ে এই পিরামিড

তৈরি করা হয়। প্রথম ষোলোটি ধাপ রেড গ্রানাইটে তৈরি করা হয়েছিল। তুরা লাইমস্টোন দিয়ে পরের অংশ সাধারণ ভাবে তৈরি হয়। মেনকাউরের পিরামিডের দক্ষিণে ছোটো ছোটো তিনটি পিরামিড আছে যেগুলিতে ছোটো মন্দির আছে।

পিরামিডটির ভিত ও ভিতরের অংশ লাইমস্টোন দিয়ে তৈরি। পরে ভিত ও দেয়ালের কিছু অংশ গ্রানাইট দিয়ে তৈরি করা হয়। এখানে যে পাথর ব্যবহৃত হয় সেগুলি বিশেষ পালিশ করা নয়, অসমতল। আসোয়ান থেকে যে সকল গ্রানাইট পাথর আনা হয়েছে সেগুলির সবচেয়ে ভারি ব্লকের ওজন প্রায় ৩০ টন।

কোন ফারাও নিজের পিরামিড তৈরি করতে করতে মারা গেলে তার অসম্পূর্ণ পিরামিড সাধারণত তার সন্তান বা কোন উত্তরাধিকারি আর সেটি সঠিক বা সুন্দর ভাবে তৈরি করেন না। এর বেলাও তাই হয়েছিল। ফারাও শেপসেসকাফ এটি অমসৃণ পাথর দিয়ে কোনোমতে শেষ করেন—ততটা সৌন্দর্য পায়নি। এই পিরামিডের সমাধিক্ষেত্রে একটি পাথরে হাইরোগ্লাইফিকে লেখা পাওয়া গিয়েছিল, 'এটি আমি আমার বাবার স্মৃতিতে তৈরি করলাম, যিনি সমগ্র উপর ও নিম্ন মিশরের রাজা ছিলেন।' রিশনার খননকার্য চালিয়ে মেনকাউরে ও তার পরিবারের অনেক মূর্তি পেয়েছিলেন। তার মধ্যে মেনকাউরে ও তার একজন স্ত্রীর মূর্তি অসাধারণ সৌন্দর্যে তৈরি।

রিচার্ড ভাইস ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে এই পিরামিডে অনুসন্ধান শুরু করেন। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে জুলাই তিনি উপরের একটি প্রকোষ্ঠে মেনকাউরের নাম লেখা একটি কাঠের কফিন দেখতে পান এবং ওই কফিন বাক্সের মধ্যে মানুষের হাড় আবিষ্কার করেন। ধারণা করা হয় এগুলি সাইটির সময়কালের কিছু কফিন। হাড়গুলির রেডিওকার্বন পরীক্ষায় জানা গেছে যে ওগুলি প্রায় ২০০০ বছরের পুরোনো হাড়। হাড়গুলির অবস্থা দেখে ধারণা করা হয় যে এগুলি স্থানান্তর করার ফলে এমন আগোছালো অবস্থা।

পিরামিডের অভ্যন্তরে ভাইস দেখতে পান একটি অপূর্ব ভাস্কর্যশোভিত পাথরের শবাধার, যে শবাধারের মধ্যে ছিল একজন তরুণীর সমস্ত হাড়। মিশরের প্রাচীন রাজবংশের এই শবাধারটি নিয়ে ব্রিটিশ লোকজন বিট্রিস নামক জাহাজে করে ব্রিটেনের উদেশ্যে রওনা হয়। যখন এই তরুণীর হাড় সমেত শবাধারটি ব্রিটেনের পথে ভূমধ্যসাগরে মালটা ও কারটাজিনার মধ্যবর্তি স্থানে পৌঁছোয় তখনই জাহাজডুবি হয়। শবাধার সমেত জাহাজটি সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যায়। এই সুন্দর শবাধারের ঢাকনাটি পরবর্তিতে ব্রিটিশ যাদুঘরে নিয়ে সেখানে প্রদর্শনের জন্য রক্ষিত আছে।

এই জাহাজ ডুবি নিয়েও নানা গল্প আছে। একজন ফারাও পত্নীর শবাধার সমেত হাড় সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার অভিশাপেই নাকি জাহাজডুবি হয়েছিল। পরবর্তিতে আর এই জাহাজের কোনও সন্ধান মেলেনি।

The Pyramid of Menkaure :

The Pyramid of Menkaure is the smallest of the three main Pyramids of Giza, located on the Giza Plateau in the southwestern outskirts of Cairo. It is thought to have been built to serve as the tomb of the Fourth Dynasty Pharaoh Menkaure.

It lies a few hundred yards southwest of the Pyramid of Khafre and the Great Pyramid of Khufu in the Giza necropolis. The Pyramid's date of construction is unknown because Menkaure's reign has not ben accurately defined, but it was probably completed in the 26th Century BC.

The Menkaure's Pyramid's original height was 65.5 metres (215 feet) and was the smallest of the three major Pyramids at the Giza Necroplis. It now stands at 61m (204 ft) tall with a base of 108.5m Its angle of incline is approximately 51"20'25". It was constructed of limestone and granite. The first sixteen courses of the extenrior were made of red granite. The upper portion was cased in the normal manner with Tura limestone. Part of the granite was left in he rough. Incomplete projects such as this Pyramid help archeologists understand the methods used to build Pyramids and temples. South of the Pyramid of Menkaure are three satellite Pyramids that are each accompanied with a temple and have a substrucure. The southernmost is the largest and a true Pyramid. Its casing is partly of granite, like the main Pyramid, and is believed to have been completed due to the limestone pyramidion found close by neither of the other two progressed beyond the construction of the inner core.

The foundations and the inner core were made of limestoen. The floors begun with granite and granite facings were added to some of the walls. The foundations of the valley temple were made of stone. However both temples were finished with crude bricks. The heaviest granite ashlars imported from Aswan weighed more than 30 tons. It was not unusual for a son or successor to complete a temple when a Pharaoh died. So it is not unreasonable to assume that Shepseskaf finished the temples with crude brick. There was an inscription in the mortuary temple that said he 'made it as his monument for his father, the King of upper and lower Egypt'. During excavations of the temples Reisner found a number of statues mostly of Menkaure alone and as member of a group.

In 1835 Richard Vyse first visited Egypt, discovered on 28 July 1837 in the upper antechamber the remains of a wooden anthropoid coffin

inscribed with Menkaure's name and containing human bones. This is now considered to be a substitute coffin from the Saite period. Radiocarbon dating on the bones determined them to be less than 2.000 years old, suggesting either an all-too-common bungled handling of remain from another site, or access to the Pyramid during Roman times.

Deeper into the Pyramid, Vyse came upon a basalt sarcophagus, described as beautiful and rich in detail with a bold projecting cornice, which contained the bones of a young woman. Unfortunately, this sarcophagus now lies at the bottom of the Mediterranean Sea, having sunk on Otober 13,1838 with the ship Beatrice, as she made her way between Malta and Cartegegna on the way to Great Britain, It was one of only a handful of Old Kingdom sacrcophagi to survive into the modern period.

The lid from the anthropoid coffin mentioned above was successfully transported to England and may be seen today at the British Museum.

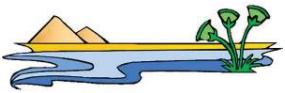

পিরামিড ধ্বংসের চেষ্টা
Attempted demolition : The damage to the Pyramid

বিংশ শতকে সালাহউদ্দিনের ছেলে ও তার উত্তরাধিকারী আল-মালেক-আল-আজিজ-ওসমান বিন ইউসুফ সকল পিরামিড ধ্বংস করার পরিকল্পনা করেন।

প্রথমে তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে ছোটো পিরামিডটি ধ্বংস করে আস্তে আস্তে বাকি দুটি বড়ো পিরামিড ধ্বংস করবেন। মেনকাউরের পিরামিড ধ্বংস করার জন্য আল-আজিজ প্রচুর লোকজন নিয়োগ করেন। আট মাস কাজ করার পর দেখেন যে পিরামিডটি ধ্বংস করতে প্রচুর পরিশ্রম হচ্ছে। প্রতিদিন একটি বা দুটি পাথর সরানো যাচ্ছে। পাথর খোলার জন্য কাঠের বা ধাতুর গোঁজ ও লিভার ব্যবহার করা হল। পাথর খণ্ডগুলি উপর থেকে ফেলে দিলে সেগুলি বালির অনেক নিচে ঢুকে যাচ্ছিল। সেগুলি বালির নিচ থেকে উপরে তুলে সরাতেও বেশ কষ্ট হচ্ছিল।

আল-আজিজ দেখলেন এভাবে পিরামিড ধবংস করা খুব ব্যয়সাপেক্ষ এবং প্রায় অসম্ভব। আল আজিজ তার পিরামিড ধ্বংসের পরিকল্পনা অবশেষে বাতিল করতে বাধ্য হন। তনি আট মাস ধরে চেষ্টা করে মেনকাউরের পিরামিডের উত্তর দেয়ালে একটা বড় ক্ষত সৃষ্টি করতে পারেন মাত্র। এভাবে পিরামিড তিনটি ধ্বংস হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পায় ও আজ হাজার হাজার পর্যটক সেটি দেখতে পাচ্ছে।

Attempted demolition : The damage to the Pyramid :

Al-Malek-al-Aziz Osman ben Yusuf, Salahuddin's son and heir, attempted to demolish the Pyramids, starting with Menkaure's Pyramid at the end of the twenth century. The workmen whom Al-Aziz had recruited to demolish the Pyramid stayed at their job for eight months. but found it almost as expensive to destroy as to build. They could only remove one or two stones each day. Some used wedges and levers to move the stones, while others used ropes to pull them down. When a

পিরামিডের ধ্বংস দেওয়ালের সামনে লেখক

stone fell, it would bury itself in the sand, requiring exraordinary efforts to free it. Wedges were used to split the stones into several pieces, and a cart was used to carry it to the foot of the escarpment, where it was left. Due to such conditions, they could only damage the Pyramid by leaving a large vertical gash iin its north face.

স্ফিংসের সামনে ডাঃ দীপালী বিশ্বাস

স্ফিংসের সামনে লেখক

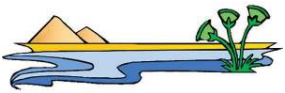

স্ফিংস
The Great Sphinx of Giza

পিরামিড দেখার পর এবার স্ফিংস দেখার পালা। এগোলাম সে দিকে। সূর্য এখন মধ্য গগনে। খুব গরম আবহাওয়া। যেন আগুন ঝরছে মরুভূমিতে, আগুন ঝরছে আমাদের মাথার উপরে। খুব গরম লাগছে। তবু স্ফিংস টানছে আমাদের। ওই তো দেখা যাচ্ছে। জোর কদমে এগিয়ে গেলাম ওদিকে।

এও এক আশ্চর্য শিল্পকর্ম। পুরো লাইমস্টোনে তৈরি। শরীরটা সিংহের আর মাথা হচ্ছে মানুষের। পূর্বদিকে মুখ করে বসে আছে মাথা উঁচু করে। অনেকের ধারণা স্ফিংসের মুখটি ফারাও খাফরের। অবশ্য অন্য গবেষকরা গবেষণায় বলেন যে মুখটি খাফরের বাবা ফারাও খুফুর। আরও চাঞ্চল্যকর মতামত দিয়েছেন রবার্ট কে জি টেম্পল। তিনি লিখেছেন স্ফিংস প্রথমে ছিল শেয়াল-কুকুর অ্যানুবিসের আকৃতি যাকে সমাধির দেবতা বলা হয়। পরে তার মুখাবয়ব পরিবর্তন করে ফারাও অ্যামেনমেট-২ এর মুখাকৃতি দেওয়া হয়।

এই বিশাল স্ফিংসের আকৃতির পরিমাপ দেখলেও বিস্মিত হতে হয়। লেজ থেকে সামনের থাবা পর্যন্ত এটি ৭৩ মিটার (২৪০ ফুট) আর ভিত থেকে মাথার উচ্চতায় ২০.২১ মিটার (৬৬.৩১ ফুট) এবং চওড়ায় ১৯ মিটার (৬২ ফুট)। ধারণা করা হয় মিশরের প্রাচীন রাজবংশের ফারাও খাফরের শাসনকালে (খ্রিস্টপূর্ব ২৫৫৮ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ২৫৩২) এই স্ফিংস তৈরি হয়। খাফরের পিরামিড তৈরির সময়েই স্ফিংস তৈরি হয়।

বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো, সবচেয়ে প্রাচীন ও সুন্দর পাথরের মূর্তি এই স্ফিংস। যদিও বায়ু প্রবাহ ও বালিঝড়ের কারণে স্ফিংসের সারা শরীর ক্ষয়ে ক্ষয়ে অসমান হয়ে গেছে ও সৌন্দর্যহানি হয়েছে। কারও মতে বহু বছর ধরে বৃষ্টিপাতেও ক্ষয় হয়েছে অনেক।

জনমানবহীন মরুভূমির মধ্যে এই স্ফিংস। চারিদিকে শুধু বালি আর বালি। যখন গিজা সমাধিক্ষেত্র বর্জন করা হয় তার পর ধীরে ধীরে স্ফিংসের কাঁধ পর্যন্ত বালির নিচে হারিয়ে যায়। এটিকে বারে বারে বালির পাহাড় মুক্ত করার চেষ্টা হয়েছে। প্রথম দিকে কেউই সম্পূর্ণ দৃশ্যমান করতে পারেনি।

১৪০০ খ্রিস্টপূর্বে ফারাও টুটমোস-৪ আংশিক খনন করেন এবং সামনের থাবা পর্যন্ত কিছুটা উদ্ধার করেন। তিনি তখন সামনের থাবার মধ্যে একটি গ্রানাইট পাথর বসিয়ে তাতে খোদাই করে লিখে রাখেন ঃ

'হে রাজকীয় সন্তান টুটমোস,

যখন তুমি দিনের মাঝখানে হেঁটে আসলে এবং এই দেবতার ছায়ায় বসলে আর ঘুমিয়ে পড়লে— তখন দেবতারা স্বর্গের উচ্চাসনে আসীন।

তখন এই দেবতা তাকে নিজের মুখে বললেন, হে আমার পুত্র, আমার দিকে দেখ। গভীর ভাবে চিন্তা কর। আমি তোমার পিতা।

আমি তোমাকে ক্ষমতা দিলাম.।

আমি তোমাকে সমগ্র বিশ্বের স্বাধীন অধিকার তোমাকে দিলাম।

সকল মানুষের উপর তোমার অধিকার।

তুমি আমাকে রক্ষা কর।

তুমি আমার পা গুলি মরুভূমির বালি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত কর।

আমার হৃদপিণ্ড বন্ধ হওয়া থেকে আমাকে বাঁচাও।'

Giza Necropolis was abandoned once and the Sphinx was eventually buried up to its shoulders in sand. The first documented attempt at an excavation was in 1400 BC, when the young Thutmose IV-1401-1391BC or 1397-1388 BC gathered a team and, after much effort, managed to dig out the front paws, between which he placed a granite slab, known as the Dream Stele, inscribed with the following excerpt.

The Royal son. Thothoms, being arrived.

While walking at midday and seating himself under the shadow of this mighty God, was overcome by slumber and slept at the very moment when Ra is at the summit of heaven.

He found that the Majesty of this august God spoke to him whith his own mouth, as a father speaks to his son, saying.

Look upon me, contemplate me.

O my son Thothoms. I am thy father, Harmakhis-Khopri-Ra-Tum.

I bestow upon thee the sovereignty over my domain, the supremacy over the living.

Behold my actual condition that thou mayest protect all my perfect limbs.

The sand of the desert whereon I am laid has covered me.

Save me, causing all that is in my heart to be executed.

এরপর ফারাও রামেসেস-২ (খ্রিস্টপূর্ব ১২৭৯ থেকে ১২১৩ খ্রিস্টপূর্ব) দ্বিতীয়বার পুনর্খনন করেন। একজন মিশর বিশেষজ্ঞ মার্ক লেহনার একবার কিছুটা খনন করেন এবং উদ্ধার করেন যে প্রাচীন রাজবংশের সময় (খ্রিস্টপূর্ব ২৬৮৬-খ্রিস্টপূর্ব ২১৮৪) এর সংস্কার করা হয়। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে ইটালির আধুনিক পুরাতত্ত্ববিদ জিওভান্নি বাতিস্তা ক্যাভিগ্লিয়ার তত্ত্বাবধানে স্ফিংসের বুক পর্যন্ত সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত করা হয়। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে স্ফিংসের থাবা ও পা থেকে সব কিছুই উদ্ধার করা হয় ও দৃশ্যমান হয়। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এমিলি বারাইজির নেতৃত্বে সমগ্র স্ফিংস খনন করা হয়।

এক সময় মাথার কিছুটা অংশ ক্ষয়ের কারণে ভেঙে যায়। কাঁধের জায়গাটা গভীরভাবে ফেটে যায়। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে মিশরীয় ইঞ্জিনিয়াররা স্ফিংসের মাথার দিকটা সংস্কার করেন। সে স্থানগুলো মেরামত করা হয় এবং একটি কংক্রিটের কলার নির্মাণ করা হয়। ১৯৮০ ও ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে স্ফিংসের ভিত ও গায়ের কিছু জায়গায় মেরামত করা হয় ও প্রলেপ দেওয়া হয়।

আর একটি বিষয় লক্ষণীয় ঃ স্ফিংসের এক মিটার চওড়া নাকটি অনুপস্থিত কয়েক শত বছর ধরে। এই নাক হারানো নিয়েও নানা গল্প নানা কাহিনি প্রচলিত আছে।

কেউ কেউ বলছেন ১৩৭৮ খ্রিস্টাব্দে সায়েদ আল সাউদার খানকা থেকে আগত মুহাম্মদ সায়েম আল দার নাকটি ভেঙে ফেলেন। তিনি ছিলেন একজন সুফি মূর্তিপূজা বিরোধ মুসলমান। তিনি এসে লক্ষ্য করেন এলাকার কৃষকরা অধিক ফসলের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা না করে স্ফিংসের কাছে প্রার্থনা করছে। এটা দেখে তিনি প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং একদিন নাকটি ভেঙে ফেলেন। পরে অবশ্য তার এই অপকর্মের জন্য তাকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়। কেউ কেউ আবার নেপোলিয়ানের সৈন্যদের দোষারোপ করেন। আবার ভিন্নমতও আছে। বলা হয় ব্রিটিশ সৈন্যরা, মামলুক সৈন্যরা বা অন্য কেউ এই নাক ভেঙেছে।

স্ফিংসের নাক ভাঙা নিয়েও বিস্তর গবেষণা চলেছে ও এখনও চলছে, আগামীতেও চলবে। সঠিক তথ্য জানার জন্য আরও কত শত বছর অপেক্ষা করতে হবে কে জানে। তবে এটা ঠিক মিশর এবং স্ফিংস নিয়ে সারা বিশ্বের পণ্ডিতদের যত গবেষণা হয়েছে বিশ্বের আর কোন পুরাতত্ত্ব নিয়ে এত গবেষণা হয়নি বা আগ্রহ দেখা যায়নি।

মিশরের প্রাচীন পুরাকীর্তির সব কিছু নিয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে। স্ফিংসের পাথরের পরীক্ষা হয়েছে অনেক। জানার চেষ্টা হয়েছে এর গঠন, আয়ুষ্কাল প্রভৃতি। প্রতিটি জিনিসের রেডিওকার্বন পরীক্ষা হয়েছে, কেমিক্যাল অ্যানালাইসিস হয়েছে, কত বছরের পুরানো তা নির্ধারণ করা হয়েছে। অনেক কিছুরই উদঘাটন হয়েছে। পৃথিবীর বিখ্যাত বিখ্যাত পরীক্ষাগারে তা নিয়ে গিয়ে এসব পরীক্ষা করা হয়েছে।

The Sphinx, probably built out of a rock formation used to cut the blocks for the Pyramid itself, may have been part of the complex.

The Great Sphinx of Giza : Sphinx of Giza or just the Sphinx, is a limestone statue of a reclining Sphinx, a mythical creature with the body of a lion and the head of human facing directly from West to East, it stands on the Giza Plateau on the west bank of the Nile in Giza. Tha face of the Sphinx is generally believed to represent the Pharaoh Khafre with difference of opinions also.

The original shape of the Sphinx cut from the bedrock, has been restored with layers of blocks. it measured 73 metres (240ft) long from paw to tail, 2021 m (66.31 ft) high from the base to the top of the head and 19 metres (62ft) wide at its rear haunches. It is the oldest from BC 2558 to 2532 BC, known monumental sculpture in Egypt and is commonly believed to have been built by ancient Egyptians of the Old Kingdom during the reign of the Pharaoh Khafre.

The Sphinx is a monolith carved into the bedrock of the plateau, which also served as the quarry for the Pyramids and other monuments in the area. The nummulitic limestone of the area consists of layers which offer differing resistance to erosion mostly caused by wind and windblown sand leading to the uneven degradation apparent in the Sphinx body.

The lowest part of the body, includiing the legs, is solid rock. The body of the lion up to its neck is fashioned from softer layers that have suffered considerable distintegration. The layer in which the head was sculpted is much harder.

Though it is a basic fact about it is still subject to debate, such as when it was built by whom and for what purpose the Great Sphinx is one of the world's largest and oldest statues.

The Great Sphinx was built in approximately 2500 BC for the Pharaoh Khafre the builder of the Second Pyramid at Giza.

A diorite statue of Khafre which was discoverd buried upside down along with other debris in the Valley Temple, is claimed as support for the Khafre theory.

Some early Egyptologists and excavators of the Giza pyramid complex believed the Geat Sphinx and associated temples to predate the fourth Dynasty rule of Khufu, Khafre, and Menkaure.

Gaston Maspero, the French Egyptologist and second director of the Egyptian Museum in Cairo, conducted a survey of the Sphinx in 1886. He concluded that because the Dream stela showd the cartouche of Khafre in line thirteen, it was he who was responsible for the excavation

and therefore the Sphinx must predate Khafre and his predecessors - Possibly Dyasty IV. 2575 BC-2467 BC. English Egyptologist E. A. Wallis Budge agreed that the Sphinx predated Khafre's reign, writing in the Gods of the Egyptains-1914.

The marvelous object the great Sphinx was in existances in the days of Khafre, or Khephren and it is probable that it is a very great deal older than his reign and that it dates from the end of the archaic period 2686 BC- Maspero believed the Sphinx to be the most ancient monument in Egypt.

Rainer Stadelmann, former director of the German Archeological Institute in Cairo, examined the distinct iconography of the nemes (headdress) and the now-detached beard of the Sphinx and concluded the style is more indicative of the Pharaoh Khufu-2589 BC-2566 BC. builder of the Great Pyramid of Giza and Khafre's father. He supports this by suggesting Khafre's Causeway was built to conform to a pre-existing structure, which, he concludes, given its location, could only have been the Sphinx.

Colin Reader, an English geologist who independently conducted a more recent survey of the enclosure, agrees the various quarries on the site have been exacavated around the Causeway. Because these quarries are known to have been used by Khufu, Reader concludes that the causeway and the temples on either end theeof, must predate Khufu, thereby casting doubt on the conventional Egyptian chronology.

Frand Domingo, a forensic scientist in the New York City Police Department and an expert forensic anthropologist used detailed measurements of the Sphinx, forensic drawings and computer imagine to conclude the face as is depicted on the Sphinx is not the same face as is depicted on a statue attributed to Khafre.

In 2004 Vassil Dobrev of the Institute Francais d'Archeologie Orientale in Cairo announced that he had uncovered new evidence the Great Sphinx may have been the work of the little-known Pharaoh Djedefre 2520 BC Khafre's half brother and a son of Khufu. Dobrev suggests Djedfre built the Sphinx in the image of his father Khufu, identifying him with the Sun God Ra in order to restore respect for their Dynasty. Dobrev also notes, like Stadelmann and others the causewy connecting Khafre's Pyramid to the temples was built around the Sphinx suggesting it was already in existence at the time.

The Sphinx water erosion hypothesis contends that the main type of weathering evident on the enclosure walls of the Great Sphinx could only have been caused by prolonged and extensive rainfall and must therefore predate the time of the Pharoh Khafre.

Colin Reader, a British geologist studied the erosion patterns and noticed that they are found predominantly on the western enclosure wall and not on the Sphinx itself.

Author Robert K. G Temple proposes that the Sphinx was originally a statue of the Jackal-Dog Anubis, the God of the Necropolis, and that its face was recarved in the likeness of a Middle Kingdom Pharaoh, Amenehet II. Temple bases his identification on the style of the eye make-up and style of the pleats on the headdress.

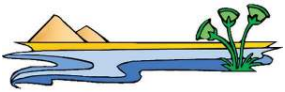

ঘরে ফেরা
Back Home

স্ফিংসকে সঙ্গে নিয়ে কে কত ভাবে ছবি তুলে নিতে পারে তুলে নিচ্ছে—আর যে দেখা হবে না। যেন শেষ বিদায় নিচ্ছে সকলে স্ফিংসের থেকে। প্রথমে স্ফিংস দেখে যেমন উদ্ধত মনে হয়েছিল, আর ঠিক বিদায়ের মুহূর্তে স্ফিংস যেন ম্রিয়মান। যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে স্ফিংস। সেও যেন বিদায় জানাচ্ছে আমাদের। তার চোখে মুখেও যেন বিদায়ের স্পষ্ট ছবি। সবই মনের ভ্রম জানি। এও বুঝলাম মানুষের মন কল্পনায় কত কি ভাবতে পারে। পাথরের মৃত এক অদ্ভুত শিল্পকর্মকেও মানুষ ভালোবাসতে পারে। কতদূরে চলে যেতে পারে সে মনের টাইম মেশিনে চড়ে। ফিরে যেতে পারে পাঁচ হাজার বছর আগে। এগিয়ে যেতে পারে হাজার বছর পরের দিনে। কথা বলতে পারে এই স্ফিংসের সাথে। বিদায় ব্যথায় কাতর হতে পারে।

সত্যি বিদায় নিতে হবে। আজকের এই শেষ দেখা পিরামিড আর স্ফিংসের থেকে, মিশরের থেকে। কাল সকালে ফিরে যাব আবার আমাদের কর্মভূমিতে যেখানে অপেক্ষা করে রয়েছে কাজ আর শুধু কাজ। সঙ্গে থাকবে এই কটি দিনের স্মৃতি। জ্বল জ্বল করবে যতদিন বেঁচে থাকব।

আমরা এই যে আঠারো জন মানুষ একসঙ্গে এতদিন কাটালাম এক পরিবারের মত আমরাও যার যার মত আলাদা হয়ে যাব। মিশর ভ্রমণ শেষের পর আমাদের একত্রে বসবাসও সাঙ্গ হবে। যেন এক পরিবার ছিলাম। শুধু আনন্দ ভাগ করে নিতাম এ কয়টা দিন। স্ফিংসের থেকে বিদায় নেওয়ার সাথে সাথে আমরাও যেন বিদায় নিচ্ছি একে অপরের থেকে। সেও কম কষ্টের নয়।

হঠাৎ ডাঃ সুনীলদা আমাকে জড়িয়ে ধরে একেবারে আবেগ আপ্লুত হয়ে বললেন, 'তপন, এই কয়টা দিন তোমাদের সঙ্গে কাটিয়ে বুঝেছিলাম আমরা একে অন্যের কত আপনার। আবার আমরা হারিয়ে যাব যে যার কাজের মধ্যে। সম্ভব হলে দীপালী আর তুমি যোগাযোগ রেখ।'

আমিও অনেকটা আবেগতাড়িত হয়েই সুনীলদাকে জড়িয়ে ধরে থাকলাম অনেকক্ষণ। কোন কথা বলতে পারিনি। কথা বের হয়নি মুখ থেকে।

মনে পড়ে গেল কবি শেলীর সেই বিখ্যাত উক্তি ঃ-

'Our sweetest songs are those that tell of saddest thought.' (Percy Bysshe Shelley)

সুনীলদাকে জড়িয়ে ধরে থেকে তাকে আস্তে আস্তে বললাম শেলীর উক্তিটি। আমার কথা শুনে আমার চোখের দিকে ছলছল চোখে সুনীলদা অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন।

বিদায় সব সময়ই ব্যথার। আর এ বিদায় ব্যথাই সারা জীবন মধুর স্মৃতিতে ভাস্বর হয়ে থাকবে। আমরা সকলে বিদায় জানালাম মিশরকে সিক্ত হৃদয়ে।

মধুর স্মৃতি নিয়েই মানুষ বেঁচে থাকে। এই মিশর স্মৃতিচারণে অনেক দিন অনেক সময় আমরাও মমি পিরমিডের সাথে কথা বলব, স্মৃতির তরীতে নীলনদের জলে ভেসে বেড়াব।। তখন দুঃখের স্মৃতি আরও আনন্দঘন হয়ে উঠবে।

বিদায় পিরামিড -বিদায় স্ফিংস-বিদায় মিশর।

সমাপ্ত

লেখকের কিছু স্মৃতি

‘ফিরে আসা’ কাব্যগ্রন্থের প্রকাশনা অনুষ্ঠান

'জেগে আছি' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশনা অনুষ্ঠান

Tower Bridge, London

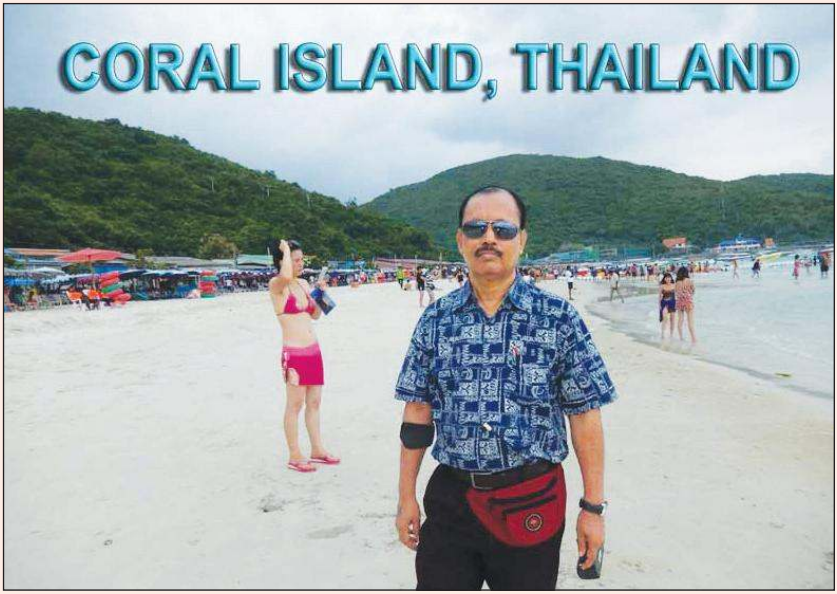

Grand Palace, Thailand

Eiffel Tower, France

Colosseum, Rome

Petronas Twin Tower, Malaysia

Pisa-Leaning Tower, Italy

Sentosa Island, Singapore

Marina Bay Hotel, Singapore

Geneva, Switzerland

Macau

Hong Kong

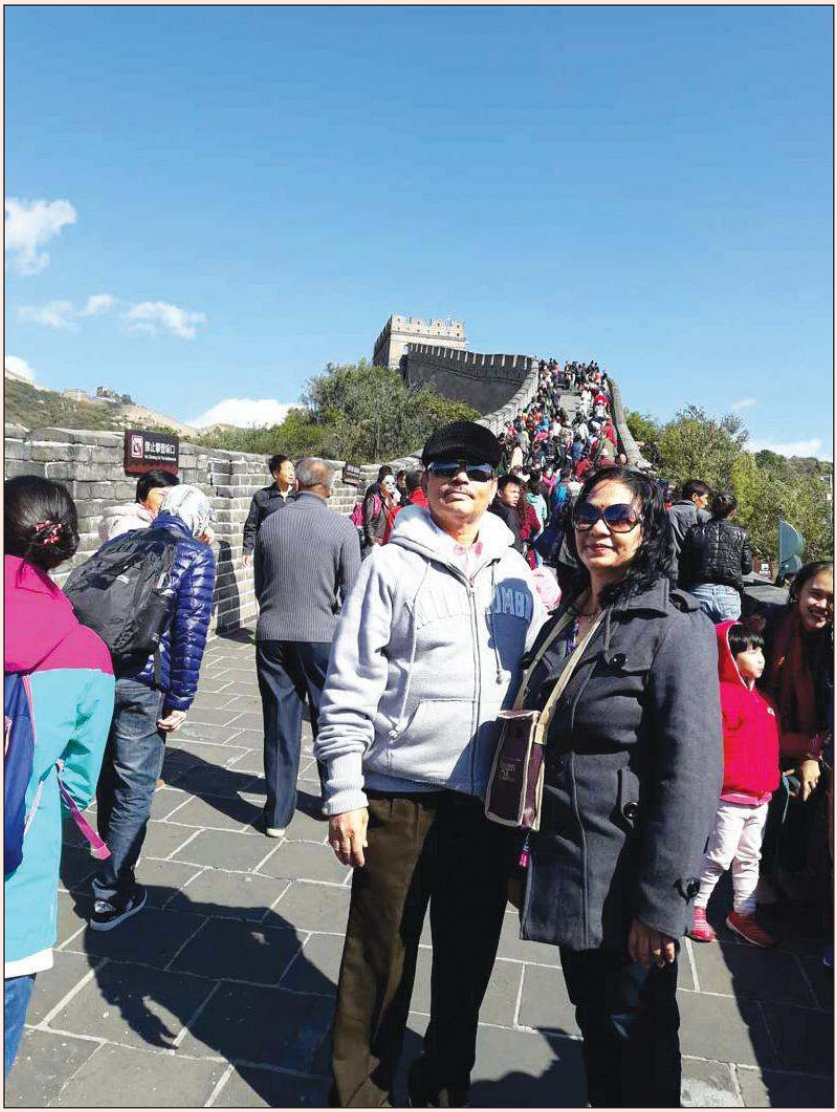

Great Wall, China

Sanghai, China

Vatican City

Swarovski, Austria

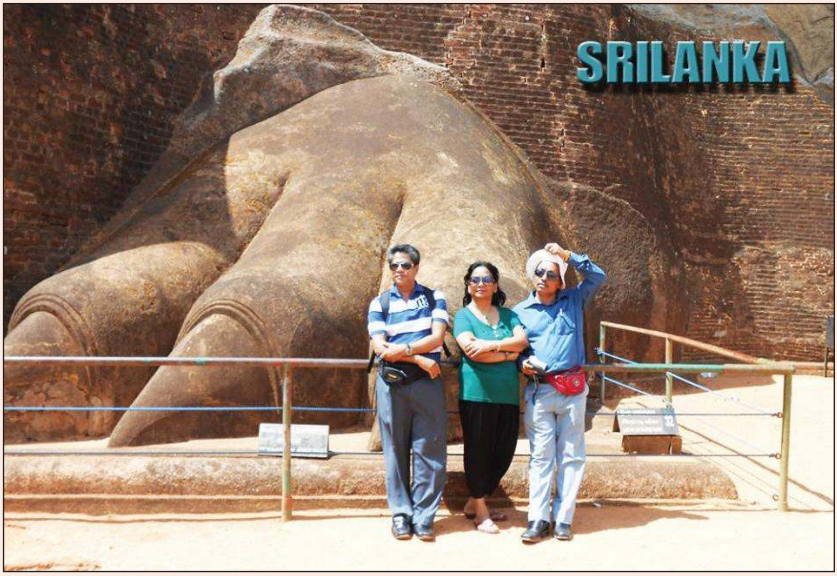

Sigiria Rock, Srilanka

Vadus, Liechtenstein

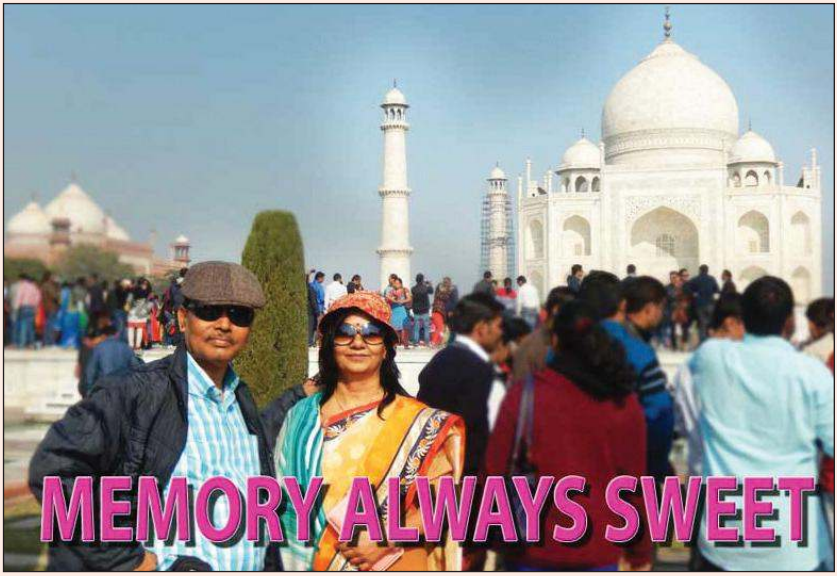
MEMORY ALWAYS SWEET

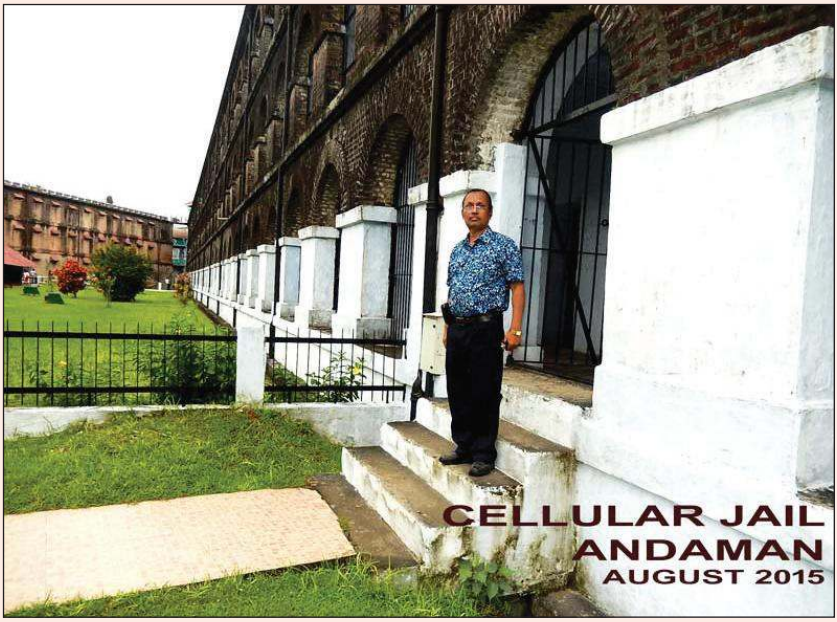
CELLULAR JAIL
ANDAMAN
AUGUST 2015

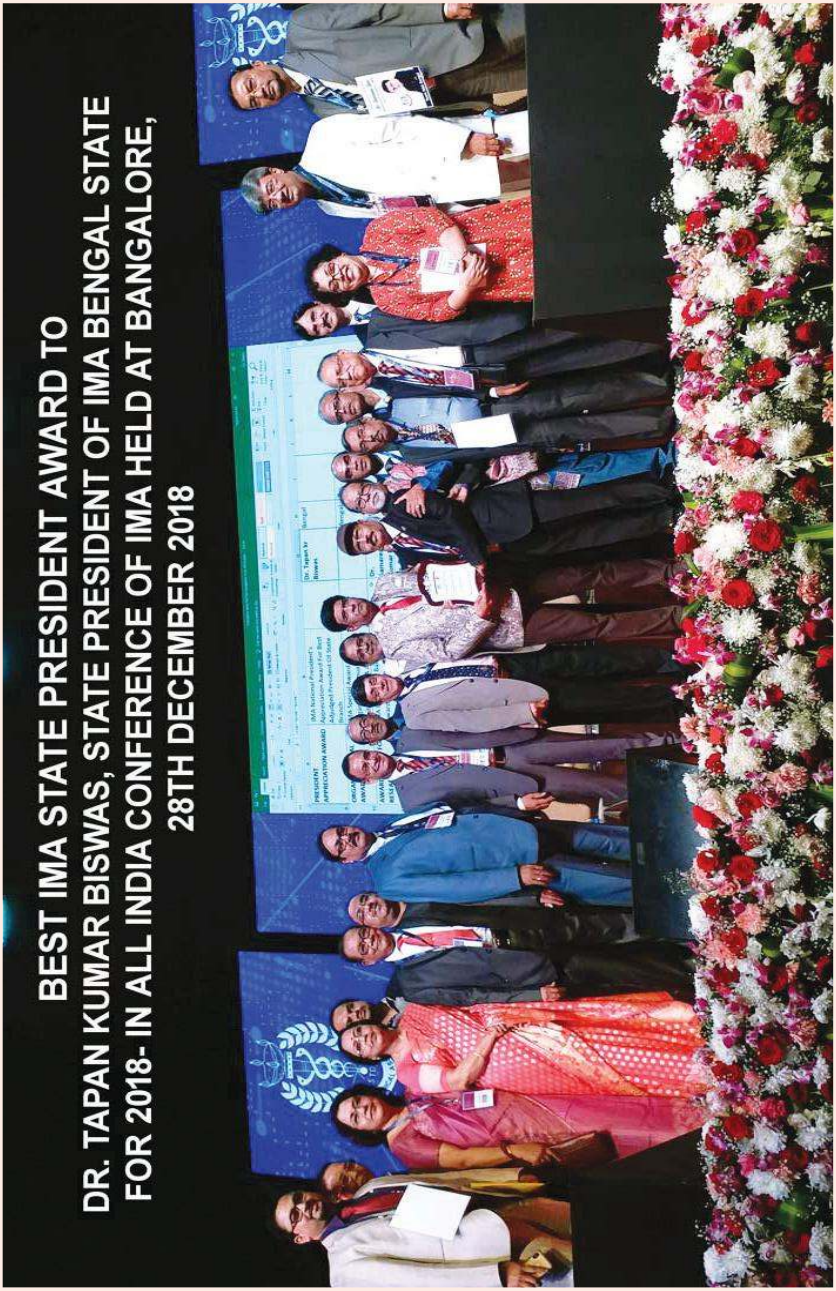
BEST IMA STATE PRESIDENT AWARD TO
DR. TAPAN KUMAR BISWAS, STATE PRESIDENT OF IMA BENGAL STATE
FOR 2018- IN ALL INDIA CONFERENCE OF IMA HELD AT BANGALORE,
28TH DECEMBER 2018

Best IMA State President Award for Dr. Tapan Kr. Biswas
for the year 2018 at IMA NATCON Bangalore,
28th Dec. 2018

WITH MOTHER OF THE AUTHOR

লেখকের একটি বিখ্যাত কবিতা-

মাতৃ আশ্রম

মাঝ রাতে হঠাৎ ঘুম ভাঙে আজকাল
পাশের ঘরে মা, ছুটে যাই ওঘরে প্রায়ই
মায়ের কপালে রাখি হাত, নিঃশ্বাসে পাতি কান
না, সবই ঠিক আছে । প্রতি রাতের অভ্যাস -
দুরুদুরু ভয়ের এক অভ্যাস যেন ।
মাঝ রাতে নিঃশব্দে মা-ও কখনও আমার ঘরে-
ছেলে বউমাকে দেখে যায় ।
বয়স হচ্ছে সকলেরই ।

শরীর ভালো যাচ্ছে না মায়ের- অনেকদিন বাবা গত
ওঘরে মা একা - অনেক বছর একা
দু-দুবার নার্সিং হোমে ভর্তি করিয়েছি
ফিরিয়ে এনেছি মায়ের ঘরেই মাকে
মরণের দুয়ার থেকে দুবারই
বাবা নেই - মা খুব একা
ভরসা আমার এই - মা তো আছে,
বৃদ্ধাশ্রমে মা নয়- মাতৃ আশ্রমে আছি আমি ।
- ডাঃ তপনকুমার বিশ্বাস ।